NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PGB

PAPER 7(D) & (D-2)

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ এপ্রিল, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : বাংলা

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম ঃ PGB : 7(D)

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

রচনা	সম্পাদনা
ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার	অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত
ড. রীতা ঘোষ	ঐ

পাঠক্রম ঃ PGB : 7(D)/2

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	ড. শর্মিষ্ঠা দে-বসু	অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত
পর্যায় 2	অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী	ঐ
পর্যায় 3	অধ্যাপিকা শীলা বসাক	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGB – 7(D) বিশেষ পত্র

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

7(D) & 7 (D-2)

পর্যায়

এক

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতির মূলতত্ত্ব ঃ

১	মুখবন্ধ	7
১.১	ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি	9
১.২	টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধতি	12
১.৩	মোটিফ-ইনডেক্স পদ্ধতি	16
১.৪	রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি	27
১.৫	আঙ্গিকবাদী পদ্ধতি	33
১.৬	জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি	35
১.৭	ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি	43
১.৮	মনঃসমীক্ষণাত্মক পদ্ধতি	50
১.৯	বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ঃ সামগ্রিক পর্যালোচনা	53
১.১০	বিস্তৃত প্রশ্নাবলী	54
১.১১	অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী	55
১.১২	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী	55
১.১৩	নির্বাচিত গ্রন্থসূচী	56

পর্যায়
দুই

২.১	সংস্কৃতির বিবর্তন ঃ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোকে	58
২.২	লোকসংস্কৃতি ঃ গণসংস্কৃতি ঃ জনসংস্কৃতি ঃ পপ্‌লোর	67
২.৩	লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ	70
২.৪	গণসংস্কৃতি ঃ জনসংস্কৃতি ঃ পপ্‌লোর	72
২.৫	সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় সংস্কার ও অলৌকিকত্ব	86
২.৬	উপসংহার	103
২.৭	অনুশীলনী	104

পর্যায়
দুই

২.২.১	সমাজ ও সংস্কৃতি	107
২.২.২	চারু ও কারু শিল্প	117
২.২.৩	অনুশীলনী	128

পর্যায়
তিন

৩.১	নামতত্ত্ব ঃ স্থাননাম-ব্যাক্তিনাম-সংস্কারকেন্দ্রিকনাম	132
৩.২	পাঠ ও পর্যালোচনা ঃ লোককাহিনি - ছড়া - প্রবাদ	133
৩.৩	অনুশীলনী	140
৩.৪	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	140

❑ মুখবন্ধ

লোকসংস্কৃতির পদ্ধতি বিশ্লেষণের সূত্রপাত উনিশ শতকের প্রথম দিকে। লোককথার পদ্ধতি বিচার করার অনুষঙ্গেই এই চিন্তায় উৎসার ঘটে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকগুলির সংগ্রহের ভিত্তিতেই তাদের বিশ্লেষণ সম্ভব। তাই সংগ্রহের ইতিহাস সংক্ষেপে জানা দরকার। এইসব সংগ্রহ যখন বিপুল আকারে প্রকাশিত হতে থাকল, তখনই গবেষকদের চিন্তায় বিচার-পদ্ধতির তাগিদ অনুভূত হল। সংগ্রহকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল নানাবিধ পদ্ধতি, মতবাদ ও দর্শন।

সুস্থ জাতীয়তাবোধ, স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশবাসী গ্রামীণ লোকসমাজের প্রতি সহমর্মিতা ও আত্মানুসন্ধান সক্রিয় থাকলেই লোকসংস্কৃতির সংগ্রহে মনোনিবেশ ও আত্মনিয়োগ করা সম্ভব। আর যে দেশে এইসব বোধের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল, সে দেশের নাম ফিনল্যান্ড।

ফিনল্যান্ড ইউরোপ মহাদেশের একেবারে উত্তরে স্ক্যানডিনেভিয়ার অন্যতম দেশ। অন্য তিনটি দেশ হল নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক।

১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর প্রথম লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ প্রকাশিত হল। আমরা জানি গিলগামেশ, মহাভারত, রামায়ণ, ওডিসি, ইলিয়াড, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপ-কথাবলী প্রভৃতির মধ্যে লোককথার অসংখ্য সংগ্রহ রয়েছে। কিন্তু সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনে মহাকাব্য-গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছিল। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে কোনো চেতনা ও সচেতনতা এসবের পেছনে কার্যকর ছিল না। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের ফিনল্যান্ডে সচেতনভাবে ঐন্দ্রজালিক লোকসংগীতের একটি ছোট্ট সংকলন প্রকাশিত হয়। বড়োই এলোমেলো সংগ্রহ, সংগ্রহের সময়কাল, কোথা থেকে সংগ্রহ সেসব জানার উপায় নেই। কিন্তু লৌকিক সমাজের মনকে বুঝবার জন্য যে সংগ্রহ করা হয়েছে, অনামী সংগ্রাহক কিন্তু তার উল্লেখ করেছেন। লোকসংস্কৃতির সংগ্রহের ইতিহাসে গ্রন্থটি তাই ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই সংগ্রহ যে সেই দেশে এক ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র সাতাশ বছর পরেই অনন্য আর একটি সংগ্রহের প্রকাশের মাধ্যমে। ফিনল্যান্ডের গির্জার একজন পুরোহিত এচ. ফ্লোবিনাস ১৭০২ সালে প্রবাদের একটি সুন্দর সংকলন প্রকাশ করলেন। দেশের নানান গ্রামীণ এলাকার কৃষক ও পশুপালকদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলি প্রকাশ করলেন এই পুরোহিত। নাগরিক শিক্ষিত মানুষ সেদিন লোকসমাজের এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন।

১৭৩৩ সালে জি. ম্যাকসেনিয়াস্ লোকসংগীতের পাঁচটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব লোকসংগীতের অধিকাংশই ঐন্দ্রজালিক লোকসংগীত। ১৬৭৫ সালের ঐন্দ্রজালিক লোকসংগীতের সংগ্রহের দ্বারা তিনি উদ্দীপিত হয়েছিলেন। আগে সংগ্রহ ছিল এলোমেলো—কিন্তু এই সংগ্রহপুচ্ছ অনেক উন্নতমানের ও পরিশ্রমসাধ্য ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল। ১৭৬৬ সাল থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে এচ. জি. পোরথান 'ডি পোয়েসি ফেনিকা' গ্রন্থের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করেন। একদিকে যেমন নতুন নতুন লোকসংগীত সংকলন করলেন, তেমনি একই সঙ্গে পোরথান লোকসংগীতের ছন্দ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। অর্থাৎ সংগ্রহের পাশাপাশি অন্য ধারণারও সূত্রপাত ঘটল। খ্রিস্টিয়ান গানানডার ১৭৮৩ সালে ধাঁধা, ১৭৮৪ সালে পশুকথা

ও ১৭৮৯ সালে লোকপুরাণের সংগ্রহ 'মিথোলজিয়া ফেনিকা' প্রকাশ করেন। আঠারো শতকের এইসব সংকলনের ঐতিহ্য অনুসরণ করে উনিশ শতকে তা আরও ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

উনিশ শতকের গোড়ায় যিনি ফিনল্যান্ডের লোকসংস্কৃতিচর্চায় জোয়ার আনেন তিনি একজন চিকিৎসক। নাম জেড. টোপোলিয়াস। চিকিৎসকের পেশায় তাঁকে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। সাধারণ হাট-বাটের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। পেশায় চিকিৎসক হলেও নেশা ছিল লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ। অসংখ্য লোকসংগীত তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু পেশার চাপে সেগুলি নিয়ে কিছু করার সুযোগ ছিলনা। এমন সময় ঘটল এক দুর্বিপাক। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাইরে কাজ করার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললেন। হয়ে পড়লেন গৃহবন্দি। দশ বছর এভাবেই কেটেছে। কিন্তু অদম্য মনোবল ও লোকসংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক আবেগ তাঁকে উদ্দীপিত করে রেখেছিল। গৃহবন্দি অবস্থায় ১৮২২ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে আগের সংগৃহীত সমস্ত সম্পদ প্রকাশ করতে থাকেন। জীবনের এই শেষ কষ্টকর দশটি বছরে ফিনল্যান্ডের লোকসংগীতের পাঁচটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বিশিষ্ট অবদান ফিনল্যান্ড ও বিশ্বের লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে অমর হয়ে রয়েছে।

টোপোলিয়াসের মৃত্যুর বছরেই অর্থাৎ ১৮৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি'। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লোকসংস্কৃতি-চর্চায় নবদিগন্ত উন্মোচিত হল। এই সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ শিক্ষক। চিরায়ত সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি এঁরা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লোকসংস্কৃতি-চর্চায় পৃথিবীর প্রথম সংস্থা গড়ে উঠল এই দেশে।

সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে ১৮৩৬ সালে এই সংস্থা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন, —আপনারা নিজের নিজের এলাকার লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে সংস্থার দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। মনে রাখবেন, এটাও দেশপ্রেমিক-সুলভ কাজ। দেশ ও দেশের মানুষের সংস্কৃতিকে জানার জন্য এই সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি।

দেশের মানুষের প্রতি শুধু আবেদন নয়, সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রহ-বিষয়ে শিক্ষিত করে বৃত্তি দিয়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তাঁরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে উপাদান সংগ্রহ করে আনবেন।

সংস্থা ১৮৪০ সাল থেকে লোকসংস্কৃতির সংকলন 'সুয়োমি' প্রকাশ শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৩৫ সালে ইলিয়াস লোন্‌রোট সম্পাদিত ফিনল্যান্ডের বীরগাথা 'কালেভালা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সংগ্রহের যে বিপুল ভাণ্ডার সংস্থার হাতে এল তা বিস্ময়কর। সবচেয়ে বেশি উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল তিন বছরে, ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে।

এইভাবে দেশপ্রেমিক মানুষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিনল্যান্ডের লক্ষ লক্ষ লৌকিক উপাদান সংগৃহীত হল। 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি'-র স্রষ্টা জুলিয়াস ক্রোন-এর সুযোগ্য পুত্র কার্ল ক্রোন তখন হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক ও এই সংস্থার কর্ণধার। লোকসংস্কৃতির যে বিপুল ভাণ্ডার সংগৃহীত হল তিনি সেসবের শ্রেণিবিন্যাস করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি অনুভব করলেন, শুধুমাত্র সংগ্রহ করে পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় এগুলি আবদ্ধ রাখলে কোনো সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, এগুলির শ্রেণিবিন্যাস না করলে গবেষণা অসম্পূর্ণ থাকবে।

প্রথমেই তিনি লোককথা বিশ্লেষণের ওপরে গুরুত্ব দেন। লোককথা বিশ্লেষণে কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য তিনি এন্‌টি আর্নেকে ভার দিলেন। শুধুমাত্র দায়িত্ব দিয়েই তিনি ভারমুক্ত হলেন না, প্রতিনিয়ত আর্নেকে পরিচালনা করতে লাগলেন। এন্‌টি আর্নেকে সবসময় সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন হেলসিংকির অসকার হ্যাকম্যান, কোপেনহেগেনের অ্যাক্সেল ওল্‌রিক, বার্লিনের জোহান্নেস বোল্‌ট এবং লুন্ডের সি. ডবলিউ. ফন সাইডো। তৈরি হল টাইপ—ইনডেক্স্ পদ্ধতি।

পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণের নানাবিধ পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। এই সবের মিলিত প্রচেষ্টাতেই লোকসংস্কৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি-বিদ্যাগুলির উৎসার ঘটল।

১.১ ☐ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতিটি লোককাহিনি বিশ্লেষণের তুলনামূলক পদ্ধতিতে অনুসরণ করেই সৃষ্টি হয়েছে। এই পদ্ধতিকে ফিনিশীয় পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়। ফিন্‌ল্যান্ডের দুই লোকসংস্কৃতিবিদ জুলিয়াস ক্রোন এবং তাঁর পুত্র কার্ল ক্রোন এই ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির স্রষ্টা। জুলিয়াস ফিন্‌ল্যান্ডের জাতীয় মহাকাব্য 'কালেভালা'র বীররসপ্রধান গীতিকাধর্মী কাব্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে কার্ল ক্রোন ফিনল্যান্ডের দুটি পশুকথাকে বিশ্লেষণের সূত্রে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেন। ১৮৮৩ সালে 'বাঘ ও শেয়াল' এবং ১৮৯১ সালে 'মানুষ ও খেঁকশেয়াল'—এই দুটি পশুকথার পাঠান্তর নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেন তিনি; এই পদ্ধতির সহায়তায় একটি বিশেষ লোককাহিনির ভৌগোলিক পরিক্রমাগত এবং ঐতিহাসিক অবস্থানগত সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এই পদ্ধতির উৎসকথায় যেতে হলে বলতে হবে 'বোল্‌ট-পোলিভ্‌কা'র কথা। জার্মান পণ্ডিত জোহান্নেস বোল্‌ট এবং চেক পণ্ডিত গিওর্গ পোলিভ্‌কা গ্রীমভাইদের সঙ্কলিত কাহিনিগুলিকে ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত এবং তুলনামূলক কাহিনিসূচি প্রস্তুত করেন। একেই বলা হয় 'বোল্‌ট-পোলিভ্‌কা। মূলত এই কাহিনি সূচিকে অবলম্বন করেই পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মত গড়তে শুরু করেন যে, কি কি কারণে একই ছকের কোনো কাহিনি কিছু কিছু রূপান্তর নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে অজস্র সংখ্যায় ও অজস্র রূপে পাওয়া যায়। এই গবেষণা-রীতিরই সমান্তরালভাবে উদ্ভব হল এই ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির।

এই পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয় বিশেষ কোনো একটি লোককথার বিশ্বব্যাপী যত পাঠান্তর আছে তার বিশ্লেষণ; এই বিশ্লেষণ করার সূত্রে উদ্ভাবিত ও সম্ভাব্য সমস্তরকম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানগুলিকে বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি এটিও বিশ্লেষণ করতে হবে যে কীভাবে কাহিনিগুলি অবিরত মৌখিকভাবে বিবৃত/কথিত হবার সময় রূপান্তরিত হয়। এইভাবেই সেই লোককাহিনিটির আদি রূপকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এই পদ্ধতি একদিকে যেমন লোককথাটির উৎস-নির্ণয়ে সহায়ক, তেমনি লোককথাটির পরিভ্রমণ-পরিক্রমার তথ্য সন্ধানেরও সহায়ক। সেকারণেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে অসংখ্য লোককথার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট কাহিনির ভিন্ন ভিন্ন পাঠ একই সাংস্কৃতিক বলয়ে এবং একই অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্থানে পাওয়া যায়—লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান অনুযায়ী যাদের 'অইকোটাইপ' বলা হয়। অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল ও সাংস্কৃতিক বলয়ে প্রাপ্ত অনুরূপ কাহিনিগুলির মধ্যে কে কার পূর্ববর্তী এবং

কাহিনিগুলির আদিমতম রূপ, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে যাকে আর্কিটাইপ বলা হয়, তাও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। আদি কাহিনিটি কীভাবে পরিভ্রমণ করতে করতে নিজের বাইরে রূপের পরিবর্তন ঘটিয়েছে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে ধারণা করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ বলা যায় যে বোল্‌ট-পোলিভকা গবেষণায় যে দুই পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব—কাহিনির 'বহু উৎস-সম্ভাবনা' < পলিজেনেসিস > এবং 'পরিভ্রমণ সম্ভাবনা' < মাইগ্রেশান > -এর সমন্বয় সংঘটিত হয়েছিল, সেটিরই সমচরিত্রের পদ্ধতি হল এই ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি। কিন্তু লক্ষণীয় যে জুলিয়াস ক্রোন এবং তাঁর পুত্র কার্ল ক্রোন দুজনেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে কাহিনির পরিভ্রমণ-তত্ত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; অর্থাৎ তাঁরা কাহিনির বহু উৎস সম্ভাবনাকে প্রায় অগ্রাহ্য করেছেন। এছাড়াও এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি কাহিনির শুধুমাত্র ইতিহাস ভূগোলটুকুই খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয় এবং এর মাধ্যমে লোক-ঐতিহ্যের প্রকৃত বাহক ও ধারক লোকসমাজের ভূমিকা বিশেষ মূল্যায়িত হয় না।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে একটি কাহিনির যতগুলি সম্ভব পাঠ সংকলিত করে তাদের দেশ এবং ভাষাগতভাবে বর্গীকরণ করে এক-একটি সূচকচিহ্নে চিহ্নিত করা হয় প্রাথমিকভাবে। এরপর কাহিনির প্রাপ্ত পাঠগুলিকে ভৌগোলিক বিন্যাস অনুযায়ী সজ্জিত করে নেওয়া হয়; এরপর অভ্যন্তরীণ বর্ণনা এবং ভাষা ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠগুলির ইতিহাসগত পূর্বপরম্পরাটি নির্ণয় করার চেষ্টা হয়। প্রতিটি পৃথক পাঠের নিজস্ব কাহিনির ভগ্নাংশগুলিকে আলাদা আলাদা করেও নেওয়া হয়, যাতে মূল বা আদি পাঠের কাঠামোটিকে চিহ্নিত করে তোলার চেষ্টা করা যায়। এর ফলে মূল কাহিনি-কাঠামোটির পাশাপাশি কাহিনির পৃথক পৃথক অংশগুলিরও একটি ক্রমান্বয়ী তালিকাও তৈরি হয়ে যায়; এছাড়াও আর্কিটাইপটি ও অইকোটাইপগুলিও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে একাধিক কাহিনি মিশ্রিত অবস্থায় আছে; সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ বেশ দুরূহ হয়ে ওঠে। সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আইকোটাইপের প্রতিটিকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করার পর বৈচিত্র্যের জটগুলি খুলে বহু চেষ্টায় সম্ভাব্য আর্কিটাইপটি উদ্ধার করা সম্ভব। দেশকাল ভেদে বিভিন্ন পাঠের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়ের আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, তাও স্বীকার্য।

অত্যন্ত পরিচিত দুটি কাহিনিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে : প্রথমটি ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত 'কাজলরেখা' গীতিকাটি এবং 'কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা' বা 'সূঁচ রাজপুত্র' নামক প্রচলিত রূপকথা। রূপকথা বা গীতিকার মাধ্যমে যে কাহিনি আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে একই কাহিনির দুটি অইকোটাইপ বা পাঠান্তর। দুটি কাহিনিরই মূল রূপটি এরকম : দাসী কর্তৃক রানিকে ছলনা করা এবং রানি সেজে অত্যাচার করার কারণে শাস্তিরূপে দাসীর মৃত্যু ঘটা। অর্থাৎ এটি হল কাহিনির পাঠান্তরের আর্কিটাইপ। গল্পাংশ এরপর পৃথক : প্রথম অইকোটাইপ, সূচবিদ্ধ মৃত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ (কাজলরেখা); দ্বিতীয় অইকোটাইপ, রাজা কর্তৃক রাখালের বন্ধুত্ব অস্বীকার করার শাস্তি হিসেবে অজস্র সূচে বিদ্ধ হয়ে থাকা (কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা)। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মৃতের সঙ্গে বিবাহ এবং মৃতের পুনর্জীবনলাভের ঘটনার মধ্যে আদিমকালের জাদু-নির্ভর মানসিকতার পরিচয় মেলে। অন্যদিকে রাখালের বন্ধুত্বকে রাজার অস্বীকার করার মধ্যে রয়েছে পরবর্তীকালীন শ্রেণিবৈষম্যমূলক সমাজভাবনা। সুতরাং ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি অনুযায়ী 'কাজলরেখা'র কাহিনিটি 'কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা' কাহিনির তুলনায় প্রাচীনতর। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কাজলরেখা'র কাহিনিটি সৃষ্টি হয়েছে ময়মনসিংহ

অঞ্চলের গারো-হাজং-বাঙালি অধ্যুষিত এক মিশ্রিত সামাজিক পরিবেশে; 'কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা' কাহিনিটির উদ্ভব অঞ্চল হল ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলের অবিমিশ্র বাঙালি সমাজে। পরিভ্রমণ-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাচীনতর 'কাজলরেখা'র কাহিনি ময়মনসিংহ থেকে বিক্রমপুর ঢাকা অঞ্চলে অগ্রসর হয়েছে। তবে সবরকম কাহিনির ক্ষেত্রেই যে এমনতর সহজ সিদ্ধান্ত করা চলে, তা নয়। যেমন বাংলা রূপকথা 'ঘুমন্তপুরী' এবং ইউরোপীয় রূপকথার 'স্লিপিং বিউটি' প্রকৃতপক্ষে একই কাহিনি-কাঠামোর ভিন্ন রূপ। প্রথম কাহিনিটিতে সোনার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যার ঘুম ভেঙেছে এবং দ্বিতীয় কাহিনিটিতে ঘুম ভেঙেছে রাজপুত্রের চুম্বনে। এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সামাজিক আচারের পৃথক মানদণ্ড ব্যবহৃত। এই মানদণ্ডের বিচারে পরিভ্রমণতত্ত্বে কোন কাহিনিটি প্রাচীনতর তা সহজে বা এককথায় বলে দেওয়া সম্ভব নয়।

এইভাবে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিটি বিচার করা যায় : মনে করা যাক, একটি কাহিনির মোট ৭০টি পাঠান্তর খুঁজে পাওয়া গেল ভারতবর্ষ, চিন এবং জাপান—এই তিনটি দেশে। এখন, এদের মধ্যে ভারতে প্রাপ্ত পাঠ ২২টি, চিনে ৩৮টি এবং জাপানে ১০টি যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে প্রারম্ভিকভাবে ঐ তিন দেশের সূচক-সংকেত হিসেবে 'ভা' (ভারত), 'চি' (চিন), 'জা' (জাপান)—এই তিনটি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। আবার ধরে নেওয়া যাক ভারতের ২২টি পাঠের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি, ওড়িশায় ৬টি, বিহারের ৫টি, পাঞ্জাবে ৪টি এবং কাশ্মীরে ২টি পাওয়া গেল। এগুলিকে প্রথমে যথাক্রমে এইভাবে চিহ্নিত করতে হবে :

ভা/প.ব/...১/...৩/...৫;
ভা/ও/...১/...৩/...৬;
ভা/বি/...১/...৩/...৫;
ভা/পা/...১/...২/...৪;
ভা/কা/...১/...২;

আবার, প্রত্যেকটি ভারতীয় রাজ্যেরও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই পাঠগুলিকে সংকলিত করা হয়েছে; তাই প্রথমে জেলা, তারপর মহকুমা, গ্রাম, ইত্যাদি আলাদা-আলাদা সূচক চিহ্নে নির্দিষ্ট করা হবে প্রত্যেকটি পাঠান্তরেই। অর্থাৎ একটি গল্পের পরিচয় সংকেত, এই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ক্রমবিন্যাস বজায় রেখে এই রকম হবে :

দেশ / রাজ্য / জেলা / মহকুমা / ব্লক (প্রয়োজনভিত্তিক)। গ্রাম / প্রাপ্ত গল্প একাধিক হলে তার সংখ্যা।

এই একইভাবে অন্যদেশের পাঠগুলিও এইভাবে চি/.../...১/... বা জা/.../...১/... এইরকম বর্গ এবং প্রাসঙ্গিক উপবর্গে বিভক্ত হয়ে সংখ্যায়িত হবে। এইভাবে বর্গীকরণ-উপবর্গীকরণের মাধ্যমে পাঠগুলি নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পর প্রতিটি পাঠের কাহিনি-কাঠামোকে বিশ্লেষিত করে ফেলতে হবে। প্রতিটি পাঠকেই তার ক্ষুদ্রতম সম্ভাব্য বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ৭০টি পাঠের প্রত্যেকটিরই কাহিনি রেণুগুলিকে বিশ্লেষণ করে সাজাতে হবে। এরপর প্রতিটি পাঠের সমতুল্য কাহিনি-অংশগুলিকে সমান্তরালভাবে সাজাতে হবে এবং এদের পারস্পরিক তুলনা করে একটি ব্যাপ্ত-চেহারার পাঠ তৈরি করা প্রয়োজন। এটিই 'মাস্টার স্ক্রিপ্ট' বলে বিবেচিত হবে। এই ব্যাপ্ত-পাঠের সঙ্গে ৭০টি পাঠের প্রতিটিকে মিলিয়ে দেখে যেটির সঙ্গে এর সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষিত হবে, এই পদ্ধতিতে সেটিই হল 'আর্কিটাইপ'; অন্যগুলি স্থান-কাল-সমাজ সাপেক্ষে বিবর্তিত 'অইকোটাইপ'।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির ব্যাপক সার্থকতা থাকলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সবচেয়ে প্রথমে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিটি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে হলে নির্দিষ্ট একটি লোককাহিনির বিশ্বব্যাপী পাঠান্তর সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যা কোনোদিন বোধহয় সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ গবেষণা ও সংকলন যত বিস্তৃত হবে, ততই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে নতুন নতুন পাঠান্তর আবিষ্কৃত হবে।

অস্ট্রিয়ার লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যালবার্ট ওয়েস্‌লেসকি (১৮৭১-১৯৩৯) একটি সিদ্ধান্ত করেন, যা ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করে। তাঁর মতে লোককথার পাঠান্তরের উপর নির্ভর করার কারণে মৌখিক পাঠগুলির তুলনায় লিখিত পাঠগুলির উপর নির্ভর করতে হয় বেশি—কিন্তু এটি লোক-ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কারণ লোককাহিনির মৌখিক বিস্তৃতি সম্পর্কিত সঠিক তথ্যগুলি অনেক সময়েই লিখিত পাঠান্তরে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে নৃ-বিজ্ঞানীরা একাধিকবার প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ লোককাহিনিই পরিভ্রমণ ব্যতিরেকে নিরপেক্ষভাবে লোকসমাজে গড়ে ওঠে। সারা বিশ্ব জুড়েই লোকসমাজের অসম বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরগুলিকে প্রতিটি সমাজকেই অতিক্রম করতে হয়। সেসূত্রে সামাজিক মানুষ কতগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গিয়ে তারা সদৃশ চিন্তা প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে একই অভিজ্ঞতাকে লোককাহিনিতে রূপ দিতে গিয়ে একই ধরনের কাহিনিধারা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং সবসময় সেই কাহিনিধারার 'আর্কিটাইপ' বা মূলরূপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সমস্ত পাঠ মিলিয়ে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচারের পর এক 'আর্কিটাইপ' খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় পাঠান্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করে। সেক্ষেত্রে অনেক সময়েই আঞ্চলিক পাঠগুলিই গবেষকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে; ফলে সঠিক 'আর্কিটাইপ' নির্ধারণে ভ্রান্তি ঘটতে পারে। সুইডেনের লোকসংস্কৃতিবিদ কার্ল ভিলহেলম ফন সাইডো (১৮৭৮-১৯৫২) এই সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, একটি নির্দিষ্ট লোককাহিনির প্রাপ্ত যাবতীয় পাঠান্তর যদি পৃথক দুজন গবেষকের কাছে পাঠানো হয় তবে দেখা যাবে দুজন দুটি ভিন্ন 'আর্কিটাইপ' খুঁজে বের করেছেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে সবসময় আদিতম পাঠ নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

১.২ ☐ টাইপ-ইনডেক্স্ পদ্ধতি

এই পদ্ধতি এন্‌টি আর্নের আবিষ্কার, যদিও প্রথম থেকেই অনেক অধ্যাপক তাঁকে সহযোগিতা করেন। লোককথা বিশ্লেষণে টাইপ—ইনডেক্স্ পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়ক নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের পরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর তালিকায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে। প্রথম ভিত্তি তিনিই গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯২৬ সালে কার্ল ক্রোন তালিকার ত্রুটি লক্ষ্য করে স্টিথ টমসনকে তালিকার পরিবর্ধন করে সম্পূর্ণতা দান করতে অনুরোধ করেন। দু-বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে আর্নের তালিকার পরিবর্ধন ও সম্পূর্ণতা সম্ভব হল। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হল 'দ্য টাইপস্ অব দ্য ফোকটেল'—এন্‌টি আর্নে আর স্টিথ টমসনের যুগ্ম নামে অমর হয়ে রয়েছে এটি গ্রন্থ।

১৯৩৫ সালে লুন্ডে শহরে অনুষ্ঠিত ফোকলোর কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয়, টাইপ ইনডেক্স্-এর আরও সংশোধন প্রয়োজন, কেননা ইতিমধ্যে বিশ্বে লোককথা সংগ্রহের ভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে, নতুন

নতুন টাইপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেই প্রস্তাব গৃহীত হলেও কার্যকর হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা বাজতে শুরু করেছিল ১৯৩৩ সালে, হিটলারের অভ্যুত্থানে। এক অনাগত অশান্তি বিস্তৃততর হয়, প্রস্তাব গ্রহণের চার বছর পরেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় যায়, —কাজ আর এগোয়নি।

আর্নের তালিকাকে স্টিথ টমসন সমৃদ্ধতর করলেও টাইপের যে সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তিনি সেই সংজ্ঞাকেই মেনে নিলেন। টাইপের সংজ্ঞায় বলা হল, —A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one motif or of many.

লোককথার মেজাজ ও চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে, এক-একটি লোককথা এক-একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। একটি নির্দিষ্ট টাইপ বেছে নিয়ে আমরা জানতে পারব, বিশ্বের আর কোথায় এই লোককথাটি কিংবা অনুরূপ টাইপের লোককথা প্রচলিত আছে,—এর সম্ভাব্য উৎসস্থান কিংবা উৎসস্থানগুলিও আবিষ্কার করা সম্ভব। লোককথাটি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কিংবা কোন কোন বাড়তি অংশ যুক্ত হয়েছে তাও নির্ধারণ করা সম্ভব।

লোককথার অনেক ভাগ রয়েছে যথা পশুকথা, রূপকথা, পরীকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তি লোকপুরাণ প্রভৃতি। একটি লোককথা অতি সরল কিংবা জটিল হতে পারে, কিন্তু কথক যখন সেই লোককথা বলবেন, তখন দেখা যাবে একটি স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ মেজাজ এর মধ্যে রয়েছে—এটাই টাইপ। লোককথার সরলতা, জটিলতা কিংবা বর্ধিত করার মানসিকতার ওপরে টাইপ প্রভাবিত হয়না। সে নিরপেক্ষ, অটুট। টাইপের মধ্যে যে নিরপেক্ষ বিবৃতি থাকে তাতে অনুভব করা যায়, একটি জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ কয়েকটি টাইপেরই সন্ধান মিলবে। সেই জনগোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা-আচার-আচরণ-প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ-মানসিক স্তর ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে দেয় কোন কোন টাইপের লোককথা সেই সমাজে প্রচলিত হবে।

এন্‌টি আর্নে ও স্টিথ টমসন লোককথার টাইপগুলির তালিকা এইভাবে সাজিয়েছেন :

ক. পশুকথা

১-৯৯	বন্য পশু
১০০-১৪৯	বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু
১৫০-১৯৯	মানুষ ও বন্য পশু
২০০-২১৯	গৃহপালিত পশু
২২০-২৪৯	পাখি
২৫০-২৭৪	মাছ
২৭৫-২৯৯	অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

খ. সাধারণ লোককথা

৩০০-৩৯৯	অলৌকিক বাধা
৪০০-৪৫৯	অলৌকিক বা মোহময় স্বামী, মোহময়ী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়রা
৪৬০-৪৯৯	অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কাজ, অসাধ্য সাধন

৫০০-৫৫৯	অলৌকিক সাহায্যকারী ও সাহায্যকারিণী
৫৬০-৬৪৯	জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০-৬৯৯	অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০-৭৪৯	অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি
৭৫৯-৮৪৯	ধর্মীয় ও নীতিমূলক কাহিনি
৮৫০-৯৯৯	রোমাঞ্চকর ও রোমান্টিক কাহিনি
১০০০-১১৯৯	বোকা রাক্ষসের কাহিনি

গ. হাসি ও পারিবারিক লোককথা

১২০০-১৩৪৯	বোকার কাহিনি
১৩৫০-১৪৩৯	স্বামী-স্ত্রী
১৪৪০-১৫২৪	একজন বালিকা বা নারীর কাহিনি
১৫২৫-১৮৭৪	একজন বালক বা পুরুষের কাহিনি
১৮৭৫-১৯৯৯	মিথ্যাবাদীর কাহিনি
২০০০-২৩৯৯	সূত্রমূলক কাহিনি
২৪০০-২৪৯৯	অশ্রেণিভুক্ত কাহিনি

১৯৩৫ সালে লুন্ডে শহরে ফোকলোর কংগ্রেসে টাইপসূচি সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা যৌথভাবে প্রতিপালিত হতে পারেনি। কিন্তু ১৯৬১ সালে স্টিথ টমসন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'ফোকলোর ফেলোজ কম্যুনিকেশ্যন'-তথা 'এফ এফ সি'-র ১৮৪তম সংখ্যায় ১৯২৮ সালের পুরনো সূচির আরও সম্প্রসারণ ঘটান।

গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে পৃথিবীর নানা দেশে লোকসংস্কৃতি গবেষণায় জোয়ার আসে। লোকসংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা-শৃঙ্খলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা দেশে লোককথা সংগৃহীত হতে থাকে, অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ সেসব লোককথার টাইপ সূচি তৈরি করেন। নতুন নতুন টাইপ আবিষ্কৃত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, কেরল এবং বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য লোককথার সংগ্রহ প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেসবের টাইপ সূচি নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ কাজ চলতে থাকে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, আর্নেথ এবং টমসন যে ২৪৯৯টি মূল টাইপ নির্ধারণ করেছিলেন, আজও তার বাইরে কোনো টাইপ আবিষ্কৃত হয়নি।

আসলে এঁরা দুজন মূল টাইপ সংখ্যা নির্ধারণ করে তা সম্প্রসারণের পথও খোলা রেখেছিলেন। এই সম্প্রসারণ করা হয় ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে। যেমন বন্য পশু ও গৃহপালিত পশুর টাইপ ১০০-১৪৯, ১০১ সূচিতে রয়েছে গৃহপালিত পশু শিশুকে রক্ষা করে। কিন্তু একটি পশুকথায় পাওয়া গেল বেজি শিশুকে রক্ষা করে, এখানে সম্প্রসারণ করে টাইপ করা হল ১০১গ। ক কিংবা খ-তে অন্য পশু শিশুকে রক্ষা করে। এভাবেই তালিকাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ দিলে টাইপ সূচি সহজে বোঝা যাবে।

ক. দুজনে বন্ধুত্ব হল, কুমির আর শেয়াল। তারা চাষ করতে গেল। আলুর চাষ। ফসল বড় হল, শেয়াল নিল গোড়ার দিক, কুমির পেল আগার দিক। কুমির ঠকে গেল। এবার করল ধানের

চাষ। কুমির এবার গোড়ার দিক চাইল। এবারও সে ঠকে গেল। তারপর করল আখের চাষ। কুমির চাইল আগার দিক। আবার সে ঠকে গেল। (টুনটুনির বই : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)

টাইপ : ৯গ বন্য পশু ❑ ফসলের ভাগাভাগিতে শেয়াল পেল শাঁসালো অংশ আর কুমির পেল শুকনো অংশ।

খ. এক যে ছিল রাজা। তার কোনো ছেলেপুলে ছিল না। সাধু ওষুধ দিলেন, যমজ ছেলে হবে। কিন্তু যমজের একটি ছেলে তাঁকে দিতে হবে। ষোলো বছর বয়স যখন যমজ দুই ছেলের, সাধু এলেন একটা ছেলে নিতে। বড়ো ছেলে গেল সাধুর সঙ্গে। বড়ো ছেলে একটি গাছ পুঁতে গেল, সবুজ-সতেজ থাকবে যতদিন সেই গাছ, ততদিন সুস্থ থাকবে সেই ছেলে। এক রাক্ষসী রূপবতী মেয়ের বেশে বড়ো ছেলেকে পাশা খেলায় হারিয়ে তাকে গর্তে ফেলে রাখল। সবুজ-সতেজ গাছ শুকিয়ে গেল। ছোটো ছেলে রাক্ষসীকে পাশা খেলায় হারিয়ে দাদাকে ফিরিয়ে আনল। তাদের কৌশলে দুষ্টু সাধু মারা পড়ল। দুই ভাই বাড়ি ফিরে এল। (ফোক টেলজ অব বেঙ্গল : লালবিহারী দে)

টাইপ : ১৫৪২ ❑ চালাক ছেলে

বাংলা লোককথায় যেসব টাইপ অতি জনপ্রিয়, তার তালিকা দেওয়া হল :

৪৯	ভালুক ও বন্ধু
৫০	অসুস্থ সিংহ
৫০ক	শেয়াল দেখল সব পদচিহ্ন সিংহের গুহার দিকে, কোনোটা বাইরের দিকে নয়
৫১	সিংহভাগ
৫৯	আঙুর ফল টক
৬০ক	শেয়াল ও পাখি একে অন্যকে নিমন্ত্রণ করে
৭৬	নেকড়ে ও সারস
৭৭	ঝরনার জলে প্রতিবিম্ব দেখে হরিণ নিজের শিং এর প্রশংসা করে
৯২	সিংহ নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কুয়োয় লাফিয়ে পড়ে
১০১গ	বেজি শিশুকে রক্ষা করে
১০৩	বন্য পশু অপরিচিত পশুকে দেখে ভয়ে পালায়
১১০	বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে
১১১ক	নেকড়ে ও ভেড়ার বাচ্চা
১৫৫ক	অকৃতজ্ঞ বাঘ আবার বন্দি হল
১৬০	কৃতজ্ঞ পশু ও অকৃতজ্ঞ মানুষ
১৯৯	ভালুক তার কানে কি বলে গেল
২১০ক	শিঙি মাছ, বেল, গোবর ও ক্ষুর
২৪৮ক	বিড়াল ও টুনটুনি
৩০০	রাক্ষসী হত্যাকারী
৩০২ক	রাজপুত্রকে রাক্ষসের দেশে পাঠানো হল

৩০৩	দুই একাত্মা ভাই
৩১৩খ	জাদু-প্রাসাদে সাহায্যকারিণী মেয়ে
৩১৫	অবিশ্বাসী বোন
৩৩০	তাঁতি ভূতকে বোকা বানায়
৩৩০গ	বামুন ভূতকে বোকা বানায়
৩৩১	বোতলের মধ্যে ভূত
৩৩৩	মৃত রাজপুত্র জীবন ফিরে পায়
৪০৯ক	বউয়ের বেশে পেত্নি
৪১০	ঘুমন্ত রূপবতী
৪৭৩	দুষ্টা নারীর শাস্তি
৪৮০ক	চাঁদের চরকা-কাটা বুড়ি
৫৬০	জাদু আংটি
৭০০	বুড়ো আঙুলের সমান নায়ক
৭০৭ই	সাত ভাই চম্পা
৮৮৮	সতী নারী
১২৪০	যে ডালে বসে আছে সেই ডাল কাটে
১৩৩৩	রাখাল প্রায়ই নেকড়ে বলে চেঁচায়
১৩৬৫	দজ্জাল বউ
১৪০৭	হাড়-কিপ্‌টে
১৬৪১	সবজান্তা
১৬৮৫	বোকা জামাই
১৯৫০ক	কুঁড়ের বাদশা
২০৩০খ	কাক ও চড়াই
২০৩৪গ	নাককটা শেয়াল

বাংলা লোককথার বৈচিত্র্য অসাধারণ। আমরা বাংলা লোককথায় খুব সুস্পষ্টভাবে ১৬৫টি টাইপের সন্ধান পেয়েছি। ওপরে যে নমুনাগুলি দেওয়া হল, বাংলা লোককথাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে সেই লোককথার টাইপ কিভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

১.৩ ☐ মোটিফ-ইনডেক্স্ পদ্ধতি

টাইপ তালিকার সংজ্ঞা নির্ধারণের সময়েই মোটিফ কথাটির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল—It may consist of only one motif of many। সেই কারণে এই দুটি পদ্ধতি আজ একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এন্‌টিআর্নে টাইপ তালিকা রচনার দায়িত্ব পেয়ে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করার পাশাপাশি মোটিফের গুরুত্বও উপলব্ধি করেছিলেন।

তিনি টাইপ ইনডেক্স্ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, —So far as possible a complete narrative has served as a basis for each type. It might also naturally be conceivable to work out a classification of separate episodes and motifs, yet this would have necessitated such a cutting into pieces of all complete folktales that the scholar would be able to make a much more limited use of the classification.

মোটিফের এই প্রাসঙ্গিক উল্লেখের পর থেকে মোটিফ তালিকা রচনার কাজ বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। তারপর এভাবেই বেশ কিছুকাল কেটে যায়। আর্নের টাইপ তালিকা সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়ার সময় থেকেই স্টিথ টমসন মোটিফ ইনডেক্সের কাজ শুরু করেন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে টমসন প্রকাশ করতে থাকেন মোটিফ তালিকা। পরবর্তী কালে সমস্ত মোটিফ একত্রিত করে ১৯৫৫-৫৮ সালে প্রকাশ করেন ছয় খণ্ডের পৃথিবীবিখ্যাত গ্রন্থ 'মোটিফ ইনডেক্স্ অব ফোক-লিটারেচার'।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসংস্কৃতি-গবেষক হলেন স্টিথ টমসন। ১৯১২ সালে তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে দু-বছর পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি হন। ১৯৪৬ সালে উত্তর ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট হন। ১৯৩৭ সালে পারি শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফোকলোর কংগ্রেসে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে আমেরিকার ফোকলোর ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা হন। সুইডেন ফিনল্যান্ড আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলা চিলি প্রভৃতি দেশের ফোকলোর সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর রচিত মোটিফ তালিকা লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর গবেষণার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

মোটিফ ইনডেক্স্-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে টমসন বলেছেন,—A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.

পৃথিবীর অসংখ্য জনগোষ্ঠীতে লক্ষ-কোটি লোককথা ছড়িয়ে আছে। এদের অধিকাংশেরই উৎপত্তি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। কেননা, অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মানুষ নিরক্ষর, তাঁদের লোককথা লিখিত আকারে তাঁরা প্রকাশ করার সুযোগ পাননি। গবেষকবৃন্দ ক্ষেত্রসমীক্ষা করে কিছু লোককথার সংকলন প্রকাশ করেছেন। এখনও নব্বই শতাংশ লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যেই রয়ে গিয়েছে। তবু যা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়—প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মূল বিষয় থাকে—এই মূল বিষয়কে বলে মোটিফ। শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে গৃহীত। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনি-ব্যবচ্ছেদ করলে তার মধ্যে এক বা একাধিক কাহিনি-অংশ পাওয়া যায়, সেই কাহিনি-অংশ বা কাহিনি-অংশসমূহকে টমসন মোটিফ বলেছেন। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনি-অংশ সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে।

লোককথার মধ্যে যেসব ছোটো ছোটো কাহিনি-অংশ বা মোটিফ থাকে, তারা নিজস্ব স্বাধীন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কালের প্রবাহকে অস্বীকার করে জীবিত থাকে এবং দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করেও টিকে থাকতে সমর্থ হয়।

স্টিথ টমসন মোটিফগুলিকে মূল এই ক'টি বর্গে-উপবর্গে সাজিয়েছেন :

এ. লোকপুরাণ

এ ০ - এ ৯৯	সৃষ্টিকর্তা
এ ১০০ - এ ৪৯৯	দেবতা

এ ৫০০ - এ ৫৯৯	উপদেবতা ও লৌকিক বীর
এ ৬০০ - এ ৮৯৯	বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব
এ ৯০০ - এ ৯৯৯	বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
এ ১০০০ - এ ১০৯৯	প্রাকৃতিক দুর্বিপাক
এ ১১০০ - এ ১১৯৯	প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা
এ ১২০০ - এ ১৬৯৯	মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি
এ ১৭০০ - এ ২১৯৯	জীবজন্তুর সৃষ্টি
এ ২২০০ - এ ২৫৯৯	জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য
এ ২৬০০ - এ ২৬৯৯	গাছ-গাছালির সৃষ্টি
এ ২৭০০ - এ ২৭৯৯	গাছা-গাছালির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

বি. জীবজন্তু

বি ০ - বি ৯৯	লোকপৌরাণিক জীবজন্তু
বি ১০০ - বি ১৯৯	ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু
বি ২০০ - বি ২৯৯	মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু
বি ৩০০ - বি ৫৯৯	বন্ধুভাবাপন্ন ও উপকারী জীবজন্তু
বি ৬০০ - বি ৬৯৯	মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিয়ে
বি ৭০০ - বি ৭৯৯	জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ

সি. ট্যাবু বা বিধিনিষেধ

সি ০ - সি ৯৯৯	ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও যৌনতা-সংক্রান্ত

ডি. জাদু

ডি ০ - ডি ৬৯৯	আকৃতি পরিবর্তন
ডি ৭০০ - ডি ৭৯৯	জাদুশক্তি থেকে মুক্তি
ডি ৮০০ - ডি ১৬৯৯	ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ
ডি ১৭০০ - ডি ২১৯৯	জাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

ই. মৃত

ই ০ - ই ১৯৯	পুনর্জীবন
ই ২০০ - ই ৫৯৯	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
ই ৬০০ - ই ৬৯৯	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
ই ৭০০ - ই ৭৯৯	আত্মা

এফ. অসাধ্য সাধন

এফ ০ - এফ ১৯৯	অন্য ভুবনে যাত্রা
এফ ২০০ - এফ ৬৯৯	বিচিত্র প্রাণী
এফ ৭০০ - এফ ৮৯৯	অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু
এফ ৯০০ - এফ ১০৯৯	অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ

জি. রাক্ষস-খোক্ষস-দৈত্য-দানব-ডাইনি

জি ০ - জি ৩৯৯	নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনি
জি ৪০০ - জি ৫৯৯	পরাভূত দৈত্য-দানব

এইচ. পরীক্ষা

এইচ ০ - এইচ ১৯৯	সনাক্তকরণ পরীক্ষা : চিনতে পারা
এইচ ২০০ - এইচ ৪৯৯	বিবাহ-সংক্রান্ত পরীক্ষা
এইচ ৫০০ - এইচ ৮৯৯	চাতুর্যের পরীক্ষা
এইচ ৯০০ - এইচ ১১৯৯	পৌরুষের পরীক্ষা : কার্যভার
এইচ ১২০০ - এইচ ১৩৯৯	সাহসের পরীক্ষা : অনুসন্ধান
এইচ ১৪০০ - এইচ ১৫৯৯	অন্যান্য পরীক্ষা

জে. চালাক ও বোকা

জে ০ - জে ১৯৯	জ্ঞানার্জন ও রক্ষা
জে ২০০ - জে ১০৯৯	চালাক স্বভাব ও বোকা স্বভাব
জে ১১০০ - জে ১৬৯৯	চালাকি
জে ১৭০০ - জে ১৭৯৯	বোকামি

কে. প্রতারণা

কে ০ - কে ৯৯	প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা
কে ১০০ - কে ২৯৯	প্রতারণার দ্বারা লাভ
কে ৩০০ - কে ৪৯৯	চুরি ও প্রতারণা
কে ৫০০ - কে ৬৯৯	প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া
কে ৭০০ - কে ৭৯৯	প্রতারিত করে বন্দি করা
কে ৮০০ - কে ৯৯৯	সাংঘাতিক প্রতারণা
কে ১০০০ - কে ১১৯৯	নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা করা
কে ১২০০ - কে ১২৯৯	অপমানিত হয়েও প্রতারণা করা
কে ১৩০০ - কে ১৩৯৯	প্রলোভিত কিংবা প্রতারণা করে বিয়ে

কে ১৪০০ - কে ১৪৯৯ প্রতারিতের সম্পত্তি বিনষ্ট
কে ১৫০০ - কে ১৫৯৯ ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত যে প্রতারণা
কে ১৬০০ - কে ১৬৯৯ প্রতারক নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে
কে ১৭০০ - কে ১৭৯৯ মিথ্যার দ্বারা প্রতারণা করা
কে ১৮০০ - কে ১৮৯৯ ছদ্মবেশ বা ভ্রান্তির দ্বারা প্রতারণা
কে ১৯০০ - কে ১৯৯৯ ভণ্ড প্রতারক
কে ২০০০ - কে ২১৯৯ মিথ্যা অপবাদ
কে ২২০০ - কে ২২৯৯ খলনায়ক ও বিশ্বাসঘাতক
কে ২৩০০ - কে ২৩৯৯ অন্যান্য প্রতারণা

এল. ভাগ্যচক্র

এল ০ - এল ৪৯৯

এম. ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

এম ০ - এম ৪৯৯

এন. অদৃষ্ট ও কপাল

এন ০ - এন ৮৯৯

পি. সমাজ

পি ০ - পি ৬৯৯

কিউ. পুরস্কার ও শাস্তি

কিউ ০ - কিউ ৫৯৯

আর. বন্দি ও পলাতক

আর ০ - আর ৩৯৯

এস. অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

এস ০ - এস ৪৯৯

টি. ইন্দ্রিয়

টি ০ - টি ৬৯৯ বিবাহ ও যৌনতা বিষয়ক

ইউ. জীবনপ্রকৃতি

ইউ ০ - ইউ ২৯৯

ভি. ধর্ম

ভি ০ - ভি ৫৯৯

ডবলিউ. চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য

ডবলিউ ০ - ডবলিউ ২৯৯

এক্স্. হাসি-ঠাট্টা

এক্স্ ০ - এক্স্ ১৭৯৯

জেড. বিভিন্ন ধরনের মোটিফ

জেড ০ - জেড ৯৯	সূত্র
জেড ১০০ - জেড ১৯৯	সংকেতধর্মিতা
জেড ২০০ - জেড ২৯৯	বীর
জেড ৩০০ - জেড ৩৯৯	বিশেষ ব্যতিক্রম

মোটিফ তালিকার মূল যে ভাগ, তা টমসন ইংরেজি বর্ণমালার 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত (ও, আই এবং ওয়াই—এই বর্ণ তিনটি বাদ দিয়ে) মোট ২৩টি বর্গে সাজিয়েছেন। মানবজীবন ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে এই বর্ণগুলির দ্বারা সূচিত অনুভাগের বাইরে আর কোনো বিষয় হতে পারেনা। পৃথিবীর অসংখ্য মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ইতিহাস ও লোককথার প্রাণবস্তু-তথা মূল চরিত্রলক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করেই টমসন এই সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

টমসনের মোটিফ তালিকা প্রকাশ করার পরে মনে হতে পারে, নতুন কোনো লোককথার মোটিফ আবিষ্কৃত হলে তার স্থান কীভাবে এই তালিকায় যুক্ত হবে? তালিকাকে সম্প্রসারণশীল করবার জন্য তিনি মূল ভাগগুলির অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক-নির্ভর প্রথা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে নতুন মোটিফ আবিষ্কৃত হলেও কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। টাইপ তালিকার মূল ২৪৯৯ সংখ্যাকে যেমন ক খ গ ঘ হিসেবে বাড়িয়ে নেওয়া যায়, মোটিফের মূল সংখ্যাগুলিকেও দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করে তালিকাকে সম্প্রসারণ করবার পথ রাখা হয়েছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া হল। পৃথিবীখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ভেরিয়ার এলুইন ১৯৪৯ সালে 'মিথ্স্ অব মিড্ল্ ইণ্ডিয়া' এবং ১৯৫৪ সালে 'ট্রাইবাল মিথ্স্ ইন ওড়িশা' গ্রন্থ দুটির লোককথার মোটিফ ইনডেক্স্ তৈরি করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, মধ্যভারত ও ওড়িশার লোককথায় এমন অনেক নতুন মোটিফের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যা টমসনের মূল তালিকায় নেই। কিন্তু এলুইনের কোনো অসুবিধা হয়নি, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করে নতুন নতুন মোটিফের সংখ্যা গ্রন্থভুক্ত করতে পারলেন। এখানেই টমসনের তালিকার বিজ্ঞাননির্ভর সম্প্রসারণশীলতা নির্ভর করছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, টমসনের মূল ভাগগুলির বাইরে এখনও পর্যন্ত কোনো মোটিফের সন্ধান মেলেনি।

মোটিফ তালিকা প্রস্তুতের পেছনে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের ধারণা সক্রিয় ছিল। মানবসভ্যতার মানসিক বিবর্তনের স্তরগুলির কথা চিন্তায় ছিল বলেই মোটিফ তালিকার শ্রেণিবিন্যাসের মূল ভাগগুলি ধাপে ধাপে

অগ্রসর হয়েছে। সংখ্যার বিশেষত্ব সম্পর্কে টমসন বলেছেন, —A numbering system was devised, remotely similar to that used by the Library of Congress, so that the Index can be indefinitely expanded at any point. Every motif has a number indicating its place in the classification. The details of the system are not difficult.

লোকসংস্কৃতির পদ্ধতি বিশ্লেষণে সবচেয়ে জটিল পদ্ধতি হল রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, সেই আলোচনা পরে করা যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে মানবিক (মানবজীবন ও মানবসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই অর্থে) ও বিস্ময়কর পদ্ধতি হল মোটিফ-নির্দেশী পদ্ধতি। কথাটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

মোটিফ তালিকা গড়ে উঠেছে লোককথাকে ঘিরে। লোককথার যে বিষয়টি সকলকে বিস্মিত করে তা হল এর অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা। মানবসমাজের বিবর্তনে সামাজিক-অর্থনৈতিক যে অসম বিকাশ ঘটেছে তা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণায় আমরা জেনেছি। কিন্তু বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের যে কোনো জনগোষ্ঠীর লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। সংস্কৃতি ভাষা আচার-আচরণ পালা-পার্বণ-পরব-লোকবিশ্বাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান নানা ধরণের হলেও জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় একই ধরনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আনাগোনা করেছে। তাই এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে বিরোধ-বিভেদ-স্বাতন্ত্র্যগুলি নজরে পড়ে, মনে হয় সেসব বিভেদ বহিরঙ্গ ও অতি তুচ্ছ, —এদের আসল পরিচয় মানসিক সেতুবন্ধনে। আর এই বন্ধনের অনন্য পরিচয় রয়েছে লোককথাগুলির মধ্যে। লোকসমাজের উদার মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভাজন কিংবা আরোপিত সাংস্কৃতিক বিভেদ কিছুই মেনে নেননা। অনেক সময় এসবের কোনো সংবাদই তারা রাখেন না। মানবসমাজ এই বিবর্তনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। কোনো আরোপিত সীমানা তাদের বিশ্বজনীন মনকে রুদ্ধ করতে পারে না। তাদের মানবিকতার পূর্ণ পরিচয় গড়ে উঠেছে মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের মাধ্যমে।

এই বিস্ময়কর বিশ্বজনীন মানসিকতা ধরা পড়েছে মোটিফ ইনডেক্স্-এর মাধ্যমে। আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অনেক লোককথায় রয়েছে, কিন্তু আঞ্চলিকতার সেই খোলস ছাড়িয়ে ফেললে আমরা দেখতে পাব এক সর্বজনীন অভিপ্রায়ের রূপ। লোককথা একই সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন। মোটিফ সেই মনকে ধরতে সাহায্য করে। তাই মোটিফ তালিকার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব মানবসমাজের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অভিন্নতা।

একটি জনগোষ্ঠী কিংবা দেশের লোককথার বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয় মোটিফের বৈভবে ও বৈচিত্র্যে। বাংলা লোককথার বৈচিত্র্য ও মোটিফের আধিক্য দেশি-বিদেশি লোকসংস্কৃতিবিদদের বিস্মিত করেছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে লালবিহারী দে'র 'ফোক টেলজ অব বেঙ্গল' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ইউরোপীয় প্রশাসক, পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ, দেশীয় নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রা বাংলা লোককথার যেসব সংকলন প্রকাশ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা লেককথার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আমেরিকার লোকসংস্কৃতি-গবেষক স্টিথ টমসন, জার্মানির ভারততত্ত্ববিদ হাইন্‌ৎস মোডে ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতিবিদ্ অরুণকুমার রায় সাম্প্রতিককালে বাংলা লোককথার সংকলনগুলির কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ করবার সময় এই বৈচিত্র্যের বিষয়টি বারবার উল্লেখ করেছেন।

অন্য একটি তথ্যও রয়েছে। মোটিফ সবচেয়ে বেশি থাকে রূপকথায়। আফ্রিকার কংগো ও ইউরোপের

আয়ারল্যান্ডের দুটি রূপকথায় সর্বাধিক বারোটি করে মোটিফ রয়েছে। কিন্তু বাংলা রূপকথা 'কিরণমালায়' রয়েছে পনেরোটি মোটিফ। একটি গল্পে এর চেয়ে বেশি মোটিফের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। সেই হিসেবে 'কিরণমালা' রূপকথাটি বিশ্বের লোককথার ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

বিশেষ কোনো একটি লোককথার উদাহরণ দিলে মোটিফ ইনডেক্স ব্যাপারটিকে ভাল করে বোঝানো যাবে। এই সূত্রে প্রথমেই 'কিরণমালা'-র মোটিফ দেখানো হল :

ক. রাজ্যের প্রজারা কেমন আছে তা জানবার জন্য রাজা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। একদিন রাজা শুনলেন,—তিন বোন বলছে, তিনজন মানুষের সঙ্গে বিয়ে হলে তারা সুখী হবে। ছোটো বোনের সঙ্গে রাজার বিয়ে হল। রানির পরপর তিনটে সন্তান হল—দুই ছেলে এক মেয়ে। অন্য রানির সন্তান হওয়ার সময় বড়ো দুই বোন আঁতুড়ঘরে ছিল। তিন ছেলেমেয়েকে জলে ভাসিয়ে রাজাকে বলল, কুকুরছানা বিড়ালছানা ও কাঠের পুতুল প্রসব করেছে ছোটো রানি। জল থেকে তুলে এক ব্রাহ্মণ তিনজনকে মানুষ করলেন। নাম রাখলেন অরুণ বরুণ কিরণমালা। পালক এই পিতা মারা গেলেন। তিনজনে অট্টালিকা গড়ল। দুই ভাই মায়া পাহাড়ে হিরের গাছে সোনার ফল, সোনার পাখি আনতে গেল। তরোয়ালে মরচে ধরলে অরুণ মারা যাবে। তিরের ফলা খসে পড়লে এবং ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে গেলে বরুণ মালা যাবে। তাই হল। মায়া পাহাড়ে তারা পাথর হয়ে গেল। বোন কিরণমালা মায়া পাহাড়ে গেল, পেছনে তাকালো না। হিরের গাছের সোনার পাখির কথায় জলের ছিটা-ফোঁটা ছড়িয়ে সেখানে মরে-পড়ে-থাকা বহু রাজপুত্রকে জীবন ফিরিয়ে দিল। অরুণ বরুণ কিরণমালা রাজ্যে ফিরে এল। রাজাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার সময় সোনার পাখি এই সব কথাই খুলে বলল। (ঠাকুমার ঝুলি : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার)

১.	বি ১২২.১	যে পাখি উপদেশ দেয়
২.	বি ১৮৩	জ্ঞানী পাখি
৩.	বি ২১১.৩	কথাবলা পাখি
৪.	সি ৩৩১	নিষেধাজ্ঞা : পেছন ফিরে তাকানো
৫.	সি ৯৬১.২	নিষেধাজ্ঞা ভাঙার জন্য পাথরে পরিণত হয়
৬.	ডি ৫৬২.১	জলের ছোঁয়ায় রূপ পরিবর্তন
৭.	ডি ১২৪২.১	জাদু-জল
৮.	ই ৭৬১.৪.৭	জীবন-লক্ষণ : তরবারিতে মরচে ধরা
৯.	ই ৭৬১.৭.১৩	জীবন-লক্ষণ : তিরের ফলা খসে যায় ও ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে যায়
১০.	এফ ৮১১.১.৮	হিরের গাছ
১১.	এফ ৮১৩.০.২	সোনার ফল
১২.	কে ১৮৩৫	গুপ্তচরের ছদ্মবেশ
১৩.	কে ২১১৫	বস্তুকে জন্ম দেওয়ার অপবাদ
১৪.	এল ৫০	বিজয়িনী কনিষ্ঠা কন্যা
১৫.	জেড ৭১.১	সংকেত-সংখ্যা : দুই ছেলে এক মেয়ে

মোটিফ সূচির 'এক্স' বিভাগ হল হাসি-ঠাট্টা। তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই লোককথার মোটিফের সংখ্যা খুব কম।

খ. এক রাখাল বলল, আমার কর্তাবাবার গোয়ালে এত গোরু ছিল যে, ভোরবেলা থেকে দশজন লোক গোরুর গলার দড়ি খুলতে আরম্ভ করত আর শেষ হত সন্ধেবেলা। অন্য রাখাল বলল, আমার কর্তবাবার একটা এক উঁচু বাঁশ ছিল যে, বৃষ্টি না হলে কর্তবাবা সেই বাঁশ দিয়ে আকাশে খোঁচা মারলে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরত। প্রথম রাখাল বলল, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনা? তোর কর্তবাবার সেই বাঁশ থাকত কোথায়? দ্বিতীয় রাখাল বলল, কেন? তোর কর্তাবাবার গোয়ালে! (প্রচলিত লোককথা)

১. এক্স্ ৯০০ মিথ্যে কথার মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি

২. এক্স্ ১০২০ অতিশয়োক্তি

বাংলা লোককথার অতি-পরিচিত কিছু মোটিফের উল্লেখ করা হচ্ছে। যারা বাংলা লোককথার বিভিন্ন প্রামাণ্য সংকলন পড়েছেন তারা সহজেই মোটিফ দেখে কোন লোককথার প্রসঙ্গ আসছে তা বুঝতে পারবেন।

এ ১৩৬.১.৩ বৃষবাহন দেবতা
এ ৪৬৩ ভাগ্যদেবী বা ভাগ্যদেবতা
এ ৪৮২.১ দুর্ভাগ্যের দেবতা
এ ৪৮২.২ সৌভাগ্যের দেবী
এ ৭৫১.৮.১ চাঁদের চরকা-কাটা বুড়ি
বি ১১.১১ সাপের সঙ্গে যুদ্ধ
বি ৪১.২ পক্ষীরাজ ঘোড়া
বি ১২০ বুদ্ধিমান পশু
বি ১২০.২ বুদ্ধিমান শেয়াল
বি ১২২.১ যে পাখি উপদেশ দেয়
বি ১৪৩ জ্ঞানী পাখি
বি ২১০ কথাবলা পশু
বি ২১১.৩.৪ কথাবলা শুকপাখি
বি ২১১.৩.৭ কথাবলা টুনটুনি
বি ২১৫.৫ পাখির ভাষা
বি ২৪০.৪ পশুরাজ সিংহ
বি ২৪০.৫ বাঘ
বি ২৪৫.২ ব্যাম-রাজপুত্র
বি ২৮০ পশুর বিয়ে
বি ৫৩৫ পশুধাত্রী
সি ২৫০.৩ নিষেধাজ্ঞা : একবারের বেশি ডুব না-দেওয়া
সি ৩৩১ নিষেধাজ্ঞা : পেছন ফিরে তাকানো

সি ৯৩০	নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীনতা
ডি ৪২.২	রাক্ষসী মানবী-মূর্তি ধারণ করে
ডি ৪২.৩	দৈত্য মানুষের রূপ ধারণ করে
ডি ৯৭	রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে ডাইনি
ডি ১৫০.৩	রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে পেঁচা
ডি ২১২	রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে ফুল
ডি ৬২১.১	দিনে পশু রাতে মানুষ
ডি ৭৩৩	ঘ্যানঘ্যান-করা বউ
ডি ৯৭৫	জাদুফুল
ডি ১২৭৩	জাদুপ্রণালী
ডি ১৩৪৭.৩	জাদু-ওষুধ বন্ধ্যাকে সন্তানবতী করে
ডি ১৩৬৪.১৮	কাঠির ছোঁয়ায় জাদু-ঘুম কাটে
ডি ১৪৭২.১.১২.১	হাঁড়ির মধ্যে থেকে অফুরন্ত খাদ্য আসে
ডি ১৮৬৬.১	স্নানের মাধ্যমে সৌন্দর্য
ডি ১৮৬৬.২	স্নানের মাধ্যমে কদাকার
ডি ১৯৬০.৩	ঘুমন্ত রূপবতী
ই ০	পুনর্জীবন
ই ৬৪.১.১.১	রূপোর কাঠি মৃত্যু আনে বা ঘুম পাড়ায়, সোনার কাঠি বাঁচিয়ে এবং/অথবা জাগিয়ে তোলে
ই ৫৭৮.২	ভূতেরা আগুন পোহায়
ই ৬০০	পুনর্জন্ম
ই ৭১০	বহিরঙ্গ আত্মা
ই ৭৬১.৩	জীবনলক্ষণ : গাছ কিংবা ফুল শুকিয়ে যায়
ই ৭৬১.৪.৭	জীবনলক্ষণ : তরবারিতে মরচে ধরে
এফ ১১	আকাশপথে যাত্রা
এফ ১২২	রাক্ষসের দেশে যাত্রা
এফ ২০০	পরী
এফ ৪৫০	বামনাকৃতি মানুষ
এফ ৬১০	অস্বাভাবিক শক্তিমান মানুষ
জি ১১.৬	মানুষখেকো নারী
জি ৮৪	হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ
জি ১০০	দৈত্য
জি ৫৭২	রাক্ষস কৌশলের দ্বারা পরাজিত হল
এইচ ৩১.১২	কেবল পিতা বা মাতা ফুল তুলতে পারবে

এইচ ১০১০	অসম্ভব কাজ
এইচ ১০১০.৩	অজানা কাজ
এইচ ১০৪৭	কাজের ভার : বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আনতে বলা
এইচ ১৩৮৫.৮	নিরুদ্দিষ্ট ভাইয়ের জন্য অনুসন্ধান
জে ১১১২	বুদ্ধিমতী বউ
জে ১৭০৫.২	বোকা বামুন
জে ১৭০৫.৩	বোকা জোলা
জে ২০৮১.১	কনের বদলে ঢোল
জে ২১৬০	অপরিণামদর্শিতা
কে ১০০	প্রতারণার মাধ্যমে লাভ
কে ৩০১	সুচতুর চোর
কে ৩১১.৪.২	সাধুর ছদ্মবেশে প্রতারক
কে ১২১০	প্রতারিতা নায়িকা
কে ১৯১১.১	মিথ্যে রানি
কে ২১১০.১	নিন্দিতা বউ
কে ২১১৫	পশুকে জন্ম দেওয়ার জন্য অপবাদ
কে ২২১১	বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা
এল ১০	বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র
এল ১৬২	অতি সাধারণ নায়িকা রাজপুত্রকে বিয়ে করে
এল ৪৫১	পুনর্মিলন
এম ২০৩	রাজার কথা অপরিবর্তনীয়
এম ৩৬১	ভাগ্যবান নায়ক
এন ৫৪৩.১	মাটির নিচে গুপ্তধনের সন্ধান
এন ৬৮৩.২	অপরিচিতাকে হাতি তুলে আনে ও সে রাজপুত্রের বউ হয়
পি ২৫৩	ভাই ও বোন
পি ৬১১	স্নানের সময়ে নারীর সঙ্গে দেখা
কিউ ২	দয়ালু ও নির্দয়
কিউ ২০০	পাপের শাস্তি
আর ১৩১.১১.৩	পথিক রাজপুত্রকে উদ্ধার করে
আর ১৬৯.৭	মন্ত্রী পরিত্যক্তা রানিকে উদ্ধার করে
এস ১১	নিষ্ঠুর পিতা
এস ৩১	নিষ্ঠুর সৎমা
এস ৫১	নিষ্ঠুর শাশুড়ি
এস ৪১০	উৎপীড়িতা স্ত্রী

টি ১১.৪.২	অদেখা মেয়ের চুল দেখে তারই প্রেমে পড়া
টি ৫১১.১.৩	আম খেয়ে গর্ভবতী হওয়া
টি ৬৮৫	যমজ ভাই
ইউ ১৩৬.১	অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কাজ পালটে নেয়, আরও অসন্তোষ বাড়ে
ভি ৪৩৬	আঁটকুড়ের হাত থেকে সাধু ভিক্ষে নেবে না
ডবলিউ ১১১.১.১.১	পি-পু-ফি-শু
এক্স্ ১২৪.৩	জামাই শ্বশুরবাড়িতে অসুবিধায় পড়ে
এক্স্ ৯০০	মিথ্যে কথার মাধ্যমে হাস্যরস
জেড ৭১.৫.১	সংকেত সংখ্যা : সাত ভাই এক বোন
জেড ৭১.৫.৮	সাত ভাই সাত বোনকে বিয়ে করে

বাংলা লোককথার যেসব সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং অতি প্রচলিত লোককথাগুলির মোটিফ বিশ্লেষণ করে এখানো পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে ৮৭৬টি প্রধান বা মুখ্য মোটিফ পাওয়া গিয়েছে। এই সংখ্যা অবশ্যই গর্ব করবার মতো। আমাদের বিশ্বাস, আরও বেশি লোককথা যা এখনও শুধুমাত্র মৌখিক ঐতিহ্যে আবদ্ধ রয়েছে তা সংকলিত হলে বাংলা লোককথার মোটিফের সংখ্যা আরও বাড়বে নিশ্চিতভাবে।

১.৪ ☐ রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি

লোকসংস্কৃতির আলোচনায় সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। ১৯২৮ খ্রি. সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকসংস্কৃতিবিদ ভলাদিমির জে প্রপ্ লেনিনগ্রাড থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন; নাম 'মরফোলজিয়া স্কাজ্‌কি'। এই গ্রন্থে লোককাহিনির রূপতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ করা হয়। ১৯৫৮ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়; নাম 'মরফোলজি অব দ্য ফোকটেল'। এর আগেও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল, তবে প্রপের পূর্বে কোনো গবেষকই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে দেখাননি। প্রপের মতে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে প্রথমে সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করে নিয়ে তার যথার্থ শ্রেণিকরণ করতে হবে; কিন্তু কাহিনিগুলির মৌলিক তাৎপর্য অনুধাবন না করে শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে শ্রেণিকরণ করলে হবে না। লোককাহিনিগুলির অন্তর্নিহিত ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উপর নজর দিতে হবে।

প্রপ্ তাঁর 'মর্ফোলজি অব দ্য ফোকটেল' গ্রন্থের ভূমিকাতেই জানিয়েছেন যে, উদ্ভিদবিজ্ঞানে উদ্ভিদের গঠনরীতি নির্ণয়ে প্রতিটি অংশের যেমন গুরুত্ব আছে, ঠিক তেমনি লোককাহিনি গঠনের সূত্রে তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অংশের পারস্পরিক এবং সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। প্রপ্ মূলত রাশিয়ান রূপকথা বা বিলীনা জাতীয় কাহিনিকে কেন্দ্র করে তাঁর তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন; ফলে স্বভাবতই বিশ্বজনীনভাবে এর প্রয়োগের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তিটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কারণ বিভিন্ন পণ্ডিত-গবেষকরাও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন দেশের লোককাহিনিগুলিতে নিজের নিজের পারিবেশিক সংস্কৃতি অনুসারে বাইরের চেহারায় বৈচিত্র্য ঘটলেও অন্তর্লীন কাঠামো রচনা এক ধরণের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্যবোধের অধীন।

প্রপের পদ্ধতির মূল বনেদ হল ফাংশনাল ইউনিট (সক্রিয়মূল একক)-এর স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করে তাদের মাধ্যমে কাহিনির রূপগত পরিচয়কে নির্দেশ করা। কাহিনির কাঠামো নির্মিতিতে সক্রিয়মূল এককের তুলনায় রূপতাত্ত্বিক এককগুলি ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাহিনির রূপতত্ত্বগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এর মূল্য খুব বেশি। আসলে কাহিনি তৈরি করে একাধিক সক্রিয়মূল একক বা ফাংশনাল ইউনিট; এর মধ্যেই নিহিত থাকে রূপতাত্ত্বিক একক। বাংলা লোককথাসংগ্রহ থেকে গোপাল ভাঁড়ের কাহিনিমালার একটি কাহিনি দিয়ে বক্তব্যটিকে স্বচ্ছতর করা যেতে পারে :

১. কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে একখণ্ড হিরে চুরি হল।

২. কিছুতেই চোর ধরতে না পেরে রাজা অবশেষে গোপালের শরণাপন্ন হলেন।

৩. গোপালের পরামর্শমতো রাজা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আলাদা আলাদা জায়গায় রাখলেন।

৪. গোপাল তাদের প্রত্যেকের কাছে একতাল নরম কাদা দিয়ে বললেন একখানা হিরে ঠিকমতো গড়ে দিতে পারলে রাজা তাকে পুরস্কার দেবেন।

৫. একজনমাত্র লোক ঠিক সেই চোরাই হিরের মতো একখানা কাদার হিরে তৈরি করে দিতে পারল।

৬. গোপাল তাকেই হিরে চোর বলে সনাক্ত করলেন।

কাহিনিটিতে ছয়টি সক্রিয়মূল একক রয়েছে, যার রূপতাত্ত্বিক একক মাত্র একটি : 'বুদ্ধিচাতুর্য দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধি।' এই সূত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রূপতাত্ত্বিক এককগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দিলেই একটি কাহিনি তৈরি হতে পারে না; কারণ কাহিনির ক্ষেত্রে আপাতভাবে অপ্রয়োজনীয় বাকি অংশগুলিরও কিছু-না-কিছু ভূমিকা আছে।

এই পদ্ধতিতেই প্রপের তত্ত্বের তাৎপর্যটি অনুধাবন করা যাবে। তাঁর মতে, গঠনতত্ত্ব বিচার করতে গেলে আনুভূমিক (হরাইজন্টাল) এবং উল্লম্ব (ভার্টিক্যাল)—এই দু-রকম পাঠেরই প্রয়োজন আছে। আঙ্গিকের অপরিবর্তনীয়তা এবং কাহিনির বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপাত-দ্বন্দ্বের যে সমস্যা, তার নিরসন করতে হলে কাহিনির বিভিন্ন স্তরের অন্তর্গত উপাদানগুলির চরিত্র, তা পরিবর্তনশীল না অপরিবর্তনীয়—তা বিশ্লেষণ করারও প্রয়োজন আছে। পদ্ধতিটি প্রয়োগ করার সময় কাহিনির অন্তর্লীন যে-সমস্ত উপাদান-উপকরণ আছে সেগুলির সমতুল্যতা বিচার্য। যদি দেখা যায় যে একাধিক কাহিনির চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ ইত্যাদি পারস্পরিকভাবে তুলনাযোগ্য তবে বলা যায় যে রূপতাত্ত্বিকভাবে কাহিনিগুলি সমধর্মী এবং কাহিনির কাঠামোগত বিন্যাসকে অব্যাহত রেখে এই সমধর্মিতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূলত কাহিনির অভ্যন্তরীণ সক্রিয়মূল এককগুলির < ফাংশনাল ইউনিট > স্বরূপলক্ষণকে বিচার করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনির রূপতাত্ত্বিক গঠনগত পরিচয়কে নির্দিষ্ট করা হয়।

প্রপ্ কাহিনির গঠনগত বিন্যাস বিচার করার ক্ষেত্রে সেইসব উপাদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যেগুলি তাঁর গঠনপদ্ধতির সাধারণী উপকরণ। তাঁর মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক বিন্যাস হল গল্পগুলির গঠন-পদ্ধতির উপাদানগত নির্ভরত্বের বিন্যাস। উপায় এবং প্রকৃতি যেরকমই হোক না কেন, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়টির সমতুল্যতার বিচারই হল এক্ষেত্রে প্রধান। বক্তব্যটি বোঝাবার জন্য প্রপ্ যেসব উদাহরণ হাজির করেছেন, সেখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন কাহিনির সাপেক্ষে ভিন্নতর পদ্ধতিতে নায়ক এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। প্রপ্ এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে এই উপাদানগুলির মধ্যে

কিছু উপাদান অপরিবর্তনীয় এবং কিছু উপাদান পরিবর্তনশীল। কয়েকটি বাংলা লোককাহিনি থেকে উদাহরণ নিয়ে বক্তব্যটি ভালভাবে বোঝানো যেতে পারে :

(১) একটি কাক বুদ্ধিকৌশলে চড়ুইকে ঠকিয়ে তার ছানাদের খেয়ে নিল। পরে মা চড়ুইকে খেতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটে মারা গেল। (বর্গ : পশুকথা)

(২) এক রাক্ষস ভয় দেখিয়ে কোনো রাজকন্যাকে বন্দী করে রাখল। রাজপুত্র রাক্ষসের মুণ্ড কেটে হত্যা করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল। (বর্গ : রূপকথা)

(৩) কোনো এক জমিদার জোর করে এক প্রজার বউয়ের সম্ভ্রমহানি করল। প্রজারা খেপে গিয়ে জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেল্‌ল। (বর্গ : কিংবদন্তী)

(৪) এক সুদখোর মহাজন গরিব লোকদের প্রতারিত করে অর্থ শোষণ করত। এক চালাক ব্যক্তি বুদ্ধিকৌশলে তাকে দেউলিয়া করে দিল। (বর্গ : সামাজিক বিবরণী)

কাহিনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্গের বলেই বহিরঙ্গিক কাঠামোয় পৃথক; কিন্তু গঠনগত বিচারে এগুলি অবশ্যই অনুরূপ বা সদৃশ। কাহিনিগুলির অন্তর্লীন মিল এইভাবে লক্ষণীয় :

	(১)		(২)		(৩)		(৪)
*	কাক	=	রাক্ষস	=	জমিদার	=	সুদখোর মহাজন
	(১)		(২)		(৩)		(৪)

* ঠকিয়ে ছানাদের খাওয়া – রাজকন্যাকে বন্দী রাখা – সম্ভ্রমহানি করা – অর্থ শোষণ করা

	(১)		(২)
*	পায়ে কাঁটা ফুটে মরে যাওয়া	=	রাজপুত্রের হাতে মাথা কাটা যাওয়া
	(৩)		(৪)
	= আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা	–	বুদ্ধিকৌশল দেউলিয়া করা

এগুলি হল পরিবর্তনশীল উপাদান; এর অন্তর্লীন কাঠামোতে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হল অন্যের উপর পীড়নকারী চরিত্র পীড়ন করার পরিণতিতে শাস্তি পাচ্ছে। —এই উপাদানটি সর্বদাই অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ বহির্কাঠামোয় সক্রিয়মূল একক/ক্রিয়াগুলি প্রতিটি কাহিনিতে ভিন্ন হলেও অন্তর্কাঠামোয় তারা অভিন্ন। এটিই প্রপের মৌলিক তত্ত্ব।

প্রপের গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল এই যে, যাবতীয় রূপকথাই গঠন ও উপাদানে অভিন্ন কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আর এই গঠনবিন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে প্রপ্ মোট তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন : চরিত্রের কাজ, চরিত্রের ভূমিকা, রূপান্তর। এর মধ্যে চরিত্রের কাজই হল প্রধান সহায়ক। প্রপের মতে কাজ বলতে চরিত্রেই সেই সক্রিয়তাকে বোঝাবে, যা কিনা ঘটনাপ্রবাহকে তাৎপর্যময় করবে। তবে এই সূত্রে স্মরণীয় যে কাহিনির সূচনা কোনো সক্রিয়তার নিদর্শন না হলেও, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। < প্রপ্ ১০০টি রাশিয়ান রূপকথাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, চরিত্রের এই জাতীয় কাজ সংখ্যায় মোট ১৭২টি; এবং এই 'সক্রিয়তা'-গুলিই রাশিয়ান রূপকথার সমস্ত কাজ, যা চরিত্রের মধ্যে বিভাজিত। গাণিতিক চিহ্ন ও রোমান অক্ষরের সাহায্যে এই কাজগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রপের মতে এই কাজগুলির অনুক্রম কয়েকটি নিজস্ব নিয়ম, যুক্তি ও শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং ঠিক এই কারণেই সমস্ত কাজেরই কালানুক্রমণ পরস্পরসদৃশ। এই সূত্রে একথাও স্বীকার্য যে, সব রূপকথাতেই সব কাজের

দেখা পাওয়া যায় না; তবে কোনো গল্পে কিছু কাজের অনুপস্থিতি অন্য গল্পে ঐ কালানুক্রমণকে ব্যাহত করে না।

চরিত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রপ্ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যে-কোনো রূপকথাতেই সর্বাধিক সাতটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঃ নায়ক, খলনায়ক, হিতকারী, দাতা, বার্তাপ্রেরক, রাজকুমারী, রাজা। প্রত্যেকটি চরিত্রেরই নিজস্ব কৃত্য ও ভূমিকা আছে। প্রয়োজন বিশেষে সাতটির কম চরিত্রও ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সাতটির বেশি কখনও নয়। আবার কখনো যদি সাতটির অতিরিক্ত চরিত্রও থাকে, তারা সাধারণত সাহায্যকারী হিসেবে সংযোজিত থাকে। অন্যদিকে, চরিত্রগুলির বহিরঙ্গিয় পরিবর্তনের কারণেই আঙ্গিকের অপরিবর্তনীয়তা এবং বিষয়-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। তবে এই পরিবর্তনের কারণগুলি বেশ জটিল; বিভিন্ন দেশ, শিল্প-সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রভাব পড়ে লোককাহিনির মধ্যে। ফলে মূল কাহিনিটি বহু সময়েই সমকালীন ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমে বিষয়গত দিক থেকেও কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে যায়। তবে স্মরণীয় যে এই রূপান্তরণও সব সময়েই নিজস্ব কিছু নিয়মকে অনুসরণ করে চলে। প্রপের গবেষণা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, রূপকথার একটি বিশ্বজনীন ভাবনাগত কাঠামো আছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রপ্ জানিয়েছেন যে মানুষের সামাজিক রীতিনীতি এবং লোকাচারগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয় এবং তার তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়ে যায়; সেই রূপান্তরিত তাৎপর্যের প্রভাব সমসাময়িক গল্পেও পড়ে। অর্থাৎ সামাজিক প্রথা ও আচারগুলির গঠনপ্রকৃতি রূপকথার গঠনপ্রকৃতিকেও প্রভাবিত করে এবং মানুষের সামাজিক আচার, রীতিনীতি, বিবর্তনের স্তরধারার সঙ্গে রূপকথাগুলির একটি গূঢ় ঐতিহাসিক সম্পর্ক তৈরি হয়।

একই ছকের সমস্ত কাহিনিই গঠনবিন্যাসের অপরিবর্তনীয় উপাদানের দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত—একথা প্রপ্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই ধ্রুব উপাদানকে বনিয়াদে রেখেই তার উপর পরিবর্তনশীল (অধ্রুব) উপাদানগুলি নানাভাবে সজ্জিত হয়ে এক-একটি গল্পের চেহারা গড়ে তোলে। গল্পের মূল কাঠামোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু থেকে গল্প তৈরির নানা ধরনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। একটি বিশেষ গল্পে এক ধরনের সম্ভাবনা চিত্রিত হল; ঐ একই বিন্দু আরেকটি গল্পে হয়তো আরেক ধরণের সম্ভাবনা পরিণতি লাভ করে। এখন, প্রথম সম্ভাবনার সঙ্গে অন্তঃকাঠামোগতভাবে অনুরূপ সমস্ত ধরণের সম্ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। ঐ একই কথা দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি যতরকম সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, তারা ঐ একইভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক : যে চারটি কাহিনিকে বিশ্লেষণ করে প্রপের পদ্ধতিটি বোঝানো হয়েছে তার ১নং কাহিনিটিতে দেখি 'একটি কাক বুদ্ধিকৌশলে চড়ুইকে ঠকিয়ে তার ছানাদের খেয়ে ফেলল।' এই বিন্দুর বহু বিচিত্র সম্ভাবনা এইরকম হতে পারত :

কাক চড়াই ছানাদের না খেয়ে—

* তাদের ডানা ছিঁড়ে ফেলতে পারত;
* তাদের চোখ কানা করে দিতে পারত;
* তাদের গাছ থেকে ফেলে দিতে পারত; ইত্যাদি। এবং

একইভাবে, কাক কাঁটা ফুটে মরার বদলে—

* পা পিছলে পড়ে মরে যেতে পারত;
* গাছের উপর থেকে পড়ে মরে যেতে পারত;
* মা চড়াই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরে ফেলতে পারত; ইত্যাদি।

ঠিক একইরকমভাবে দ্বিতীয় কাহিনিটি যদি পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখা যাবে সেক্ষেত্রেও এই জাতীয় সম্ভাবনা রয়েছে। 'এক রাক্ষস ভয় দেখিয়ে কোনো রাজকন্যাকে বন্দী করে রাখল।' এই বিন্দুর বহু বিচিত্র সম্ভাবনা এইরকম হতে পারে :

রাক্ষস রাজকন্যাকে বন্দী না করে

* রোজ রাত্রে এসে রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে ভয় দেখাতে পারত;
* রাজকন্যার হাত পা বেঁধে রাজবাড়ির বাগানের গাছের নীচে ফেলে রাখতে পারত;
* রাজকন্যার ঘরে নিজের পোষা অজগরকে রেখে যেতে পারত পাহারা দেবার জন্য; ইত্যাদি এবং

একইভাবে রাজপুত্র রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে হত্যা করার পরিবর্তে—

* রাজপুত্র রাক্ষসকে তির ছুঁড়ে মেরে ফেলে দিতে পারত;
* রাজপুত্র ক্রমে-ক্রমে রাক্ষসের হাত-পা কেটে তাকে হত্যা করতে পারত;
* রাজপুত্র রাক্ষসকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে পারত; —ইত্যাদি

ঠিক একইরকমভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ কাহিনির বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা তৈরি করা যায়।

এই বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, বহুত্ব সত্ত্বেও কাহিনিগুলির বহুবিচিত্র সম্ভাবনার মধ্যে অন্তঃকাঠামোগত ঐক্য আছে। অর্থাৎ কাহিনির বিভিন্ন স্তর পর্যায়ের অন্তর্গত ধ্রুব-অধ্রুব উপাদানগুলি গল্পের বিকাশের অজস্ররকম সম্ভাবনার পথ খুলে দেয় এবং অন্তর্লীন অনুরূপতার কারণে বহিরঙ্গের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে নানা ধরণের ভাবনাগত ঐক্য নির্দেশক উপাদান ছড়িয়ে থাকে—ঘটনা/চরিত্রের সেই অন্তর্লীন ঐক্য খুঁজে বার করাই হল রূপতাত্ত্বিক বিচারের মূল উপজীব্য।

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে পরবর্তীকালে অনেক পণ্ডিতই সম্প্রসারিত করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন লেভি-স্ট্রোস, মারান্দা দম্পতি, অ্যালান ডান্ডেস প্রমুখ। প্রপ্ তাঁর পদ্ধতির শুরুতে মোটিফ ইনডেক্সকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, স্ট্রোসও তাই। তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটি মোটিফের বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্ট্রোসের পদ্ধতিকে বলা হয় 'প্যারাডাইমেটিক অ্যানালিসিস'। লেভি-স্ট্রোসের মতে পৌরাণিক লোককথা ও তার রূপতত্ত্ব—কোনোটিই অসভ্য বা বুদ্ধিহীন নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি নয়; এই দুই ক্ষেত্রেই আদিম মানুষের সচেতন মনের প্রয়াস লুকিয়ে আছে। লেভি-স্ট্রোস রূপতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতিতে 'বিপরীতমুখী দুটি শক্তির অস্তিত্বের' কথা স্বীকার করেছেন। এই যুগ্ম বৈপরীত্যকে তিনি বলেছেন, 'বাইনারি অপোজিশ্যন'। লেভি-স্ট্রস এইভাবে লোককথা বিশ্লেষণ করার কথা বলছেন : কাহিনির 'মোটিফ' বা ক্রিয়াশীলতাগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে অর্থবোধক পদ্ধতিতে সেগুলি সাজানো, তারপর বিপরীতমুখী বক্তব্য ও ক্রিয়াসমূহে চিহ্নিত করা। এর পরবর্তী ধাপে যুগ্ম বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়াশীলতায় কাহিনির অভ্যন্তরের ঘটনাগুলি আবর্তিত হবে এবং ক্রমে ক্রমে তা মধ্যস্থকারী শক্তির সহায়তায় কাহিনিতে একটি মনোহারী পরিসমাপ্তি লক্ষিত হবে। লেভি-স্ট্রোস তাঁর নির্দেশিত রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষর পদ্ধতির অনুধাবনের জন্য একটি সূত্র নির্দেশ করেছেন :

$fx\ (a) : fy\ (b) :: fx\ (b) : Fa^{-1}\ (y)$

এক্ষেত্রে

fx = সক্রিয়তা

a = প্রথম অবস্থা

b = মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগকারী শক্তি

fy = প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত; < লক্ষণীয় যে এর অবস্থান অর্থাৎ সংযোগকারী শক্তির সঙ্গে যুক্ত >

লেভি-স্ট্রোসের মতে যুগ্ম বৈপরীত্য বা বাইনারি অপোজিশান ব্যতিরেকে লোককাহিনির অন্তর্লীন সত্যকে কখনই উপলব্ধি করা যায় না। একেই তিনি 'মিথেম' নামকরণ করেছেন।

আমেরিকান পণ্ডিত অ্যালান ডান্ডেস প্রপের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তত্ত্বের সঙ্গে একটি নতুন সূত্র সংযোজিত করলেন। একে তিনি নামকরণ করেছেন 'মোটিফেম' < লেভি-স্ট্রোসের 'মিথেম' শব্দটির সাদৃশ্যে ডান্ডেস এই 'মোটিফেম' শব্দটি উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। > রেড ইন্ডিয়ান লোককথার রূপতত্ত্বগত আঙ্গিক বিচার করে তিনি সক্রিয়মূল এককের < functional unit > প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। ফলে পদ্ধতিটি অনেক সরলীকৃত হয়ে উঠেছে। এই দুটি বৈশিষ্ট্য হল 'অভাববোধ' (অনুপপত্তি/ল্যাক) এবং সেই অভাববোধের দূরীকরণ-প্রয়াস (অনুপপত্তির বিমোচন/ল্যাক লিকুইডেটেড)। যেমন 'কাক চড়ুইছানাকে খেয়ে ফেলল' < অনুপপত্তি/অভাববোধ >, কাক পায়ে কাঁটা ফুটে মরে গেল < অনুপপত্তির বিমোচন/অভাববোধ দূরীকরণ >। ডান্ডেসের মতে লোককাহিনির পরিণতিতে যদি বিষাদ থাকে, তবে সেটিও অভাববোধ বা অনুপপত্তি; ঠিক একইরকমভাবে যদি মিলন ঘটে, তবে সেটি অনুপপত্তির বিমোচন। তবে এত সরলীকৃত পদ্ধতি সমস্ত লোককাহিনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারেনা। কারণ, লোককাহিনির উপাদানগত জটিলতার কারণে ফাংশনগত জটিলতাও বৃদ্ধি পায়; সেক্ষেত্রে একেবারে সরাসরি অভাববোধ এবং তার বিমোচন ~ এইভাবে রূপতাত্ত্বিক বিচার করা সর্বদা সম্ভবপর হয় না।

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বৈপ্লবিক এবং প্রভাবশালী হলেও এর স্রষ্টা স্বয়ং প্রপ্‌ই এর সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। লেভি-স্ট্রোসও স্বীকার করেছেন যে, প্রপের পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা দুই-ই রয়েছে। ১৯৪৬ সালে লেনিনগ্রাড থেকে প্রকাশিত প্রপের একখানি গ্রন্থ 'দি হিস্টোরিক্যাল রুটস অব দি ফেয়ারি টেলজ' ~ এতে তিনি লোককাহিনির বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেন। নিরক্ষর গ্রামীণ লোকসমাজের সচেতন মনটিকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি গাণিতিক রূপতত্ত্বের পরিবর্তে সামাজিক পটভূমিকার বিশেষ গুরুত্বের কথা উল্লেখ ও আলোচনা করলেন। নির্দিষ্ট কিছু ছকের মাধ্যমেই শুধু লোককাহিনির সামগ্রিক রূপবিবর্তন ঘটে না, সেক্ষেত্রে দেশ-কাল-সমাজ-অর্থনীতি-পরিবেশ ইত্যাদিরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে যায়, এ কথাকে তিনি পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিলেন। এ তথ্যও অনস্বীকার্য নয় যে পরবর্তীকালে আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির উদ্ভাবনে প্রপের পদ্ধতি অনেকাংশেই গৌণ হয়ে গেছে। যদিও রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির স্বাভাবিক বিবর্তন হিসেবেই আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়। একথা ঠিক যে, প্রপ্ নির্দেশিত ৩১টি ফাংশনাল ইউনিটকে তার সূচক চিহ্ন সহ চূড়ান্তভাবে গণ্য করলে এই পদ্ধতির বিশ্বজনীনতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়; কারণ রুশীয় সংস্কৃতির বীলিনা ছাড়া এগুলির অধিকাংশেরই অন্যত্র ব্যবহারযোগ্যতা নেই। কারণ এই পদ্ধতির প্রয়োগরীতির স্থিতিস্থাপকতা পুরোপুরি দেশ-কাল-সংস্কৃতিনির্ভর। তাই প্রপের নির্দিষ্ট সংকেতচিহ্ন যদি নির্দিষ্ট দেশের সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বা নিরিখে সুপটুভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে বিরাট মাপের একটি কাহিনিও একটি সংক্ষিপ্ত বীজগাণিতিক রূপ নিয়ে পদ্ধতিটির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। এই সূত্রেই বলতে পারি যে, বাংলার লোককথাতেই ২৮৩টি সক্রিয়মূল একক খুঁজে পাওয়া গেছে, যারা একান্তভাবেই আমাদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে। সমস্ত সংস্কৃতিবলয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই এমন ব্যাপারটা হয়ে থাকে।

১.৫ ❑ আঙ্গিকবাদী পদ্ধতি

রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আঙ্গিকবাদী বা অবয়ববাদী পদ্ধতিতে। ক্লোদ লেভি-স্ট্রোস এই পদ্ধতির মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃত। লোকপুরাণ বা মিথের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করার সূত্রে তিনি এই গাণিতিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। আধুনিক সময়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই গাণিতিক প্রক্রিয়াজাত এই আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। মূলত ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণরীতি এই পদ্ধতির প্রেরণা হিসেবে গৃহীত হওয়ায় এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি অনেক বেশি সুপ্রতিষ্ঠ রূপ পেয়েছে। লেভি-স্ট্রোস ব্যতিরেকে পিয়ের মারান্দা, এলি কোঙ্গাস-মারান্দা, অ্যালান ডাণ্ডেস প্রমুখ এই পদ্ধতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন এবং পদ্ধতিটিকে অনেক সরলীকৃত করতে সক্ষম হয়েছেন।

লোককাহিনির বিশ্লেষণে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অনিবার্য লব্ধফল হল আঙ্গিকবাদী পদ্ধতি—একথা অনস্বীকার্য। প্রপ্ যেমন কাহিনি, বিচারের ক্ষেত্রে সক্রিয়মূল এককগুলিকেই 'প্রবলতম' শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনি স্ট্রোস, মারান্দা, ডাণ্ডেস প্রমুখ সক্রিয়মূল এককের পাশাপাশি কাহিনির অন্যতর উপাদানগুলির আঙ্গিক কাঠামোতে অবস্থিতির বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। ডাণ্ডেস এবং অন্যান্য আঙ্গিকবাদী বিশেষজ্ঞরা 'মোটিফ'তে বর্ণনাত্মক হিসেবেই গণ্য করেছেন; অন্যদিকে 'মোটিফেম' বা ফাংশনাল ইউনিট বা সক্রিয়মূল একক সম্পূর্ণভাবেই আঙ্গিক-কেন্দ্রিত। এই মোটিফেমের আবার অনেকগুলি উপরিবিভাগ থাকতে পারে; ভাষাবিজ্ঞানের 'অ্যালোমর্ফ' শব্দের অনুসরণে ডাণ্ডেস তার নামকরণ করেছেন 'অ্যালোমোটিফ'। ডাণ্ডেসের মতানুযায়ী কাহিনির আঙ্গিক নির্ণয়ের স্তরের এগুলি হল বস্তুগত উপাদান।

একটি কাহিনির অন্তর্গত একাধিক উপাদান-উপকরণের পারস্পরিক সম্পর্কটিই কাহিনির কাঠামো তৈরি করে। লেভি-স্ট্রোস যে আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটালেন তার মাধ্যমে সম্পর্কগুলি প্রাথমিকভাবে বিচার করে উপকরণগুলির গুরুত্ব ক্রমপরম্পরায় স্থির করা হয়। প্রপ তাঁর পদ্ধতিতে কাহিনির মৌল উপকরণরূপে 'অপরিবর্তনীয় এবং 'পরিবর্তনশীল'—দুটিকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। লোকপুরাণের গঠনাঙ্গিক বিচার করতে গিয়ে লেভি-স্ট্রোসও এই দুটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে যেমন 'কাক' = 'রাক্ষস' এবং 'ঠকিয়ে ছানাদের খাওয়া' = 'রাজকন্যাকে বন্দী রাখা'—আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিতেও একই। কাহিনিগুলির অন্তর্লীন কাঠামো যদি সমান্তরাল হয়, তবে আঙ্গিকগতভাবে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলেই ধরে নিতে হবে। কালগত বিবর্তনের তুলনায় কালনিরপেক্ষ ভিত্তিকেই লেভি-স্ট্রোস গুরুত্ব দিয়েছেন; পক্ষান্তরে প্রপ্ কালগত বিবর্তনকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রপ্ শুধুমাত্র কাহিনির চরিত্র ও তার কাজকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, লেভি-স্ট্রোসের মতে কাহিনির অন্তর্লীন সামগ্রিক কাঠামোটি যদি সমতুল্য হয়, তবেই আঙ্গিকগতভাবে কাহিনিগুলি তুলনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রপ যেখানে শুধুমাত্র চরিত্রের সমতুল্যতাকে বিশ্লেষণ করেছেন, লেভি-স্ট্রোস সেখানে কাঠামোটিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করছেন।

লেভি-স্ট্রোস মূলত এক জ্যামিতিক প্রতিভাসের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, যার প্রেরণায় রয়েছে ভাষাবিজ্ঞানের 'বাইনারি অপোজিশ্যন' তত্ত্ব। এর মাধ্যমেই কাহিনির সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এককগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ কাহিনির মধ্যে পরস্পর বিপ্রতীপ এককগুলি কিভাবে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় তাই নির্দেশ করা হয়। যেমন,

রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি আলোচনার সূত্রে যে কাহিনিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে কাক × চড়ুই; রাক্ষস × রাজকন্যা; জমিদার × প্রজার বউ; সুদখোর মহাজন × গরীব লোক—একইভাবে পরস্পর বিপ্রতীপ চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল।

ডাণ্ডেস যেমন সক্রিয়মূল এককের দুটি অংশ—অনুপপত্তি এবং অনুপপত্তির বিমোচন গ্রহণ করেছেন। লেভি স্ট্রোস এবং মারান্দা দম্পতি সেক্ষেত্রে ধনাত্মক (+) এবং ঋণাত্মক (–) রীতিতে সক্রিয়মূল এককে বিচার করে দেখিয়েছেন। মিথের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেভি-স্ট্রোসের যে ফর্মূলা রয়েছে (আগের অধ্যায়ে এটি উল্লেখিত হয়েছে), সেটি রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি আলোচনার সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে; সেটি হল :

fa (a) : fy (b) :: fx (b) : fa ^{1} (y); এক্ষেত্রে

(f) হল গণিতের অনুসারে 'ফাংশন' তথা সক্রিয়মূল এককের সূচক।

(b) হল সংযোগকারী।

(a) হল প্রথম অবস্থা, যা কিনা সামাজিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সক্রিয় উপাদান এবং এটি (fx) সক্রিয়তাকে নির্দেশিত করছে।

(fy) সক্রিয়তাটি প্রথমটির বিপরীত এবং (b)-কে প্রথম অবস্থায় নির্দেশিত করে। সুতরাং দেখা গেল যে (b) পর্যায়ক্রমিকভাবে দুটি সক্রিয়তার দ্বারাই সূচিত হচ্ছে এবং সেই কারণেই বিপরীত দুই অবস্থার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতে পারে।

লেভি-স্ট্রোসের সূত্র চরিত্রের বা ঘটনার সক্রিয়তা বা ভূমিকার ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস সজ্জাকে ব্যঞ্জিত করে। (a) একটি অবস্থা যা একবার সক্রিয়তাকে সূচিত করছে (a^{-1}) এবং y যে-সক্রিয়তাকে সূচিত করছে, তা হল (y) অর্থাৎ পদ্ধতিটির চূড়ান্ত লব্ধফল। ডাণ্ডেস একেই অন্যতরভাবে 'ল্যাক' এবং 'ল্যাক লিকুইডেটেড' বলেছেন। লেভি-স্ট্রোস তার নামকরণ করেছেন প্রাথমিক অবস্থায় একটি বিশেষ 'কাজ' (Task) এবং চূড়ান্ত অবস্থায় 'কাজের পরিসমাপ্তি' (Task fulfilled)।

লেভি-স্ট্রোসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম অবস্থায় সংযোগকারীর ভূমিকা হল, বলে দেওয়া অবস্থাটির রূপান্তর সাধন করা; দ্বিতীয়ত তার ভূমিকা প্রতিটি পরিবর্তিত অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সাহায্য করা। সুতরাং লেভি-স্ট্রোস স্পষ্টতই নির্দেশ দিচ্ছেন যে অনুপপত্তি বলে ডাণ্ডেস যাকে চিহ্নিত করেছেন বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিকে আবার বিশিষ্ট কোনো সক্রিয় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়।

পিয়ের মারান্দা ও এলি কোঙ্গাস-মারান্দা এবং লেভি-স্ট্রোস সক্রিয়মূল এককের দুটি প্রকরণকে স্বীকার করেছেন : ধরাত্মক (+) এবং ঋণাত্মক (–); কাহিনির (a) চরিত্র যদি (–) ভাবে সক্রিয় থাকে (fx) তবে সে প্রতিনায়ক বা ভিলেন এবং (b) চরিত্র যদি (+) ভাবে সমান সক্রিয় থাকে (fy) তবে সে নায়ক। (b) আবার পরিবর্তিত অবস্থায় ভাবে ও সমান দক্ষতার সক্রিয় থাকতে পারে, তবে সবসময়ে (a)-র সঙ্গে দ্বন্দ্বে/সংঘাতে (b) বিজয়ী হয়। লোককথার এটি একটি মৌলিক ধর্ম; এর থেকেই চূড়ান্ত লব্ধফলের যথার্থ মূল্যটি বুঝতে পারা যায়। (y) এক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় বিপরীত সক্রিয়তার সূচকচিহ্ন; রূপতত্ত্বগতভাবে বোঝাতে হলে এই ক্ষতি কিন্তু যথা-অর্থে ক্ষতি নয়, বরং প্রাপ্তি। সুতরাং এইভাবে তাকে সূচিত করা হয়েছে fa^{-1} (y) > fx (b). সূত্রটির প্রথম দুটি সংখ্যা কাহিনিগত দ্বন্দ্ববিন্যাসকে নির্দেশিত করছে, তৃতীয় সংখ্যাটি কাহিনির প্লটের গতি পরিবর্তনকে সূচিত করছে এবং সর্বশেষ সংখ্যাটি চূড়ান্ত অবস্থাকে বোঝাচ্ছে।

সূত্রটিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় : যদি দুটি বিপরীত প্রবণতা (x) এবং (y) কাহিনির সূচনাতেই

দুটি বিপরীত অবস্থার এবং (–) কে সুগভীর বৈপরীত্যে বাস্তবায়িত করে, তবে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তখন যে পরিণতি ঘটে, তা হল : $[fx(b)] * [fx(a)] \rightarrow fa^{-1}(y)$

$\therefore fx(a) : fx(b) :: fx(b) : fa^{-1}(y)$

এই সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করার জন্য একটি অতি পরিচিত বাংলা লোককাহিনি টুনটুনি ও নাককাটা রাজা-কে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা হল :

এক্ষেত্রে মারান্দাদের গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী, f = সক্রিয়মূল একক

a = ঋণাত্মক চরিত্র বা ক্রিয়া (খলনায়ক)

b = ধনাত্মক চরিত্র বা ক্রিয়া (নায়ক)

x = ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

y = রক্ষা করা — এরকম ধরে নেওয়া হয়

তাহলে, টুনটুনির পক্ষে ভালো = + = রাজার পক্ষে মন্দ

রাজার পক্ষে ভালো = – = টুনটুনির পক্ষে মন্দ

+	–
১. টুনির টাকা নেওয়া	১. রাজা কর্তৃক টাকা কেড়ে নেওয়া
২. টুনির টিপ্পনী	২. টুনিকে ধরে আনা
৩. রাজার টাকা ফেরৎ দেওয়া	৩. টুনিকে ফের ধরে আনা
৪. টুনির পালানো	৪. টুনিকে গিলে খাওয়া
৫. রাজার ব্যাঙ খাওয়া	
৬. রানদের নাক কাটা যাওয়া	
৭. টুনির ফের টিপ্পনী	
৮. টুনির ফের পালানো	
৯. রাজার নাক কাটা-যাওয়া	

$\therefore$ + '৯' > – '৪'

অর্থাৎ $fy(b)^9 > fx(a)^4$

এইভাবে পরস্পর বিপ্রতীপ এককগুলিকে চিহ্নিত করে এই আনুপাতিক গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে যে-কোনো প্রকরণের লোককাহিনির গঠনাঙ্গিক নিরূপণ করা সম্ভবপর।

১.৬ ☐ জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি

বিশ্বে লোকসংস্কৃতি-চর্চার প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয়তাবোধ ছিল সক্রিয়। জাতীয় ঐতিহ্য ও শিকড়ের সংস্কৃতির সুস্থ ভাবনা থেকেই লোকসংস্কৃতি-চর্চার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালেও প্রতিটি দেশের লৌকিক সংস্কৃতির অনুসন্ধানে এই মানসিকতাটাই কাজ করেছে। যেমন, পরাধীন ভারতবর্ষে উপনিবেশের মানুষ হিসেবে যে গ্লানি, অবমাননা ও উপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছিল, বিদেশি শাসকরা যেভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে

অবমাননা করে চলেছিল, তারই ফলস্বরূপ আমাদের সংস্কৃতিরও যে বহমান উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে তার প্রকাশের বাসনা থেকেই ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি-চর্চার সূত্রপাত ঘটে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকসংস্কৃতি-চর্চার পেছনে এই মানবিক আকুতি ছিল। দেশের লৌকিক সংস্কৃতি ও স্বদেশীয় মানুষের প্রতি সহজ স্বাভাবিক ভালোবাসা ও আকর্ষণের ফলেই এই মানসিকতা জন্মলাভ করে। সেই কারণে প্রথম পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চলে সংগ্রহের কাজে।

ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে একটি দেশের জাতীয় জীবনে ভাব-তরঙ্গের অভিঘাত এমন উদ্দীপনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে সেই দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজীবনের সূত্রপাত ঘটে। জাতীয়তাবোধ ও আত্মানুসন্ধান এর প্রেক্ষাপটে কাজ করে ঠিকই কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ ও আত্মানুসন্ধান কোনো ধরনের সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন নয়, নিজের সংস্কৃতির নবজীবন ঘটিয়েও সে বিপুলা পৃথিবীকে আত্মীয় করে নেয়। একে আমরা উদার সুস্থ জাতীয়তাবোধ বলতে পারি। এই জাতীয়তাবোধের সন্ধানই পাওয়া যায় অধিকাংশ দেশে।

কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ায় এই সুস্থ জাতীয়তাবোধে প্রথম আঘাত লাগল, এবং তা লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীতে ইয়াকব ল্যুডহ্বিক কার্ল গ্রিম 'গ্রিমের তত্ত্ব' প্রকাশ করলেন। এর আগে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই ইয়াকব গ্রিম ও ভিল্‌হেল্‌ম কার্ল গ্রিম জার্মানির কৃষকদের মৌখিক লোককথা কিছুটা পরিশীলিত করে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সংকলিত লোককথার গ্রন্থটির নাম Kinder-und-Hausmarchen (ছোটোদের এবং ঘরোয়া গল্পমালা) এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে Kinder-und-Hausmarchen গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ভিল্‌হেল্‌ম গ্রন্থের প্রথমে একটি প্রবন্ধ ভূমিকারূপে প্রকাশ করলেন, On the Nature of Folktales. আর এই সালেই ইয়াকব 'গ্রিমের তত্ত্ব' প্রকাশ করলেন যা সুস্থ জাতীয়তাবোধের বিপক্ষে উগ্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। আর্য জাতির মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার জন্ম হল।

গ্রিমের তত্ত্বে বলা হল, জর্মনই হল পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে উন্নততম, এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মূল হিসেবে জর্মন ভাষাকেই গ্রহণ করা উচিত—তখনই বোধহয় সূক্ষ্মভাবে এই জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির ক্ষীণ সূত্র প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

বহুকাল ধরে গ্রিম ভাইদের লোককথা সংকলন লক্ষ-কোটি বিভিন্ন ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় তাঁদের লোককথার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আবার লোকসংস্কৃতির পদ্ধতি আলোচনায় ইয়াকব গ্রিমকে 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের জনক' আখ্যা দেওয়া হয় সংকলন ও পদ্ধতি বিচারে পথিকৃৎ এই দুটি অভিধাই সত্য। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবেও তিনি ইতিহাসে ধিক্কৃত হয়েছেন।

উগ্র জাতীয়তবাদের বীজ তাঁর হাতেই রোপিত হয়েছিল। জর্মন জাতি ও জর্মন ভাষা পৃথিবীর সর্বোত্তম এমন অবৈজ্ঞানিক উগ্র জাতীয়তাবাদী উক্তি তিনিই করেছিলেন।

গ্রিমের তত্ত্বের সর্বশেষ দুটি মন্তব্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। লোককথা সংকলনকে কেন্দ্র করে দুটি মন্তব্য করেন ইয়াকব—

a. That those tales which closely resemble each other were undoubtedly derived from a common Indo-European ancestry.

b. The tales are broken-down myths and can be understood only through an understanding of the myths from which they derive.

কোন্ উগ্র জাতীয়তাবাদী ইন্দো-ইউরোপীয় মানসিকতা থেকে এই উক্তি করা হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া, জ্যামাইকা, লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়ার লোককথার অনন্য সমৃদ্ধ লোককথার ভাণ্ডারকে সচেতনভাবে উপেক্ষা করে ইয়াকব গ্রিমের এই উক্তি এক হাস্যকর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল। আর তাই উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই তাঁর তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেল। আজ আর এই তত্ত্ব স্বীকৃত নয়। গ্রিম ভাইদের লোককথার সংগ্রহ আজও আমাদের কাছে সমান জনপ্রিয়, কিন্তু লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের তত্ত্ব আজ আর কেউ উচ্চারণও করেন না।

কেন বাতিল হয়ে গেল সেই তত্ত্ব? এক ধরনের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবোধ ছিল এই তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ। গ্রিমরা বলতে চেয়েছেন, জর্মনই হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মূল হিসেবে জর্মন ভাষাকেই স্থান দেওয়া উচিত। এইসঙ্গে আরও বলা হল, অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত যে-সব লোককথার সঙ্গে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আসলে সেসব জর্মন ভাষা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এই 'ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব' বা পুরাকাহিনির ভগ্নাংশ তত্ত্ব' সংকীর্ণ মানসিকতা ও জাত্যাভিমানের কারণেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে কালক্রমে।

গ্রিমের তত্ত্বকে সমর্থন করেন দুজন অসাধারণ প্রাজ্ঞ লোকসংস্কৃতিবিদ্। এঁরা হলেন জোহান্নেস বোল্‌ট ও জর্জ পোলিভ্‌কা।

আর বিরোধিতা যাঁরা করলেন তাঁরা সমকালে ও পরবর্তীকালে অগ্রগণ্য পণ্ডিত হিসেবে শ্রদ্ধেয়। জোরালো প্রতিবাদ করলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্‌স্‌মুলার। তিনি জর্মন ভাষার শ্রেষ্ঠত্বকে নাকচ করে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতা ও অনন্যতাকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যগুলিকে প্রকাশ করলেন।

আবার ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে থিওডোর বেন্‌ফে মত প্রকাশ করলেন, একমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই বিশ্বের যাবতীয় লোককথার উদ্ভব ঘটেছে। প্রথম অবস্থায় অ্যাড্রু ল্যাং বেন্‌ফের এই 'ইন্ডিক থিওরি'-কে সমর্থন জানালেও পরবর্তী সময়ে এই তত্ত্বকে কিছুটা পরিবর্তিত আকারের গ্রহণ করেন।

এঁরা ছাড়াও গ্রিমের তত্ত্বের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন জর্জ কক্‌স, অ্যান্‌জেলো দ্য গুবারনেতিস ও জন ফিস্‌ক। এঁরা তিনজনেই তুলনামূলক পুরাতত্ত্বের গবেষক।

জাতীয়তাবাদী মানসিকতাকে ঘিরে অনেক বিতর্ক চলতে লাগল। একদিন তা থিতিয়েও গেল। গ্রিমের তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেল আপাতত। এভাবে উনিশ শতক শেষ হয়ে বিশ শতকের তৃতীয় দশক এল। আবার জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় হল।

এই নব্য উগ্রতম জাতীয়বাদের প্রবক্তা ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ ও নাৎসি-দর্শনের নেতা অ্যাডল্‌ফ্ হিটলার। আবার জার্মানিতেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটল উগ্রভাবে।

সেই কারণে হিটলারের জীবন ও দর্শন এবং ফ্যাসিবাদের অমানবিক স্বরূপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ-অন-দ্য-ইন শহরে জন্ম। লিন্‌জের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কিছুকাল ভিয়েনায় ছিলেন। শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। শিল্পে কিছুটা রুচি থাকলেও সফল হওয়ার শিক্ষা ও প্রতিভা কোনোটাই ছিল না বলে ব্যর্থ হন। সীমান্ত পেরিয়ে ১৯১৪ সালে ব্যাভেরিয়ান

সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন, করপোরাল হন, দুবার 'আইরন ক্রস' লাভ করেন। গরিব ঘরের ছেলে, ছিলেন প্রচণ্ড বোহেমিয়ান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সৈন্যদল ছেড়ে ১৯১৯ সালে কয়েকজন উগ্র জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' গড়ে তোলেন। পার্টির সংক্ষিপ্ত নাম নাজি বা নাৎসি। মেঠো উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বরে জাদু ছিল, শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতায় তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে দিতে লাগলেন। রাস্তায় রাস্তায় তাঁর বক্তৃতা শুনতে লোক বেশি বেশি করে জড়ো হতে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানিকে যেভাবে অপদস্থ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে মিউনিখ শহরে বক্তৃতা করতেন। জার্মানির মানুষের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের ফলে ১৯২৩ সালেই তাঁর নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হিংসার প্রচার করছেন এই অপরাধে গ্রেপ্তার হন। তেরো মাস পরে ছাড়া পেয়ে গেলেন, কিন্তু এই সময়কালে কারাগারে বন্দি অবস্থায় লিখলেন 'মেইন ক্যাম্প', তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। এই দর্শনের মূল কথা জর্মন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও ইহুদি বিদ্বেষ।

হিটলার ভেবে নিলেন জর্মনরাই একমাত্র নীল রক্তের মানুষ এবং তাঁরাই আর্যশ্রেষ্ঠ। এইসঙ্গে প্রচার করলেন, সব অর্থব্যবসায়ীই ইহুদি, তারা সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ করছে, ইহুদিরা অভিশপ্ত আর তাই তাদের নির্মূল করতে হবে। ইহুদি নিধন করে করে পৃথিবীকে ইহুদিশূন্য করতে হবে। জর্মনরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, পৃথিবী শাসন করার ভার ঈশ্বরই তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর এই শাসন কায়েম করার জন্য তাঁর চাই কেবল এই দুর্দমনীয় সেনাবাহিনি। এক ধরনের বিকৃত মোহ হিটলারকে গ্রাস করল। অসুস্থ মানসিকতা নিঃসন্দেহে। তৈরি করলেন এক ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডাবাহিনি। তাঁর বিরোধিরা ও ইহুদিরা রাস্তাঘাটে চোরাগোপ্তা আক্রমণে খুন হয়ে যেতে লাগল।

এই সময়ে পৃথিবীতে চরম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে হিটলার জার্মানির জাতীয় জীবনে অসম্ভব প্রভাব ফেলতে সমর্থ হন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে নাৎসিরা জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে গণ্য হল। পর পর তিনজন চ্যান্সেলারের শোচনীয় ব্যর্থতার পর প্রেসিডেন্ট পল ফন হিন্ডেনবার্গ ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিটলারকে জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত করলেন। চ্যান্সেলার হওয়ার চার সপ্তাহ পর রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের সুযোগে হিটলার জার্মানিতে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করলেন। কিছুদিন পর প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৪ সালের ২ অগস্ট হিটলার নিজেকে 'জার্মান রাইখের ফ্যুরার' হিসেবে ঘোষণা করলেন। তিনিই হলেন রাষ্ট্রের প্রধান ও 'সুপ্রিম কম্যান্ডার'। শুরু হল উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ তাণ্ডব, 'নীল রক্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী' জর্মন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বীভৎস সব পদ্ধতি। জার্মানির ব্যাপক সামাজিক ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হল।

ফ্যাসিবাদের মোহে জার্মানি ও ইউরোপের অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক আপ্লুত হলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষমতার আত্মপ্রসাদ ও বিকৃত দর্শন শিল্পী সাহিত্যিককে প্রলুব্ধ করে, তাঁরা নতজানু হন। আবার যাঁরা মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদী ও মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ তাঁরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। এঁরা হলেন রমাঁ রলাঁ, আঁরি বারবুস, ম্যাকসিম গোর্কি, আঁদ্রে জিদ্, ই. এম. ফর্স্টার, ডলোরেস ইবারুরি, আঁদ্রে মাল্‌রো, জর্জ বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল, জাঁ পল সার্ত্র, কার্ল ফন অসিয়েত্‌স্কি, চার্লস চ্যাপলিন, পাবলো পিকাসো, ক্যেথে কোলরিড, লুই আরাগঁ, জর্জি ডিমিট্রভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, নিকোলাই তিখোনভ, জুলিয়াস ফুচিক, ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা, রাফায়েল আলবের্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাজ্জাদ জাহির, মুন্সি প্রেমচাঁদ প্রমুখ।

নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পরেই গোটা জার্মানিতে ঘোষণা করা হয়, বিদ্যালয়-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। নাৎসিরা যা চায় তাই প্রয়োগ করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই মানসিকতাকে লোকসংস্কৃতির প্রতি প্রীতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রয়েছে অন্য উদ্দেশ্য। অনেক কাল আগের গ্রিমের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল লক্ষ্য, —সমস্ত লোকসংস্কৃতির উৎসার ঘটেছে জার্মানি থেকে, সেসব ছড়িয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশে। আর তাই জর্মন জাতিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তাদেরই অধিকার রয়েছে পৃথিবীকে শাসন করার। গ্রিমের সময় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক শক্তি ছিলনা, কিন্তু এখন সেই শক্তি জার্মানির শাসনকুলের রয়েছে। তাই তার প্রভাবের ব্যাপকতা কয়েক সহস্রগুণ প্রসারিত হতে পারল।

হিটলারের জার্মানিতে লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকল। লৌকিক এইসব ঐতিহ্যের লিখিত রূপ প্রকাশ করে প্রচার করা হল, প্রাচীনতম এইসব লৌকিক উৎস থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জর্মন জাতি হল পৃথিবীর সুসভ্যতম জাতি। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ তাই এই উন্নত জাতির পদানত হয়ে থাকবে, —এটাই ঐতিহ্য, পরম্পরা ও ঈশ্বরের নির্দেশ।

জাতীয়তাবোধের সুস্থ মানসিকতা যে-কোনো জাতির পক্ষে পরম গৌরবের। স্বজাতি ও স্বদেশভূমিকে ভালোবাসা এক উন্নত গুণের পরিচয়। স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে, অন্য দেশ, অন্য জাতি ও অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করতে হবে। বরং প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী মানুষই পারেন বিশ্বমানবকে আপন করতে। তাই মহান জাতীয়তাবোধ ও বিশ্ববোধে কোনো বিরোধ নেই।

কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে হিটলারের নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটল তা প্রকৃত অর্থে সুস্থ জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেম নয়, এই ধরনের স্বদেশবোধকে চিহ্নিত করা হয় উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ। জার্মানির তৎকালীন কর্ণধার হিটলার ও তার সহযোগী নেতৃবৃন্দ গোয়েবল্‌স, গোয়েরিং, হিমলার, বোরম্যান, অহিখম্যান প্রমুখ এই উগ্রতার প্রকাশই চেয়েছিলেন। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দোহাই দিয়ে দেশের অংসখ্য বুদ্ধিজীবী-লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও নৃবিজ্ঞানী-সমাজবিজ্ঞানীকে হিটলার বাধ্য করেন 'জাতীয়তাবাদী' হয়ে উঠতে। বহু যুক্তিবাদী মানুষ এই দর্শনের প্রতিবাদ করেন। তাঁদের অধিকাংশকেই দেশত্যাগী হতে হয়, অনেককে কারাজীবন ভোগ করতে হয়, অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আবার অনেকের মন থেকে সায় না থাকলেও প্রাণের ভয়ে এই মতবাদকে সমর্থন করতে বাধ্য করা হয়। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেসব পণ্ডিত উদ্ভট সব মতবাদকে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন তা কতটা বিশ্বাস থেকে ও কতটা প্রাণের ভয়ে তা আজ আর জানবার উপায় নেই।

জার্মানির তৎকালীন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অ্যাডল্‌ফ বাখ সবচেয়ে চমকপ্রদ মন্তব্য করেন তাঁর গ্রন্থ Deutschs Volkskunde (জর্মনীয় লোকসংস্কৃতি)-এ, —আমাদের ফ্যুরার হিটলার হলেন লোকসংস্কৃতির বিশিষ্টতম উদ্‌গাতা। আজকে এই উক্তি যতই হাস্যকর মনে হোক, সেদিনের জার্মানিতে এই উক্তি ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল।

জার্মানির অন্য একজন লোকসংস্কৃতিবিদ হ্যান্‌স্ ন্যান্ডম্যান অভিনব একটি তত্ত্ব প্রকাশ করলেন, —লোকসংস্কৃতির জন্ম সুসভ্য নাগরিক পরিবারে, ধীরে ধীরে তা গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মধ্যে দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সুসভ্য পরিবারগুলি সবই জর্মন জাতির বংশধর। হেনরি রিসল বললেন, সমগ্র ইউরোপের সমস্ত আঙ্গিকের লোকসংস্কৃতির পিতা হল প্রাচীন জার্মানি।

সেদিন জার্মানির অসংখ্য লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ফ্যাসিবাদী দর্শনের রাজনৈতিক

প্রভাবে জাতীয়তাবাদী এই পদ্ধতির বিকৃত রূপকে প্রসারিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং সাময়িকভাবে সফলও হন। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য হিসেবেই সেগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজ এগুলি পড়লে শুধু হাসির খোরাক জোগারে। আর লোকসংস্কৃতির সেইসব গবেষণাগ্রন্থ ১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যে হারিয়ে গেল! অবৈজ্ঞানিক ও মানবতাবিরোধী গবেষণার এই পরিণতিই হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সঙ্গে অক্ষশক্তির আর দুই শরিক ছিল ইতালি ও জাপান। ইউরোপের দুই প্রধান দেশ আর এশিয়ার মহান ঐতিহ্যবাদী দেশ জাপান। হিটলারের দোসর ছিলেন ইতালির মুসোলিনি ও জাপানের তোজো। এই তিনটি দেশ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত পৃথিবীর লক্ষ কোটি শান্তিকামী মানুষের জীবনে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র যুদ্ধের রক্তক্ষয়ের মাধ্যমেই নয়, বিকৃত রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাবে সেদিন সাহিত্যি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য মানবিক পরম্পরা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আর জার্মানির পাশাপাশি একই ধরনে ইতালি ও জাপানে জাতীয়তাবাদের কুৎসিত রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। জাপানে অবশ্য ইহুদি-নিধন হয়নি। এ ছাড়া তিন উন্নত দেশ একই পথে সেদিন হেঁটেছিল। লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরব ঘোষিত হল উগ্রভাবে। সে ইতিহাসও বড়ো করুণ। ইতালিতে মুসোলিনি ও জাপানে তোজোর, নির্দেশে লোকসংস্কৃতির নতুন অমানবিক বিশ্লেষণ শুরু হল। স্বস্তির কথা, ইতালিতে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী প্রচার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন সাড়া জাগাতে পারল না। কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিত্বহীন লোকসংস্কৃতিবিদ জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করে প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি লিখলেন বটে, কিন্তু তাঁরা জার্মানির বাখ, ন্যান্ডম্যান, রিসল-এর মতো প্রতিভাবান ছিলেন না। জার্মানির লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের প্রভাব ছিল সমাজের ওপরে। সেরকম কোনো সর্বব্যাপী প্রভাব ইতালির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। আর মুসোলিনিও হিটলারের মতো প্রশাসক ছিলেন না, সর্বক্ষেত্রেই হিটলারের নির্দেশের জন্য ব্যগ্র থাকতেন, ছিলেন ফ্যুরারের অনুগ্রহপ্রার্থী। জার্মানিতে হিটলার বাহিনি যেভাবে বিরোধীদের প্রায় নির্মূল করতে পেরেছিলেন, মুসোলিনি ইতালির জাগ্রত জনমানসকে সেভাবে ক্রীতদাস করে তুলতে পারেননি। পাশের দেশ ফ্রান্সের অগণিত স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী মানবতাবাদী যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ইতালির মানুষকে সবসময় অনুপ্রাণিত করত। তাই ইতালিতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকসংস্কৃতি-গবেষক জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির প্রসারে সচেষ্টা হলে তা তেমন কার্যকর হয়নি।

জাপান কিন্তু ব্যতিক্রম। সেখানে জাতীয়তাবাদ তীব্র আকার নেয়। এমনিতেই জাপানি, ঐতিহ্যে জাতীয়তাবাদ বেশ সক্রিয় ছিল অনেক কাল আগে থেকেই। জাপানিরা খুবই ঐতিহ্যপ্রিয় ও প্রাচীন সংস্কৃতিকে অবিকৃত রেখে তাকে লালন করার পক্ষপাতী। আবার অন্যদিকে অসাধারণ প্রগতিপন্থী, সে প্রগতি প্রযুক্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নতুন-নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত। এই জাতি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ। আবার বৌদ্ধধর্মের প্রতি আসক্তি দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিবেশকে দৃঢ় করেছে। অনেক বৈপরীত্য সত্ত্বেও জনগণ ঐতিহ্যলালিত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এক ধরণের ভাবাবেগ সক্রিয় রয়েছে।

কিন্তু এসব সুস্থ চিন্তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তোজোর জাপান সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। বিকৃত মানসিকতার প্রসার ঘটতে দেরি হল না।

পৃথিবীর আদিতম লোকসংস্কৃতির গ্রন্থ লিখিত হয় জাপানেই। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয় 'কোজিকি', জাপানি লোকপুরাণের গ্রন্থ। সেখানে লেখা আছে, পৃথিবীর শুরু হয় সাতজন দেবদেবীর জন্মের পর থেকে। তাদের পরে পাঁচ জোড়া দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। শেষ দেব ও দেবী ইজানাগি ও ইজানামির ওপরে দায়িত্ব পড়ে এই পৃথিবীকে সুস্থিত করে শাসন করার। তাঁর স্বর্গ থেকে রামধনুর পথ বেয়ে পৃথিবীতে নামেন। ঘর বাঁধেন, স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হয়, তারপর আর একটি। ইজানামি শেষ পর্যন্ত জাপানের আটটি প্রধান দীপপুঞ্জের সৃষ্টি করেন।

এভাবে এগোতে থাকে লোককথা। এটা শিন্তো ধর্মের প্রথম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। শিন্তো দর্শন ও ধর্ম জাপানের সংস্কৃতির গোড়ার কথা। শিন্তো ধর্মকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।

শিন্তোর আক্ষরিক অর্থ 'ঈশ্বরের পথ' বা ঈশ্বরে শিক্ষা ও উপদেশ,—জাপানি ভাষায় 'কামি'। ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়কালে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শিন্তো মতবাদ যুক্ত হয়ে এক নতুন দর্শনের উৎসার ঘটে। শিন্তো দর্শন বিষয়ে দুটি তথ্য খুব প্রাসঙ্গিক,—

a. While Shinto has no founder, no official sacred scriptures and no dogma, it has preserved its ethos throughout the ages.
b. In the modern period it has been used as a tool of ethnocentric nationalism and chauvinistic militarism and it is often thought of in these terms by outsiders.

আধুনিককালে শিন্তো ধর্মের মধ্যে যে উগ্র ও ক্ষুদ্র চেতা জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দেয় তার মূলে রয়েছে তোজোর জাপানের মানবতাবিরোধী লোকসংস্কৃতিবিদ ও নৃবিজ্ঞানী। এঁরা বললেন, জাপানি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। প্রাচীনকালে জাপানের মানুষের মহান ঐতিহ্য ছিল, আজ আবার তাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। আর এই নবজাগরণের প্রবক্তা হলেন জাপানের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা তোজো। তিনিই পারেন প্রাচীন ঐতিহ্যের পরম্পরাকে মর্যাদা দিয়ে জাপানকে নতুন জাতীয়তাবাদী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে লোকসংস্কৃতির জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি। এ যেন হিটলারের ফ্যাসিবাদী দর্শনেরই প্রাচ্য প্রতিরূপ।

প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধের কারণে এই সময়ের জাপানের লোকসংস্কৃতিবিদেরা শিন্তো ধর্মের দিকে বেশি বেশি আকৃষ্ট হলেন, স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন লোকপুরাণ-লোকগাথা-লোককথা-লোকসংগীতের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ জনপ্রিয় হল। আর এই জাতীয়তাবাদ ছিল চরম উগ্রতায় আচ্ছন্ন। মানুষের প্রতি নির্মম অত্যাচারে হিটলার ও তোজো ছিলেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আর রাজনৈতিক এই ভ্রষ্টাচার ও নির্মমতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছায়া ফেলল।

এই শিন্তো-ধর্মে সেদিনের জাপানি লোকসংস্কৃতি-গবেষকগণ কী অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন?

শিন্তোবাদ একান্তভাবেই প্রাচীন জাপানের নিজস্ব পথ ও বিশ্বাস। প্রাচীনকালের জাপানিরা প্রকৃতির সমস্ত বিস্ময়কর দৃশ্য ও ঘটনায় যেমন বিশ্বাস করতেন যুক্তিহীনভাবে, তেমনি মৃতের আত্মাতে দেবতার অস্তিত্বও কল্পনা করতেন। তাঁদের প্রকৃতিবাদ ও সর্বপ্রাণবাদ থেকেই শিন্তোবাদের উদ্ভব। উদ্ভবের পরে অল্পকালের মধ্যেই শিন্তো বা 'কামির পথ' একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মত হিসেবে গড়ে ওঠে, ঘরে ঘরে আঞ্চলিক দেবতারা ও স্থানীয় অভিভাবক দেবতারা পুজো পেতে শুরু করেন। এই মানসিকতায় কোনো গোষ্ঠীর বীরবৃন্দ এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃরা বংশপরম্পরায় দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন, অনন্য মানুষেরা গোষ্ঠীর কাছে দেবতা হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষরা দেবতায় উন্নীত হওয়ায় তাঁদের পুজো করা শুরু হয়ে যায়। শিন্তো ধর্মের একটি মূল তত্ত্ব ছিল জাপানের সম্রাট পরিবারের দৈবী উদ্ভবের কিংবদন্তি।

বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও জাপানের ব্যাপক মানুষের মধ্যে শিন্তো বিশ্বাস সক্রিয় রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও শিন্তোধর্ম একই সঙ্গে পালন করার রীতি প্রচলিত ছিল।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে শিন্তো ও উগ্র জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই জাপানে একটি জাতীয়তাবোধক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনরুত্থানের পর শিন্তো ধর্মকে জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে গণ্য করা হয়েছিল। এবং সেটি প্রশাসন ও সম্রাটের উৎসাহ ও আনুকূল্য পেয়েছিল।

জাপানে লোকসংস্কৃতির জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি-প্রয়োগে যিনি প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তাঁর নাম ইয়ানাগিতা। অসাধারণ পণ্ডিত মানুষ, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, কিন্তু চিন্তায় বিকৃতি ঘটেছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। অক্ষশক্তির পরাভব ঘটল, মিত্রশক্তি জয়ী হল। বিশ্বযুদ্ধের হানাহানির শেষে স্থিতাবস্থা ফিরে এল, বিশ্বশান্তির প্রয়াস শুরু হল। উগ্রতার কুৎসিত পরিবেশ ধ্বংস হল। আর উগ্র জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির হাস্যকর প্রসারও রুদ্ধ হল। সবচেয়ে বিস্ময়কর, যে-দেশ লোকসংস্কৃতি-চর্চায় বিশ্বের অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত, যে দেশ সেই সপ্তদশ শতক থেকে নিরলসভাবে সংগ্রহ ও গবেষণা করে আসছে, সেই ফিনল্যান্ডে জাতীয়তাবোধের মহান ঐতিহ্য বহমান থাকলেও তা কোনোদিন উগ্রতায় আচ্ছন্ন হয়নি। এই মানসিকতাই সুস্থ ও স্বাভাবিক।

আসলে মনে রাখতে হবে, যে মানুষকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার, এই জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে সেই মানুষকেই অন্য মানুষের থেকে আলাদা করে দেখাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। অমানবিক কোনো চিন্তা বা পদ্ধতি অথবা তত্ত্ব তাই বেশিদূর শিকড় মেলতে পারে না। আজও কোনো কোনো দেশে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির কিছু কিছু প্রবক্তা রয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আর এই পদ্ধতির প্রচার করতে তাঁরা সাহস পান না। প্রচ্ছন্নভাবে তাঁদের লেকায় এই মনোভাব মাঝে মধ্যে প্রকাশ পায়। পদ্ধতিটি সবদিকে থেকেই ধিক্কৃত হয়েছে। সবদেশেই প্রাথমিক অবস্থায় লোকসংস্কৃতি-চর্চায় জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিশ্চয়ই কিছুটা সক্রিয় থাকে, কিন্তু তার রূপ ও প্রকাশ মানসিক। হয়তো ভাবাবেগ কিছুটা বেশি থাকে, কিন্তু

বিজ্ঞাননির্ভর মানসিকতায় গবেষণা যত প্রসারিত ও অগ্রসর হয় এই মনোভাবও ততই অপসারিত হতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক সুস্থ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া।

১.৭ ☐ ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি

উনিশ শতকের মধ্যভাবে পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নবীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দর্শনের উদ্ভব ঘটল। এই দর্শনে প্রথম উচ্চারিত হল, আবহমান কাল ধরে অসংখ্য দার্শনিক পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত কাজ হবে পৃথিবীকে বদলাতে হবে। ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রথম মানবিক উচ্চারণ। আর এই স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী উচ্চারণ ঘটল একটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে। যাঁরা এই নতুন দর্শনের জন্ম দিলেন তাঁরা হলেন কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। এই দুই রাজনৈতিক দার্শনিক ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করলেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো'। উনিশ শতকের অগ্রণী দার্শনিক হেগেলের নতুন দার্শনিক ভাবনায় প্রাথমিক ভাবে এই দুজন প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশের সময়েই তাঁরা নতুন দার্শনিক প্রাগ্রসর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন, নতুন দার্শনিক ভাবনার নাম দিলেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানবসভ্যতা ও মানবসমাজকে বিশ্লেষণ করার নতুন পদ্ধতি প্রচারিত হল।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে মানবসভ্যতার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় বিশ্লেষণ করে তাঁর কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। এতদিন যেভাবে মানবসমাজকে বিবর্তনের ধারায় বিশ্লেষণ করা হত, এই নতুন দর্শনে তাকে অন্যতম উপস্থাপিত করা হল। এঁদের তত্ত্ব দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হল চার্লস ডারউইন ও 'এনসেন্ট সোসাইটি'র লেখক লুইস হেনরি মরগানের তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানে।

ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দর্শনে মানবসমাজ ও মানব-ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বললেন, —আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত মানবসমাজ দেখা গিয়েছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.' এঁরা দুটি প্রধান শ্রেণির 'বুর্জোয়া' ও 'প্রলেতারিয়েত' নাম দিয়ে বললেন,—By bourgeoisie is meant the class of modern Capitalists, owners of the means of social production and employers of wage-labour. By proletariat, the class of modern-labourers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labour-power in order to live. প্রাচীন কাল থেকেই স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা ও কারিগর—এক কথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত দুই শ্রেণি সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও বা আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে। প্রতিবার এই লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণিগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে। আগের ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় সমাজে বিভিন্ন বর্গের এক জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিসিয়ান, যোদ্ধা, প্লিবিয়ান ও ক্রীতদাসেরা। মধ্যযুগে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছিল সামন্তপ্রভু, অনুসামন্ত, জমিদার, মহাজন, গিল্ডকর্তা, সৈনিক-লাঠিয়াল, মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, ফড়ে, কারিগর, শিক্ষানবিশ কারিগর, কৃষক ও ভূমিদাস। এইসব শ্রেণির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার অজস্র অভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।

ইতিহাসকে বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করে বলা হল, সুপ্রাচীন কালের পৃথিবী থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া আবহমান কাল ধরে যে ঐতিহাসিক ধারা চলেছে তা হল শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, হানাহানি, রক্তক্ষয়, বিদ্বেষ, অন্যায়-অধিকার, শাসন, শোষণ ও জাতিবৈষম্যের ধারা। যে লিখিত ইতিহাস আমরা পড়ি, তাতে রাজা-সম্রাট-বাদশাহ্-ওমরাহ্-সামন্তপ্রভুদের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় ও শাসনব্যবস্থার পরিচয়ই শুধু থাকে। প্রচলিত লিখিত ইতিহাসে গণমানসের কোনো পরিচয় লিপিবদ্ধ নেই। আমাদের নিজেদের অীততকে, সামাজিক রীতি-নীতি কাঠামোকে জানতে হলে, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে গেলে সাধারণ খেটে-খাওয়া হাটবাটের মানুষদের সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বিজ্ঞানভিত্তিক, সমাজতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তাদের মধ্যেই যে আমাদের অতীত বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার রয়েছে তা উপলব্ধি করতে হবে।

সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এই দর্শনে বলা হল, সমাজে শ্রেণির উদ্ভব হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধের সূত্রপাত ঘটল। গোষ্ঠীভুক্ত আদিম মানুষের মধ্যে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ ক্রমেই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে উত্তাল হয়ে উঠল। যে জমির ওপর গোষ্ঠীর সকলের সমান অধিকার ছিল, অসম বণ্টনের ফলে কিংবা অসম সুযোগের ফলে তাতে দেখা দিল বৈষম্য। চতুর ও শক্তিশালী মানুষেরা চাষেণ ভালো-ভালো জমি দখল করে বসল। আর যারা অল্প ও অনুর্বর জমিতে প্রাণপণে চাষ করেও বছরের খোরাক জোগাতে পারল না, তারা বাধ্য হল অন্যের জমিতে শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করতে। উর্বর জমির মালিকেরা হয়তো যে পরিমাণ জমি দখল করেছে, তাতে এক পরিবারের সদস্যদের পক্ষে চাষ করা সম্ভব নয়। নিয়োগ করতে হচ্ছে বাড়তি কৃষিমজুরকে। যে মানুষটি অন্যের জমিতে চাষ করছে কৃষিমজুর হিসেবে, বাধ্য হচ্ছে শোষিত হতে, তার মনের কোণে জমে উঠছে ক্ষোভ ও শ্রেণি-ঘৃণা। উর্বর জমির মালিক সুখের পথ পেয়ে সুবিধাভোগী এক নতুন শ্রেণিতে পরিণত হল। কৃষিমজুর সবসময় এই অবিচার শান্ত হয়ে মেনে নিয়নি। কিন্তু সে অনন্যোপায়, মালিকের সংগঠিত শক্তির কাছে দুর্বল।

জমি দখলের লড়াইও শুরু হয়। এক মালিক অন্য মালিকের জমি দখল করে। পরাভূত মালিকের সৈন্যদের আগে হত্যা করা হত। চিন্তার বিবর্তন ঘটে গেল। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যদের আর হত্যা করা হত না, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমিদাস হিসেবে নিয়োগ করা হত। উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠল,—ভূমিদাস হল ব্যক্তিগত ক্রীতদাস যার শ্রমশক্তিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যাবে।

এইসব দ্বন্দ্বের ফলে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। শ্রেণিসংগ্রাম শ্রেণিসমাজের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে একদল লোকের কাজ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যদের বিরোধ উপস্থিত হতে বাধ্য, সামাজিক জীবনে সংঘাত বেড়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি সমাজ ও তার সৃষ্ট বিষয়সমূহের হৃদস্পন্দন অনুভব করা যাবে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সার্থক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই বস্তুবাদী দর্শনের প্রচার ঘটলেও তার প্রসার ঘটে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ১৯১৭ সালে জার শাসিত রাশিয়ায় রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর এই বিপ্লব সংঘটিত হয় মার্ক্সবাদী দর্শনের বাস্তব প্রয়োগে। লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণে সোভিয়েত দেশে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়। সেই কারণে এই পদ্ধতিকে মার্ক্সবাদী পদ্ধতি হিসেবেও গণ্য করা হয়।

সোভিয়েত দেশে এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসারিত হলেও বাইরের বিশ্বে এই পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কালে এই রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োগ ঘটিয়ে রক্তাক্ত শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে যুগোশ্লাভিয়া হাঙ্গারি বালগেরিয়া চেকোস্লোভাকিয়া রুমানিয়া পূর্ব-জার্মানি পোল্যান্ড গণপ্রজাতন্ত্রী চিন উত্তর কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। সেই সময় থেকে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি জনপ্রিয় হতে থাকে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষে কিউবায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে সেখানেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ জনপ্রিয় হয়।

ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া ও আফ্রিকায় যেসব লোকসংস্কৃতিবিদ সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ও মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাস করেন তাঁরাও এই পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

লোকসাহিত্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ বলেন, মৌখিক কিংবা লিখিত সাহিত্য সমাজমানুষের মনের ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম। লোকসমাজ দিনের কাজের শেষে আবছা আলো-আঁধারে বসে কিংবা দিনে কর্মরত অবস্থায় মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কিংবা উৎসব-পরবে গানের কলির সুরে তাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশ করে। এগুলো শুধুই আনন্দের অভিব্যক্তি নয়। বিশেষ শ্রেণির প্রতি তীব্র অসন্তোষ, ক্ষোভ, জীবনের ব্যথা-বেদনা-হতাশা-অভিমান-শোষণ-অবিচার-যন্ত্রণার কাহিনিও অক্ষম আক্রোশে লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। লোককথার মধ্যে সেই অত্যাচারী শ্রেণির মৃত্যু ঘটিয়েও কখনো কখনো তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের জোয়াল বইতে তারা বাধ্য হলেও এই শোষণের হৃদয়ফাটা যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে লোকসাহিত্যে, বিশেষ করে লোককথা ও লোকসংগীতে। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করলে হয়তো অধিক শক্তিশালী শত্রুর হাতে মৃত্যু অনিবার্য তাই পরোক্ষে এই ভাবেই ক্ষোভ ফেটে পড়েছে। রূপকের আশ্রয় নেওয়াতে শাসক-শোষক-মালিক অনেক সময়ে তাকে নিছক রূপকথা বলেই মনে করেছে, কিন্তু রূপকের আড়ালেই রয়েছে শাণিত বুদ্ধির চমকে উদ্দীপ্ত শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা।

ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতিটি যে ইতিহাসসম্মত ও সমাজবিজ্ঞাননির্ভর তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মানবসমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরম্পরাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে অনেক সামাজিক সত্য যে উদ্‌ঘাটিত হয় তা প্রমাণিত সত্য। জর্জ টমসন, সুসান ফেল্‌ড্‌ম্যান, ভ্লাদিমির প্রপ্, উইলিয়াম হেন্‌ড্রিক্স্, ভি. পি. বির্জুকোভ, ভ্যাসেলভাস্কি মিলার, গায়লা অরটুটে, আই. জি. প্রিঝোভ প্রমুখ নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণায় ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির উজ্জ্বল দিকগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবার একথাও সত্য, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাইরে এই পদ্ধতির তেমন কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। আর গত শতকের নয়ের দশকের সময়কাল থেকে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের পরে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এই একই করুণ অবস্থা।

ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির বিপুল সম্ভাবনা ও সমাজবিজ্ঞাননির্ভর অসীম গুরুত্ব সত্ত্বেও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ প্রসাতির হয়নি। এর পেছনে কারণ রয়েছে। বহু নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদই এই পদ্ধতিকে কোনোদিনই খুব খোলা মনে আকাদেমিক শৃঙ্খলা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। আসলে এই পদ্ধতির সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পর্ক এতই গভীর যে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ এই পদ্ধতির অনুশীলনে বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। শ্রেণিদ্বন্দ্বের দর্শনের ভিত্তিতে শোষকশ্রেণির

শোষণ—অত্যাচারের চিরকালীন অবসানের জন্য শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে যখন জার-শাসিত রাশিয়ায় এবং পরবর্তীসময়ে পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়ার দুটি দেশ উত্তর কোরিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে জনগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করল, তখন মার্ক্সবাদী এই দর্শনের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদেরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির প্রয়োগে বিরূপতা প্রকাশ করলেন। আকাদেমিক আঙিনায় রাজনীতির প্রভাব মেনে নেওয়া সহজ নয়। খুব স্বাভাবিক কারণেই নির্ভেজাল পণ্ডিতকুল এই মতাদর্শকে এড়িয়ে লোকসংস্কৃতি-চর্চা করতে চান। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা বললেন, সমাজের সঠিক বিশ্লেষণ এই পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, আর লোকসাহিত্যের সমস্ত বিভাগে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে উৎসবে লোকসমাজ অসংখ্য গান বাধেন যেখানে রয়েছে প্রেম-বিরহ-মিলনের আকাঙ্ক্ষা কিংবা অসংখ্য ছড়ায় মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য অথবা প্রবাদে পারিবারিক সম্পর্কের খতিয়ান প্রভৃতির মধ্যে কোথায় শ্রেণিদ্বন্দ্ব, কোথায় শ্রেণিঘৃণা অথবা প্রতিরোধের কথা? এইসব মতের সপক্ষেই ছিলেন অধিকাংশ পণ্ডিত মানুষ।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে মত মতভেদই থাকুক না কেন, লোককথার ঐতিহাসিক-সামাজিক বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পণ্ডিতগণের এই মতবাদ লোকসংস্কৃতি-গবেষণায় একটি নতুন উজ্জ্বল দিক নির্দেশ করেছে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করলে লোকসংস্কৃতি-গবেষণায় অপূর্ণতা থাকতে বাধ্য। আমেরিকা-ইউরোপের অনেক লোকসংস্কৃতিবিদের বিরূপতা ও কটাক্ষ সত্ত্বেও আমরা ভুলি কি করে যে, যাঁরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তাঁরাও কম প্রতিভাবান নন, তাঁদের গবেষণাও লোকসংস্কৃতিকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার তিনটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। এখানে, যার দুটি পশুকথা ও একটি ছড়া।

ক. এই লোককথাটি পশুকথার অন্তর্ভুক্ত। অবিভক্ত বাংলা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্য, গ্রিস, তিব্বত, জর্জিয়া, তুরস্ক, ভুটান ও মলডাভিয়ায় এই পশুকথাটির সন্ধান মিলেছে। সর্বত্রই খুব জনপ্রিয়। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থেও এই পশুকথাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক. এক গভীর বনে পশুরাজ সিংহের অত্যাচারে সমস্ত পশুরা সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকত। একটু অসাবধান হলেই সিংহের থাবায় জীবন শেষ। বনের সব পশু একদিন সভা করে সিংহের থাবা থেকে বাঁচবার উপায় খুঁজতে চাইল। তারা ঠিক করল, সিংহের কাছে গিয়ে তারা বলবে, এভাবে চললে বনের সব পশু তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন আমাদের পশুরাজের খুব কষ্ট হবে। খিদে পেলেও পশু-আহার পাওয়া যাবে না। তাই আমরা প্রস্তাব করছি, আপনি গুহায় বসে থাকবেন, আমরা প্রতিদিন পালা করে একটি পশু আপনার খাদ্য হিসেবে পাঠিয়ে দেব। একথার কোনো অন্যথা হবে না। যদি হয় তাহলে তার পরের দিন থেকে আপনি আগের মতোই আমাদের যখন-তখন মেরে ফেলবেন।

সিংহ কিছুক্ষণ ভেবে বুঝল, প্রস্তাব খারাপ নয়। গুহায় বসে থাকব, মুখের খাবার জ্যান্ত গুহায় চলে আসবে। মন্দ কি! সিংহ রাজি হয়ে গেল।

পশুরা সভায় ঠিক করল, প্রতিদিন জ্যান্ত খাদ্য হিসেবে একজন পশুকে সিংহের কাছে পাঠানো হবে। যার পালা পড়বে সে না বলতে পারবে না।

এভাবেই চলছে। এ ছাড়া বাঁচার পথ নেই। একদিন এক ছোট্ট খরগোশের পালা এল। মন খারাপ, তবু যেতে হবেই।

আজই আমার জীবনের শেষ দিন। তাড়াতাড়ি গেলেও মরতে হবে, দেরিতে গেলেও তাই। খরগোশ আস্তে-আস্তে যাচ্ছে আর ফন্দি আঁটছে। শেষবারের মতো তার অতি প্রিয় বনভূমিকে দেখে নিচ্ছে। শেষকালে বুদ্ধি খুলে গেল। যদি বাঁচা যায়, যদি বনের সব পশুকে বাঁচানো যায়।

অনেক দেরিতে বিকেল গড়িয়ে গেলে খরগোশ সিংহের গুহার সামনে এল। তাকে দেখেই সিংহ রাগে জ্বলে উঠল। এত দেরি! তার ওপরে একটুকু একটা খরগোশ।

খরগোশ সব বুঝতে পারল। সামনের দুই পা প্রণামের ভঙ্গিতে ওপরে তুলে ধরে পশুরাজকে বলল, পশুরাজ, রাগ করবেন না। আমি ছোট্ট, তাই পশুরা আমরা সঙ্গে আর একটা খরগোশকেও পাঠিয়েছিল যাতে আপনার পেট ভরে। কিন্তু পথে এক বিপদ। দুজন তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসছি। সামনেই আর এক পশুরাজ। বোধহয় পাশের বনের।

সেই পশুরাজ বললেন, তোদের খাব, কোথায় চলেছিস?

আপনার কথা বলাতে গেল রেগে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা খরগোশকে তার কাছে রেখে আপনার কাছে এসেছি।

গুহার সামনে বসা পশুরাজের কেশর ফুলে উঠল, থাবার নখগুলো মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগল, চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। বলল—কোথায় সে। নিয়ে চল।

এক কুয়োর পাশে এসে থামল খরগোশ, বলল, পশুরাজ, আপনার ভয়ে ও কুয়োর মধ্যে লুকিয়েছে। আপনি আমায় থাবার মধ্যে ধরে কুয়োর মধ্যে তাকান।

পশুরাজ তাই করল। কুয়োর মধ্যে জলের প্রতিবিম্বে দেখল, অন্য একটা সিংহ একটা খরগোশকে থাবায় নিয়ে বসে রয়েছে। থাবার খরগোশকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োর মধ্যে।

একটা শব্দ হল ঝপাং। খরগোশের গায়ে লেগেছিল, তবু মুচকি হেসে উল্টোপথে হাঁটা দিল। তারপর থেকে বনের সব পশুরা শান্তিতে বাস করতে লাগল।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি বা মার্ক্সবাদী পদ্ধতিতে এই পশুকথাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পশুকথাটির অভিপ্রায় জানতে পারব। শ্রেণিভিত্তিক সামন্তসমাজে সামন্তপ্রভুর উৎপীড়নকে সিংহের অত্যাচারের রূপকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। সামন্তপ্রভু তার রাজ্যের এলাকার মধ্যে যা খুশি তাই করতে পারেন। কার প্রাণ থাকবে, কার সম্মান যাবে সবই তার ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। প্রজাদের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব সেই সমাজে স্বীকৃত নয়। যতদিন অবধি না গরিব প্রজারা তাকে নিয়মিত খাজনা দিতে স্বীকার করে ততদিন চলে বীভৎস অত্যাচার। খাজনার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন প্রতিবাদ করার উপায় নেই। প্রজারা সবই মেনে নিতে বাধ্য। বনের সকলে মিলে নিয়মিত একটি করে পশুকে ভেট দেবে এই অঙ্গীকারের মধ্যে নিয়মিত খাজনা দেওয়ার রূপক রয়েছে। সামন্তপ্রভু নিয়মিত খাজনা পেয়ে আর শ্রমশক্তি নিয়োগ করতেন না, নিষ্কর্মা সুবিধাভোগী শ্রেণি হয়ে উঠলেন। আবার এক সামন্তপ্রভুর সঙ্গে অন্য সামন্তপ্রভুর প্রজাসম্পত্তি, জমি ও পদমর্যাদা নিয়ে বিরোধ ছিল। তাই খরগোশের কাছে অন্য পশুরাজের দাপটের কথা শুনে এই পশুরাজ অর্থাৎ সামন্তপ্রভু রাগে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। প্রবল শক্তিশালী সামন্তপ্রভুর গায়ে

হয়তো অসংগঠিত কৃষক প্রজারা হাত তুলতে পারেনি, কিন্তু ইচ্ছাপূরণের তাগিদে পশুকথার মধ্যে সামন্তপ্রভুর প্রতীক পশুরাজ সিংহের মৃত্যু ঘটিয়ে তারা শান্তি পেতে চেয়েছে। এইভাবেই বন-পাহাড়ে ঘেরা নিরক্ষর সাধারণ মানুষ শ্রেণিদ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছে তাদের মৌখিক সাহিত্যে।

খ. অনেক অনেক দিন আগে এক পাহাড়ি নদীর পাশে থাকত এক শেয়াল আর এক কুকুর। তারা দুজনে ছিল খুব বন্ধু।

একদিন কুকুর শেয়ালকে তার বাড়িতে নেমতন্ন করল। সূর্য ওই পাহাড়ের কোলে ডুবে যাওয়ার পরে আবছা আঁধারে শেয়াল এল কুকুরের ডেরায়। কুকুর আগেই রান্নাবান্না করে রেখেছিল। অনেক দৌড়াদৌড়ি খোঁজাখুঁজির পর কুকুর কয়েকটা বুনো মুরগি শিকার করে রেঁধে রেখেছিল। দুই বন্ধুতে মিলে খুব আনন্দ করে সেই খাবার খেল।

নিজের পাহাড়ি গুহায় ফিরে যাওয়ার সময় শেয়াল কুকুরকেও নেমন্তন্ন করল। বলল,—দেখ বন্ধু, তুমি তো আমার গুহায় যাবে, কিন্তু দুটো শর্ত আছে। তুমি তোমার ডেরা থেকে আমার গুহায় কিন্তু হেঁটে হেঁটে যাবে, একদম দৌড়তে পারবে না। আর সূর্য ডোবার আগে আমার গুহায় যাবে, তার পরে নয়।

কুকুর অতশত চিন্তাভাবনা করল না। সে সাধাসিধে জন্তু। তাই শেয়ালের শর্তেই রাজি হয়ে গেল। শেয়াল যে তার বন্ধু।

পরের দিন বিকেলে সূর্য ডোবার অনেক আগেই কুকুর রওনা দিল। মন তার খুশিতে ভরা। মাথা নীচু করে লেজ নেড়ে সে পথ চলছে। কিছুদূর গিয়ে কুকুর বুঝতে পারল সে হাঁটছে না, দৌড়চ্ছে।—যাঃ খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। মনে মনে একথা বলে কুকুর আবার ফিরে চলল তার ডেরার কাছে।

সেখানে গিয়ে নিজেকে বলল—এবার আর ভুল করা চলবে না। আবার রওনা দিল কুকুর।

এবারেও কিন্তু খানিকটা পথ এসে কুকুর হঠাৎ খেয়াল করল, সে তো হাঁটছে না, দৌড়চ্ছে। মন খারাপ হয়ে গেল তার। ফিরে এল তার ডেরায়।

এইভাবে বার-কয়েক যাওয়া-আসা করতে করতে কুকুরের অনেক দেরি হয়ে গেল। দূর পাহাড়ের কোলে সূর্য ডুবে গিয়েছে। আঁধার নেমে আসছে। তবু বন্ধু যে তাকে যেতে বলেছে, বন্ধু বসে রয়েছে তার যাওয়ার আশায়। তাকেই যে যেতে হবে।

শেষকালে অনেক পরে মন শক্ত করে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে কুকুর পৌঁছল শেয়ালের গুহার সামনে। গুহায় ঢুকে দেখে, শেয়ালের খাওয়া-দাওয়া শেষ, গুহার মেঝেয় শুধু কিছু হাড় পড়ে রয়েছে।

শেয়াল বলল, বন্ধু, তুমি তো বড় দেরি করে ফেললে। নাও, কি আর করা যাবে, হাড় চিবোও।

কুকুরের নেমন্তন্ন ছিল, দুপুরে সে ভালোভাবে তেমন কিছু খায়নি। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলছে, বারবার ফিরে-ফিরে যাওয়ায় ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছে, পা-চারটে কাঁপছে, জিব শুকিয়ে গিয়েছে। কুকুর হাড়গুলোকে এক জায়গায় করে নিয়ে বসে পড়ল, সামনের দুই পায়ের

মাঝখানে হাড় নিয়ে চিবোতে লাগল। এক অদ্ভুত গোঙানি বেরিয়ে আসছে তার বুক থেকে, আর শুকনো হাড় ভাঙার কচকচ শব্দ।

হাড়ে যদি এক রত্তি মাংস নাও থাকে, তবু কুকুর সেইদিন থেকে শুধু হাড়ই চিবোয়। রস নেই তবু শুকনো হাড় মুখে পুরে চিবোয়। আর সেই সঙ্গে খিদে ও ক্লান্তির যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে আর্তনাদের মতো গোঙানির শব্দ শোনা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় এই পশুকথাটি। ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতিতে এই পশুকথাটি বিশ্লেষণ করলে এক মর্মান্তিক সত্যের মুখোমুখি হতে হবে।

হাটবাটের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ স্বভাবতই সরলপ্রাণ ও সাদাসিধে। অন্যদিকে আর এক শ্রেণির মানুষ এই সমাজেই রয়েছে যারা সুবিধাভোগী, উঁচুতলার মানুষ, তারা নির্মম, হৃদয়াবেগ বলতে তাদের কিছু নেই। সাধারণ মানুষের বন্ধুত্ব, আবেগ, আতিথেয়তা তাদের কাছে কোনো মূল্যই পায়না। গরিব মানুষ তাদের তোয়াজ করবে, নেমন্তন্ন করে ভালোভাবে খাওয়াবে এটাই তো স্বাভাবিক। সে আতিথেয়তা দেখিয়েছে বলেই তার প্রতিদান দিতে হবে? এখানেই রয়েছে শ্রেণিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এইসব উচ্চশ্রেণির মানুষ এমন কুৎসিত মানসিকতার উত্তরাধিকারী হয় যে, সামান্যতম মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করতেও তারা অনভ্যস্ত হয়ে ওঠে, নির্যাতিত মানুষকে তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতে ভুলে যায়। সুযোগ পেয়ে স্বার্থপর হয়ে এদের মনোবৃত্তি এমনভাবে গড়ে ওঠে যার ফলে অন্যের বুভুক্ষা, কষ্ট ও নির্যাতনে এরা বিমল আনন্দ পায়।

এই পশুকথায় কুকুর ও শেয়াল দুই শ্রেণির প্রতিভূ যা সহজেই বোঝা যায়। পথের কুকুরের হাড় খাওয়ার বিশেষ লোভাতুর ভঙ্গির মধ্যে সরল সাধারণ মানুষ তাদের দিন যাপনের গ্লানিকেই দেখতে চেয়েছে। এ যে তাদের নিপীড়িত জীবনেরই অতি বাস্তব প্রতিচ্ছবি। শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি শেয়াল এমন শর্ত আরোপ করেছে যা মেনে চলতে গেলে কুকুরকে অনাহারে থাকতে হবে। সামন্তপ্রভু তো এভাবেই শর্ত আরোপ করে। তাই সামন্তসমাজে, জমিতে অক্লান্ত পরিশ্রমে ফসল ফলিয়েও অন্নদাতা কৃষক থাকে অর্ধভুক্ত কিংবা অনাহারে। নিজের পুষ্টি হলেই শেয়ালরা থাকে পরিতৃপ্ত। অন্যের প্রতি সীমাহীন উপেক্ষা ও উদাসীনতা এবং শ্রেণিঘৃণা তাদের জীবনচর্যার বিশেষত্ব। শেয়াল কুকুরকে এমন নির্বিকার চিত্তে খাওয়া শেষ হওয়ার সংবাদ দিল যার মধ্যে শেয়ালের শ্রেণিচরিত্র খুব স্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে পড়ল।

আবহমান কাল ধরে বঞ্চিত নিগৃহীত অবমানিত মানুষ আজও এইভাবে মাংসহীন শুকনো হাড় চিবিয়ে চলেছে, আর আর্থ-সামাজিক বিভেদজনিত বঞ্চনার বীভৎসতায় আর্তনাদ করে উঠছে থেকে থেকে, আমাদের শ্রেণিবিভক্ত সমাজের দিকে দিকে সেই আর্তনাদ—সেই গোঙানির আওয়াজ।

গ. আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে,
ঢাক মৃদং ঝাঁঝার বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি,
ডুলি গেল সেই কম্‌লাপুলি।
... ...

এক সময় মনে করা হত, আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম শব্দগুলির কোনো অর্থ নেই, পরের

কবিতাংশে কোনো বিয়ের শোভাযাত্রা, কেননা সুখ্যিমামার বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। ছড়ায় অনেক অসংলগ্ন বিষয় ও শব্দ থাকে, সেটাই ছড়ার সৌন্দর্য।

এই ছেলেভোলানো ছড়ার প্রথম দুটি লাইনের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। বাংলার ডোম সম্প্রদায় বলিষ্ঠ সাহসী সৎ ও কর্মনিষ্ঠ। তাঁদেরকে কোনো কাজের দায়িত্ব দিলে প্রাণপণে তা পালন করেন তাঁরা। ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার পরে ইতিহাসের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ডোমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই যোদ্ধা সম্প্রদায়কে রাজা-জমিদার তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করতেন। তাঁরাও আপ্রাণ সৈনিকের কর্তব্য পালন করতেন। ঢাক মৃদং ঝাঁবার যুদ্ধের বাজনা, সেগুলি বাজছে আর ডোম সৈন্যরা এগিয়ে চলেছেন। কেমন সৈন্য? আগ অর্থাৎ এগিয়ে-থাকা ডোম সৈন্য, বাগ অর্থাৎ পাশে-থাকা ডোম সৈন্য আর ঘোড়ায় অশ্বারোহী ডোম সৈন্য।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, পরবর্তীকালে রাজা-জমিদারদের সৈন্যবাহিনীতে আর ডোম সৈন্য নেই। উচ্চবর্ণের মানুষেরা সৈনিক হচ্ছে। আসলে বাংলায় বল্লাল সেনের আমলে জাতপাত-বর্ণ প্রভৃতির কুৎসিত আঘাতে ডোম সম্প্রদায় হয়ে পড়লো অন্ত্যজ শ্রেণি। তাঁরা দেখলেন, রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁরাই রক্ত ঝরান, আর তাঁরাই উচ্চবর্ণের ঘৃণার পাত্র হয়ে রয়েছেন। অভিমান অপমান থেকে তারা ধীরে ধীরে সরে এলোন মূল স্রোত থেকে। গাঁয়ের প্রান্তে কিংবা আরও দূরে তারা অবস্থান করতে লাগলেন। হয়ে গেলেন অন্ত্যেবাসী। আজও সেই বিপর্যয়কারী পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি।

১.৮ ❑ মনঃসমীক্ষণাত্মক পদ্ধতি

অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) লোককাহিনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবক। মানুষের ব্যবহারে অবচেতন মনের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশ শতকে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। যদিও পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের বহু তত্ত্ব বহু বিরূপতার মুখোমুখি হয়, কখনো বা সংশোধিতও হয়। কিন্তু তবু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডের যথেষ্ট মৌলিক অবদান আছে।

মনঃসমীক্ষণাত্মক পদ্ধতিতে প্রতীকধর্মীতাই বিচার-বিশ্লেষণ করার মুখ্য উপাদান। এই পদ্ধতির প্রবর্তক ফ্রয়েড-এর পরে ক্রমে কার্ল গুস্তাভ য়ুং, কার্ল আব্রাহাম, এরিক ফ্রোম, আর্নেস্ট জোন্‌স, গেজা রোহেইম, অটো র‍্যাংক, ব্রুনো বেটেলহেইম প্রমুখ এই পদ্ধতিকে আরো পুষ্ট করে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ থাকলেও একটি বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত—চেতনা, উপলব্ধি, অনুভূতির সর্বস্তরেই একমাত্র যৌনবোধই ক্রিয়াশীল থাকে—এটিই ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব। তবে নব্য ফ্রয়েডীয়রা, যেমন ক্যাল্‌ভিন হল প্রমুখ, লোককাহিনির ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে তেমন উৎসাহী নন।

১৯০০ সালে প্রকাশিত 'দ্য ইনটারপ্রিটেশানস্ অব ড্রিমস' গ্রন্থে ফ্রয়েড প্রাচীন গ্রিসের একটি পরিচিত পুরাকাহিনিকে ('অয়দিপাউস') মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে দেখান—লোককাহিনির মনোসমীক্ষাগত পদ্ধতির শুরু এখান থেকেই। মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের তিনটি স্তরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন : চেতন, অবচেতন এবং অচেতন। প্রতিটি মানুষের সহজাত অনুভব, বুদ্ধিজাত উপলব্ধি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত থেকে বোধ, বিচার ও কল্পনার অভিজ্ঞানের সৃষ্টি করে। এরই ফলে নানাবিধ বস্তু, ঘটনা, ঘটনাস্থল, ব্যক্তি মানুষের মনে তার নিজের অজ্ঞাতে প্রতীকায়িত হয়ে থাকে। এই সমস্ত

প্রতীকগুলিই বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি নিয়ে স্বপ্নের মধ্যে উঠে আসে। আর একইরকমভাবে দেখা দেয় আমাদের আদিম লোকপুরাণ এবং পরবর্তীকালের লোককাহিনির মধ্যে। —ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুসারে এমনটাই মনে করা হয়। ফ্রয়েড লোককাহিনি যেসব উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে, তার অনুসন্ধান করেছেন স্বপ্নের মধ্যে। তাঁর শিষ্য এবং প্রশিষ্যরা তা অনুসন্ধান করেছেন 'সামূহিক নির্জ্ঞানে'র মধ্যে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে তিনটি মনোসঞ্জাত শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে : ইদ্, ইগো, সুপার ইগো। ইদের অভিব্যক্তি স্বীকৃত বা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সহজাত আদিম প্রবণতার তাড়নার মাধ্যমে, যাকে সহজকথায় জৈবিক বা জান্তব বলা যায়। যেমন ক্ষিদে, ভয়, আত্মরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, পরিতৃপ্তি বোধ—ইত্যাদি। ফ্রয়েড অবশ্য এগুলির সঙ্গে যুক্ত করেছেন অবচেতন যৌনতৃষ্ণাকেও। তাঁর মতে একটি শিশু এর সব কটি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনের কারণে ক্রমে তার মনে একটি মান্যতাবোধের জন্ম হয়। মনের অভ্যন্তরীণ জৈবিক প্রবণতা বহিরঙ্গিক অনুশাসনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় তাই 'ইগো' বা 'অহম' গড়ে ওঠে। এবং অনুশাসনের প্রতি মান্যতার বোধটাই 'সুপার-ইগো' হিসেবে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই ইদ্, ইগো এবং সুপার ইগোর অবিরাম টানাপোড়েনে মনের মধ্যে সর্বদাই বিভিন্নরকমের জটিল চিত্র সৃষ্টি হয়ে চলে, যার ফলশ্রুতিতে স্বপ্ন এবং সৃষ্টির প্রেরণা গড়ে ওঠে। মনের অচেতন স্তরে সঞ্চিত হয় অস্ফুট ভাবনার প্রতীকগুলি। ক্রমে অবচেতন ও সচেতন স্তরে সেই প্রতীকগুলিকে মন চিহ্নিত করে ফেলে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী মিথ এবং লোককথায় সেই প্রতীকগুলিই আত্মপ্রকাশ করে। 'সুপার-ইগো' দ্বারা অবদমিত 'ইদ'-এর মোক্ষণ ঘটে এই প্রতীকের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে। আর তার ফলশ্রুতিতে যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিকারী বিভিন্ন অনুভূতি গড়ে ওঠে এবং পৃথক পৃথক প্রতীকের মাধ্যমে সেগুলি প্রতিভাসিত হয়। এক-একটি লোককাহিনির সমস্ত চরিত্র, ঘটনা এবং দ্বন্দ্ব—সবই এই পদ্ধতির বিচারে স্বপ্নজাত অথবা নির্জ্ঞানজাত সেই যৌন-প্রতীকেরই দ্যোতনা বহন করে।

উদাহরণের সূত্রে উল্লেখ করা যায় লোককাহিনি বা লোকসংস্কারে '৩' সংখ্যাটির ব্যবহারের কথা। কোনো একটি কাজ 'তিনবার' করার কথা বা তিনজনের কাছে কাহিনি বর্ণনা করা, অথবা তিনবার-এ কৃতকার্য হওয়া ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী '৩' হল যৌন-সার্থকতার প্রতীক (নারী + পুরুষ = সন্তান)। এই ধারণাকে তাঁরা বিশ্বজনীনভাবেই প্রয়োগ করতে চান। এছাড়াও ঘুমের মধ্যে দেখা নির্দিষ্ট বস্তুগুলির প্রতীকবিভাজনের ক্ষেত্রে মূল প্রবণতার ছকটি হল পুরুষ এবং নারীর। যেমন ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী স্বপ্নে দেখা গাছ, পাহাড়ের চূড়া, যে-কোনো চেহারার যন্ত্রপাতি বা বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সবগুলিই পুরুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তেমনি ঘর, গুহা, জানালা, হ্রদ, নদী, জমি, ফসলক্ষেত, সাঁকো ইত্যাদি নারীর অবচেতন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিটি পশ্চিমি লোককাহিনি বিশেষজ্ঞদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে তাঁরা 'স্নো-হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ড্যোআর্ফজ' কাহিনিটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 'স্নো-হোয়াইটের' শুভ্র-বর্ণ তার 'নিষ্পাপ কৌমার্যের প্রতীক, লাল আপেলে কামড় দেওয়া হল তার যৌনচেতনার উন্মেষ, [স্মরণীয় যে, বাইবেলেও ঈভেনর যৌনচেতনা উন্মেষের মূলে ছিল শয়তান-প্রদত্ত আপেল], মৃত্যুর মত নিথর হয়ে যাওয়া শৈশব সাঙ্গ হওয়া, রাজকুমারের স্পর্শে বেঁচে ওঠা পূর্ণায়ত নারীত্বের বিকাশ, আয়নায় রানির বার-বার মুখ দেখা আত্মরতির প্রতীক, সতিন-কন্যার প্রতি রানির অসূয়া সদ্যযৌবনার প্রতি গতযৌবনার ঈর্ষা, সাত বাঁটুল হল অপূর্ণ

পৌরুষের প্রতীক'। এই একই ধারায় এঁরা 'লিটল রেড রাইডিং-হুড' কাহিনিটিকে ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে লালটুপি হল রজোদর্শনের প্রতীক, নেকড়েবাঘ পুরুষের কামুকতার দ্যোতক, ইত্যাদি। আবার 'দি ফ্রগ কিং' কাহিনির ব্যাঙকে এঁরা পুরুষাঙ্গের প্রতীক, বা জ্যাক অ্যান্ড 'দ্য বিনস্টক' কাহিনির সিমগাছকেও পুরুষাঙ্গের প্রতীক বলছেন। 'ড্রাগন স্লেয়ার' কাহিনির ড্রাগনকে যৌনবাসনা চরিতার্থ করার পথের প্রতিবন্ধকতার প্রতীক বলছেন।

বাংলা লোককাহিনির ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিটি এতটা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা না গেলেও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যেমন 'শঙ্খকুমার' কাহিনিতে মন্ত্রপূতঃ কলা খেয়ে গর্ভসঞ্চারের ফলে জন্ম নেওয়া শঙ্খ থেকে ছেলে বেরিয়ে এসে রাত্রে দুধ খেয়ে যায়—এর সবগুলিই (শঙ্খ, কলা) যৌনতার প্রতীক। বাংলা লোককাহিনির ক্ষেত্রে এটি একটি পরিচিত ঘটনা—মন্ত্রপূতঃ শিকড়, মন্ত্রপূতঃ বিশেষ ফল, যেমন শশা (দেড় আঙুলে কাহিনিটি) ইত্যাদি খেয়ে গর্ভবতী হওয়া—এ সবই যৌনতার প্রতীক। আবার দেড় আঙুলে কাহিনির নায়ক বা তার বন্ধু আড়াই-আঙুলে কামার—এরাও অপূর্ণ পৌরুষের প্রতীক। 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে যেখানে রাজপুত্রের স্পর্শে শুধু নিদ্রিতা রাজকন্যা নয়, তার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জেগে উঠছে—আসলে এটি যৌনচেতনা উন্মেষেরই প্রতীক। আবার 'পাতাল কন্যা মণিমালার কাহিনিটির প্রতীক ব্যাখ্যাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে অজগরের মাথায় মণির স্পর্শে নিদ্রিতা মণিমালার ঘুম-ভাঙার ঘটনাটি যৌন-চেতনা উন্মেষের প্রতীকরূপে গণ্য হতে পারে। কারণ উর্বরতাতন্ত্রের সংস্কার অনুযায়ী সাপ এবং তার মাথার কল্পিত মণি, দুই-ই যৌনাঙ্গের প্রতীক। শুধু তাই নয়, এই কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে ঐ মণির সহায়তায় পাতালে প্রবেশের অজানা পথ উন্মোচিত হচ্ছে রাজপুত্রের কাছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী এটি রাজপুত্রের 'অচেনা-যৌনতাবোধ' উন্মেষের প্রতীকরূপে গণ্য হতে বাধা নেই।

ফ্রয়েডের পরে এই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করেন কার্ল আব্রাহাম। ১৯১৩ সালে তাঁর 'ড্রিমস অ্যান্ড মিথস্' গ্রন্থে তিনি প্রাচীন গ্রিসের প্রচলিত পুরাকাহিনি প্রমিথিউসকে বিশ্লেষণ করেন। পৃথিবীর প্রায় সব কটি আগুন-বিষয়ক লোককথায় লক্ষণীয় যে, আগুন-বাহকেরা প্রত্যেকেই পাথরের লাঠি দিয়ে বিদ্যুতের কাছ থেকে আগুন বয়ে আনতেন। আব্রাহামের মতে যারা আগুন বয়ে আনলেন তারা হলেন পৌরুষের প্রতীক; পাথরের লাঠি পুরুষ-লিঙ্গের প্রতীক; কাঠের ছিদ্রযুক্ত যে পাত্রে আগুন ধরে রাখা হত সেটি স্ত্রী যৌনাঙ্গের প্রতীক। জর্মন মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রোমও এই একই ব্যাখ্যা করেছেন। লোককথায় বর্ণিত মাছের পেটে লুকিয়ে থাকা, জাহাজের খোলে বন্দী থাক—ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নারীর যৌনাঙ্গের প্রতীক বলে বিশ্লেষণ করেছেন। সুইটজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ য়ুং-ও এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে যৌনপ্রতীকগুলিকে নিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। য়ুং-এর মতেও মানসিক যৌন অতৃপ্তি থেকেই পুরাকাহিনি এবং লোককাহিনিগুলির জন্ম।

তবে এই সূত্রে রুনো বেটেলহেইমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনিও মূলত যৌনপ্রতীকবাদী; কিন্তু মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতিতে যৌনপ্রতীক ছাড়াও অন্য মাত্রা যোগ করেছেন। যেমন 'সিণ্ডারেলা' কাহিনিতে সৎ-বোনেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করেছেন জ্ঞাতি-বিরোধের প্রতীক হিসেবে। 'হ্যানসেল এবং গ্রেটেল' কাহিনিতে বাবা-মায়ের সন্তান পরিত্যাগ-বিষয়ক ঘটনাকে ছেলে-মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের একাকীত্ববোধের প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছেন। আবার বনের পথে রুটির টুকরো ছড়িয়ে রেখে পথ-চিহ্নিতকরণের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন ক্ষুধার সর্বগ্রাসী প্রভাবের প্রতীকে। অর্থাৎ মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

যৌনচেতনা ছাড়াও অন্য একটি মৌল চেতনা, আকুতি (বা urge) ক্ষুধারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুতরাং বেটেলহেইমের মনোবিশ্লেষণজনিত গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করতে হবে।

লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে; তবে এই পদ্ধতিকে লোকসংস্কৃতিবিদরা মান্য করতে চাননি; কারণ এঁদের মতে শুধুই যৌন প্রতীকের অনুসন্ধান আরোপিত কষ্টকল্পনা। বাস্তবিক পক্ষেই এই পদ্ধতির সর্ববৃহৎ ত্রুটি হল শুধুমাত্র একপেশে যৌনতাসর্বস্ব মনোভঙ্গী। লোককাহিনির ক্ষেত্রে যৌনপ্রতীক বা উর্বরতার ভাবনার কিছু না কিছু ভূমিকা অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটাই সবটুকু নয়। বিশেষ করে প্যাভলভীয় তত্ত্ব ভাবনার প্রতিবর্ত প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে সর্বত্রই ইদ-ইগো-সুপার-ইগোর মানসিক অভিব্যক্তিগুলি একান্ত যৌনতাসর্বস্ব হয়েই ক্রিয়াশীল থাকে না। গ্রিক-পুরাণের অয়দিপাউসের কাহিনিটিকে ফ্রয়েড যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে অবোধ শিশুর অনুভূতির স্তরে যৌনতা অবলীন হয়ে থাকার কথা বলেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ এইরকম : শিশু অয়দিপাউস মায়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত এবং শৈশবে পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত; যৌবনে এই সুপ্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজের অজ্ঞাতেই, অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে সাবালক অয়দিপাউস পিতাকে হত্যা করে এবং নিজের মায়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। গল্পটিকে ফ্রয়েড বিশেষ ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে ব্যবহার করলেও সর্বত্র এই বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে গেলে তা অনিবার্যভাবে অসঙ্গত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা এবং যৌনবোধ—এই দুটির আনুপাতিক প্রয়োজনে প্রথমটির প্রভাবই বেশি। অতএব ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'প্লেজার প্রিন্সিপ্‌ল' সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। সুতরাং লোককাহিনির মধ্যে সর্বদাই যে-দুটি শক্তির প্রতীক পরস্পর প্রতিস্পর্ধী হয়, সেখানে সর্বত্রই যে 'ইদ্' এবং 'সুপার-ইগোর' দ্বন্দ্বের সূত্রে 'ইগোর' পরিণাম সূচিত হয়, এটা বলা যাবে না।

১.৯ ☐ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি : সামগ্রিক পর্যালোচনা

লোকসংস্কৃতির অভিনিবিষ্ট চর্চার জন্য এই বইতে আলোচিত সমস্ত বিশ্লেষণ-পদ্ধতিগুলিই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এক-একটি পদ্ধতি এক-একভাবে উপজীব্য বিষয়গুলির স্বরূপ এবং চরিত্রের উদ্‌ঘাটন করে। কমবেশি সীমাবদ্ধতা প্রায় অধিকাংশেরই আছে; তাই লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে সবগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার; না থাকলে অন্বেষণে অসুবিধা ঘটবে।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হল এই যে, মাত্র একটি কাহিনিরই বিভিন্ন রূপান্তর সম্পর্কে অবহিত করায় এটি, একই ধরনের উপকরণের আংশিক-সাহায্যে-গড়া অনেকগুলি লোক-কথার বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অপারগ। সেই অনুপপত্তি দূর করতে পারে টাইপ-মোটিফ বিশ্লেষণ পদ্ধতি। কিন্তু সেখানেও, টাইপের ব্যাপারে ততটা না হলেও, মোটিফের ক্ষেত্রে অসংখ্য সূচক গড়ে-ওঠার পথ স্থায়ীভাবে খোলা থাকে বলে, অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকেই যায়। এই বিশ্লেষণ-ব্যাপ্তির বিপরীতে আবার অতি-সংশ্লেষণের ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনাও থাকে রূপতাত্ত্বিক এবং আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিদুটির ওপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে। তাছাড়াও, রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্কেতনির্মাণে কোনোও বিশ্বজনীন সূচক তালিকা করা সম্ভব নয় যে, সে আলোচনা যথাস্থানেই করা হয়েছে। তাছাড়া রূপতাত্ত্বিক এবং আঙ্গিকবাদী দুই পদ্ধতিতেই এত বেশি গণিত-নির্ভরতা দেখি যে, শিল্প-সাহিত্যের প্রাণসত্তা যা—রসের ব্যঞ্জনা, তার

সন্ধান মেলে না আদৌ সেখানে। জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি, যতটা না বিশ্লেষণাত্মক-তার চেয়ে অনেক বেশি আবেগ এবং/অথবা প্রচারকেন্দ্রিক। পুরোদস্তরভাবে এটিকে জ্ঞানশৃঙ্খলার সীমানাগত বলে ধরা যায় না স্বাভাবিক কারণেই। তবে লোকসংস্কৃতির চর্চার ইতিহাসে এর সামাজিক-রাজনৈতিক অভিক্ষেপটুকুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সামাজিক-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে-উঠেছে বলে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির সামগ্রিকতা নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বেশি। আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির মতন কাল-নিরপেক্ষ সামুহিক (সিন্‌ক্রোনিক) নয় এটি; পক্ষান্তরে কাল-পরম্পরিত (ডায়াক্রোনিক) বলে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঘটনা ও চরিত্রের স্বরূপবিচার করা সম্ভবপর হয়। সমাজ-মনস্তত্ত্ব, শ্রেণিবিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো ইত্যাদি নানান্ বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে দেয় এই পদ্ধতি অবলম্বন-করা বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিও অত্যন্ত ব্যাপক এলাকাকে অবলম্বন করে ক্রিয়াশীল হয়। ব্যক্তিমন এবং সমাজমন, উভয়ক্ষেত্রেই। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিরও একটা দুর্বল দিক আছে অবশ্য; ফ্রয়েডীয় ধারার বিচারের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করলে সেই দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। সেটা হল, যৌনতা-সম্পর্কিত অনুষঙ্গ। জীবনের মৌল-চাহিদাগুলির মধ্যে যৌনাকাঙ্ক্ষার ভূমিকা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ক্ষুধার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, পরবর্তীকালে যৌনতার পাশাপাশি, ক্ষুধা এবং ভয়ও (যা সহজাত একটি আদিম কালাগত মনোপ্রবণতা) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে খুবই গুরুত্ব অর্জন করেছে স্বাভাবিকভাবেই। এর সূত্রে, এই পদ্ধতিতে কাহিনির অন্তর্গত আর্থ-সামাজিক কাঠামোটিও সন্ধান করা সহজসাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষা; টাইপ-মোটিফ নির্ণয় পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্তর্বীক্ষণ; রূপতাত্ত্বিক ও আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিদুটির গাণিতিক দৃঢ়ভিত্তিকতা; ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে চলমান ইতিহাসের অন্তর্গত দ্বান্দ্বিক স্তরায়ণ, নির্দেশ এবং মনোবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে ব্যক্তি-ও-সমাজের ভাবনার স্বরূপ সন্ধান-এই সবগুলি মিলেই একজন লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষকের অন্বেষণ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাই, এই সমস্ত কটি পদ্ধতিরই বিশেষ গুরুত্ব আছে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে।

১.১০ ☐ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে একটি লোককথার ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে চিহ্নিত করা যায়, একটি কল্পিত-উদাহরণের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করুন।

২. টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধতির গুরুত্ব কতখানি বলুন এবং আর্নে ও টমসনের নির্দিষ্ট টাইপ-বর্গগুলির সাধারণ পরিচয় দিন।

৩. মোটিফ কাকে বলে? মোটিফ ও টাইপের সম্পর্ক কী? মোটিফ-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব কী? এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নির্দেশ করুন।

৪. রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল তত্ত্বটি কী? এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করুন।

৫. "আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকার—বিশেষত, লোককথা-প্রবাদ-ইত্যাদি বিশ্লেষণের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় সমালোচনা হল এই যে, এর মাধ্যমে বিচার করলে লৌকিক প্রকরণের নান্দনিক এবং কালানুক্রমিক দিকগুলি উপেক্ষিত হয়।" এই কথার যাথার্থ্য বিচার করুন।

৬. জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির বিকাশ কীভাবে ঘটেছে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখান।
৭. ঐতিহাসিক "বস্তুবাদী পদ্ধতির সহায়তা নিয়ে এক বা একাধিক লোককাহিনির অন্দরমহল থেকে সমাজ ইতিহাস কীভাবে বিকশিত হয়েছিল, তার সন্ধান মেলে।" —এই কথার তাৎপর্য নির্ণয় করুন।
৮. মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সূত্রে নানাধরনের প্রতীক ও সংকেত কেমন করে লোককাহিনির মধ্যে বিধৃত থাকে, দেখান।
৯. ঐতিহাসিক বস্তুবাদী এবং মনস্তাত্ত্বিক—এই দুটি বিচার পদ্ধতিকে সমন্বিত করে বিশ্লেষণ করা হলেই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের অন্তর্নিহিত ভাবরূপকে সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারা যায়। যাথার্থ্য বিচার করুন।
১০. যে-কোনও একটি বা কয়েকটি বিখ্যাত লোককাহিনি—দেশি বা বিদেশি—বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখান।

১.১১ ☐ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. ফিনিশ লিটেরারি সোসাইটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।
২. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কোথায়, দেখান।
৩. টাইপ-মোটিফ পদ্ধতি অবলম্বন করে লোককথার বিশ্বজনীন চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।
৪. রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির নিয়ামক তত্ত্বটি বিশ্বজনীন হলেও, তার চিহ্ন/সংকেত/প্রতীক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দেশ-কাল-ভাষা-সংস্কৃতি ভেদে পার্থক্য হয় কেন, বলুন।
৫. আঙ্গিকবাদী বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক, কারণসহ সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।
৬. জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি ব্যবহারের ভালো এবং খারাপ দিকগুলি কী-কী, বলুন।
৭. ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সমাজতাত্ত্বিক সত্যটি কী, আলোচনা করুন।
৮. মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে লোককথা বিশ্লেষণ করলে কি আলোচনা একদেশদর্শী হয়ে পড়ে? আলোচনা করুন।

১.১২ ☐ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. লোককথাচর্চার ইতিহাসে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের গুরুত্ব।
২. এন্‌টি আর্নের সহযোগী কারা ছিলেন?
৩. লুন্ডে শহরে ১৯৩৫ সালের ফোকলোর কংগ্রেসে কী প্রস্তাব নেওয়া হয়?
৪. ভেরিয়ের এলুইনের দুটি বইতে কী দেখা গিয়েছিল?
৫. মোটিফ সবচেয়ে বেশি থাকে কোন ধরণের লোককথায়?
৬. 'মরফোলজিয়া স্কাজকি' কার লেখা? কোথা থেকে, কবে প্রকাশিত হয়?

৭. ফাংশনাল ইউনিট কাকে বলে?
৮. 'L' এবং 'LI' সংকেতদুটির তাৎপর্য কী?
৯. মোটিফেম এবং অ্যালোমর্ফ শব্দদুটির তাৎপর্য কী?
১০. 'শিণ্ডো' মানে কী?
১১. 'এনসেন্ট সোসাইটি' এবং 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট' বই দুটির রচয়িতা কারা?
১২. 'ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস' কার লেখা, কবে লেখা?

১.১৩ ☐ নির্বাচিত গ্রন্থসূচি

Hautala, J. : The Folklore Collections of the Finnish Literature Society. Helsinki, 1947

Crawford, J. M. : The Kalevala, New York, 1888.

Leach, Maria (Ed.) : Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend. (Vols-I & II) New York, 1949.

Fiske, John : Myth and Myth-makers, Boston, 1872.

Shipley, Joseph (Ed.) : Dictionary of World Literary Terms, London, 1970.

Maranda, E. K. and P. : Structural Models in Folklore and Transformational Essays. The Hague, 1971.

Thompson, Stith : Motif-Index of Folk-literature, (Vols. 1–6) Bloomington, 1955-1958.

(do) : The Folktale. California 1977.

Propp, Vladimir J. : Morphology of Folktale, Indiana, 1971.

(do) : The Historical Roots of the Fairy-tales. Leningrad, 1946.

Dundes, Alan. : The Study of Folklore. London, 1965.

Levi-Strauss, Claude. : The Structural Study of Myth, JAF 68. 1955.

(do) : Structural Anthropology. I & II, New York, 1963.

Melville, Jacobs. : The Content & Style of An Oral Literature. Chicago, 1959.

Thompson, Stith and Balys, Jonas. : The Oral Tales of India, Bloomington, 1958.

Dorson, Richard. M. : Folklore Research Around the World. Bloomington, 1961.

Arne, Antti & Thompson, Stith : The Types of the Folktales. Helsinki, 1961.

Gaer, Joseph.	:	The Fables of India, Boston, 1955.
Marx, K. F. Engels	:	Selected Works. Moscow, 1968.
ইসলাম, মযহারুল	:	ফোকলার পরিচিতি ও পঠন পাঠন। ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪।
ঐ	:	ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। কলকাতা, ১৯৮২।
সেনগুপ্ত, পল্লব	:	লোককথার অন্তর্লোক। কলকাতা-২০০১
ঐ	:	লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২।
ঐ সম্পাদিত	:	লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি। কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫।
পোদ্দার, সুস্মিতা	:	লোকসংস্কৃতি-ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কলকাতা, ২০০১।
মজুমদার, দিব্যোজ্যোতি	:	বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২।
ঘোষ, রীতা	:	বাংলা লোককথার রূপতত্ত্ব, কলকাতা, ২০০২।
চৌধুরী দুলাল সম্পাদিত	:	বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ। কলকাতা ২০০৪।
চক্রবর্তী, বরুণ সম্পাদিত	:	বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ২০০৪।
মার্ক্স, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক	:	রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ। মস্কো, ১৯৫৫।

পর্যায় ❐ দুই

২.১ সংস্কৃতির বিবর্তন : লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোকে

২.২ লোকসংস্কৃতি : গণসংস্কৃতি : জনসংস্কৃতি : পপ্‌লোর

২.৩ লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

২.৪ গণসংস্কৃতি : জনসংস্কৃতি : পপ্‌লোর

২.৫ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় সংস্কার ও অলৌকিকত্ব

২.৬ উপসংহার

২.৭ অনুশীলনী

২.১ ❐ সংস্কৃতির বিবর্তন : লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোকে

১.১ সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমেই বেশি করে মানুষ হয়ে উঠছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও রূপান্তরিত হচ্ছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব-সংস্কৃতিতে। এই রূপান্তরের ধারা কোন্ দিকে চলছে, বা কি নিয়মে চলছে তা আমরা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি ইতিহাসে, সমাজবিজ্ঞানে, মনস্তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। মানব-সংস্কৃতির মূল কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, টিকে থাকার চেষ্টা, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তার থেকেই উপায় বার করে বাঁচার উপায় নির্ণয় ; আর সংস্কৃতির মোটি অর্থ মানব-প্রকৃতির স্বরাজ সাধনা। জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয়, সংস্কৃতিরও পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, মানে, তার পরিবর্তন চলে। বস্তুত এই প্রকারে মানুষও পরিবর্তিত হয়ে চলে ; আর মানুষ ও তার পরিবেশ দুইই পরিবর্তনের স্রোতে পরস্পরকে পরিবর্তিত করে চলছে। মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের শক্তি আছে বলেই সে মানুষ, আর ঠিক সেই কারণেই মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

বিষয়পরিধি ও অনুশীলনপদ্ধতিগত দিক থেকে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়, যার মধ্যে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব,

নন্দনতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আর বিশিষ্ট অধীতব্য বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির অবস্থান কেন্দ্রবিন্দুতে এবং বহুবিধ পরস্পরাশ্রয়ী বিষয়ের সমন্বয়ী সহায়তায় গতিশীল ক্রমানুপ্রবাহের আবর্তন সৃষ্টি করে। তাই লোকসংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে নানারূপে এমন সমস্ত উপাদান-উপকরণ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, যার সাহিত্য-নন্দনতত্ত্বগত মূল্য থেকে সামাজিক-ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিক-নৃতত্ত্বগত মূল্য অপরিসীম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লোকসংস্কৃতি-অনুশীলন পদ্ধতিগতভাবে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে অভিযোজন অভিমুখী যে জীবনপ্রচেষ্টা এবং পরিবেশের প্রতিক্রিয়াজাত যে জীবনপ্রবৃত্তি, তারই ঐকান্তিক সক্রিয়তা লোকসংস্কৃতির মর্মমূলে নিহিত—এই বিশ্বাস লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণের মধ্যে ক্রমপ্রাধান্য লাভ করে। লোকসংস্কৃতির অভিপ্রকাশ ও স্বরূপকে দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ রূপে বিচারের প্রবৃত্তি বস্তুবাদী বিশেষত বিবর্তনবাদী চেতনার ফল। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত করে এবং লোকসংস্কৃতিকে সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা করে দেখার চেষ্টা ক্রমশ লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যাগত প্রবণতাকে প্রবল করে তোলে। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বভিত্তিক মতবাদ ও পদ্ধতিসমূহ সবসময় একই পথে প্রবাহিত হয়েছে এমন নয়, বিভিন্নমুখী প্রবণতা অনুসারে তা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সব রকমের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রথমেই সাংস্কৃতিক-বিবর্তন-মতবাদ ও উৎস-অনুসন্ধান পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডারউইনের 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ' (১৮৫৯) গ্রন্থটি প্রকাশের পর সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে তা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় প্র-তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে মহতের অধঃপতনের তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের তথাকথিত আদিম ও অর্ধ সভ্য মানুষের প্রথা-বিশ্বাস-রীতি-নীতি প্রভৃতির মধ্য থেকে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। এই সূত্রে তথাকথিত বর্বরতার স্তরেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল বলে বিবেচিত হয়। বিবর্তনের ধারায় লোকসংস্কৃতির কতিপয় ভগ্নাংশ সভ্যতার কালে 'সারভাইভাল' বা অবশেষ হিসাবে বিবর্তিত হবার পরে 'Survival of the past age of Savagery' তত্ত্বের ভিত্তিতে ইতিহাস পুনর্গঠনপদ্ধতি বা 'Historical reconstruction theory' বিকাশ লাভ করে। এই ধারায় লোকসংস্কৃতির অন্বেষায় নতুন গতিবেগও সঞ্চারিত হয়। ই. বি. টাইলরের 'প্রিমিটিভ কালচার' (১৮৬৫) ও লুইস এইচ. মর্গানের 'দি এনসেন্ট সোসাইটি' (১৮৭৭) গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ এবং লন্ডন শহরে 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) ও 'ফোকলোর রেকর্ড' পত্রিকার প্রকাশ (১৮৭৮-১৮৮২) এই সময়ের কয়েকটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিবর্তনবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী লোকসংস্কৃতিবিদগণের মতে লোকসংস্কৃতিতে বিধৃত জীবনাদর্শ মূলত প্রাচীন বিশ্বাসেরই পরিচায়ক। এগুলির মধ্যে প্রতিফলিত বিষয়সমূহ এ কালের বস্তু নয়, এগুলি প্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে বর্তমানকালে বিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদীরা মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং অনুমানভিত্তিক ইতিহাস-পুনর্গঠনের মূল্যবান উপাদান হিসাবে তাঁরা লোকসংস্কৃতিকে গ্রহণ করেন। এই সূত্রে লোকসংস্কৃতি গবেষণায় যে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করে, তার মূল চালিকাশক্তি হয় ডারউইনের বিবর্তনবাদ। তুলনামূলক পদ্ধতির উৎসানুসন্ধানে বা উৎস নির্ণয়ের

প্রচেষ্টায় সমস্ত সংস্কৃতি একই রূপে বিবর্তনের ধারায় প্রবাহিত ও বিকশিত হয়—এই মতটি মূলত এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সর্বত্র মানবসমাজ সমরূপ পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে একইভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, তাই বর্তমানের কোন অগ্রসর লোকসমাজের লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিকতর অগ্রসর কোন জাতির অতীত উদ্‌ঘাটন সম্ভব—এই বিশ্বাস তুলনামূলক পদ্ধতির মধ্যে সক্রিয়। এই প্রসঙ্গে 'ফোকলোর : সায়েন্‌টিফিক ট্রিটমেন্ট' নামের একটি আলোচনায় প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ জর্জ লরেন্স গোম মন্তব্য করেছেন, "The custom, rite and belief, which are properly called folklore, are to be found embedded in civilization at its earlier stages. For this reason they are capable of comparison, first, with parallel customs, rites and beliefs embedded in civilization of practically the same standard, or of a wholly different standard. Secondly, they are comparable with parallel custom, rite, and belief of a tribe or race of barbaric or savage peoples". [George Lawrence Gomme—Folklore : Scientific Treatment / Encyclopaedia of Religion and Ethics, Ed. James Hastings, 1937, Vol. 6; p-58.]

বিবর্তনবাদী মতে বিশ্বাসী গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন টাইলর, গোম, ল্যাঙ, ফ্রেজার, মিস ওয়েসটন প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে এ্যান্ড্রু ল্যাঙ সমান্তরাল কৃষ্টির উদ্‌ভবতত্ত্ব বা সাংস্কৃতিক-বিবর্তনতত্ত্বকে গ্রহণ করে 'প্রাচীনতার ক্রমাগ্রসরতার মতবাদ'-এর ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অগ্রসর হন, যা লোকসংস্কৃতির অনুশীলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে Atomistic Diffusionistic মতবাদের বিরোধিতা করে ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড বি. টাইলর এবং তাঁর অনুসারী অ্যানড্রিউ ল্যাঙ-এর নেতৃত্বে নৃতাত্ত্বিক মতবাদ গড়ে ওঠে। এঁরা, বিশেষত ল্যাঙ, মনে করেন যে, পুরাণ ভেঙে লোককথার সৃষ্টি হয়নি ; এগুলি প্রাচীন সমাজেরই অনুবর্তনজাত। এঁদের সর্বমানবসমাজের সমধারায় বিকাশ-তত্ত্বে বিবর্তনের তিনটি স্তর কল্পিত হয়েছে—

১. Savagery - আদিমতা
২. Barbarian - বর্বরতা
৩. Civilization - সভ্যতা

এখানে বলার কথা এই যে, এই সব শব্দগুলির মধ্যে যে-অবজ্ঞা ও অবমাননা এখন সূচিত হয়, উনিশ শতকে কিন্তু সেভাবে এরা ধার্য হতো না।

সাংস্কৃতিক বিবর্তনতত্ত্ব কালক্রমে চূড়ান্ত আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নৃতত্ত্ব-লোকসংস্কৃতি গবেষণায় তা সর্বতোরূপে পরিত্যক্ত হয়নি। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণ অ্যানড্রিউ ল্যাঙ-গোষ্ঠীর ন্যায় লোকসংস্কৃতিকে কেবলমাত্র ক্রমাগ্রসর কাল্পনিক প্রাচীনতা অনুশীলনের বস্তু হিসাবে বর্ণনা করলেও প্রাচীনতার অবশেষ যে লোকসংস্কৃতির মধ্যে বিমূর্ত থাকে এ সত্য অস্বীকার করেন না। এই সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি ও মানবসমাজের অতীত বিষয়ক আলোচনায় প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ এলিস্ ডেভিডসন বলেছেন—

> "We realize now that folklore is not merely a study of survival fossilized pieces of quaint tradition from hypothetical past. Yet it does provide a link with past." [H.R. Ellis Davidson Folklore and Man's Past / Folklore, London, Vol. 74, Winter 1963 p. 527.]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সভ্যতার আদিকাল থেকেই সংস্কৃতির সূত্রপাত। বস্তুত, বাঁচবার প্রয়োজনে মানুষ যে ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে, তারই অনিবার্য অনুষঙ্গে প্রকাশ হয়েছে তার মানস-সম্পদ-সঞ্জাত অভিব্যক্তিগুলিরও।

১.২ 'এই পরস্পর সাপেক্ষ বিকাশটিরই একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্দেশ করেছেন লুইস হেনরি মর্গ্যান। তিনি বলেছেন, মানুষের সভ্যতার বিবর্তন সমস্ত দেশ-কাল-সমাজেই একটি সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা গথে এগোচ্ছে। এই বিবর্তন ঘটেছে, আজও ঘটছে, পারস্পরিক কয়েকটি স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়ার মাধ্যমে। যেমন—আন্দামানের ওঙ্গোরা, নীলগিরির অরণ্যের চোলানাইক্কাররা, বিহার-বাংলার সাঁওতালরা, কোন্ স্মরণাতীতকালে পূর্ব-আফ্রিকার কোনও এলাকা থেকে অজ্ঞাত ও বিচিত্রভাবে চলে আসা এবং বর্তমানে গুজরাটের গির অরণ্যের একটি ছোট্ট নিগ্রোয়েড গোষ্ঠী, সিকিম-তিব্বত সীমান্তের অনামা একটি আদিম গোষ্ঠী এবং ত্রিপুরা-অঞ্চলের রিয়াংরা,—এঁরা সকলেই বর্তমান ভারতের অধিবাসী। সেপাস বিভাগের খাতায়, নৃবিজ্ঞানের বইতে এবং খবরের কাগজের পাতায় এঁদের পরিচয় 'আদিবাসী' হলেও, বাস্তবে সাংস্কৃতিক স্তর পর্যায়ের বিচারে অনেক এগিয়ে-পেছিয়ে রয়েছেন। যেমন, ওঙ্গোরা এখনো মধ্য-প্রস্তর যুগের মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করত; প্রায় সেভাবেই দিন কাটান। মাছ মেরে, কাঁকড়া-কচ্ছপ ধরে, নারকেল ও অন্যান্য ফলমূল সংগ্রহ করে এবং ছোটখাট প্রাণী—যেমন-শুওর—শিকার করে তাঁরা দিনযাপন করেন। পরণে তাঁদের আজও কেবল ঘাসের ঘাঘরা এবং আগুন জ্বালানোর সমস্যার কারণে আজও তাঁরা আগুন সংরক্ষণ করেন। বিবাহাদির সংস্কার এবং অন্যান্য পৌরাণিক ও জাতিগত সংস্কার এঁদের আছে—আদিম জাতিসুলভ দেহসজ্জাও তাঁরা করেন। তবে গণ্ডীবদ্ধ ও দ্বৈপায়ন একটি ছোট জাতি হবার ফলে যৌনবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই এঁরা ক্রমক্ষয়িষ্ণু। এঁদের পাশাপাশি সাঁওতাল এবং রিয়াংরা সাংস্কৃতিক সিঁড়ির অনেক অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে বর্তমানে অনেকেই একালীন সমুন্নত জীবনচর্যার সঙ্গে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এঁরা কৃষি ও চাকুরীজীবী ; মেধা ও শ্রম দুটি মাধ্যমেই এঁদের চাকুরিতে কাজে লাগে। কিন্তু চোলানাইক্কাররা এখনও গুহাবাসীই। কৃষি এখনও তাঁদের অজ্ঞাত। গির অরণ্যবাসী আফ্রিকার ঐ গোষ্ঠীর মানুষরা এখনও আঁকড়ে আছেন তাঁদের বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের ধর্ম-দেবতা-রীতি-আচার-নৃত্যগীত-মিথকথা সবকিছুই। সিকিম-তিব্বতের সীমান্তে বরফাচ্ছন্ন গহন পার্বত্য অঞ্চলে 'আদিম গুহাবাসী' মানুষও এখনও রয়েছেন। যাঁদের কাছে বছর ২৫ আগে পর্যন্ত লজ্জানিবারণের ব্যাপারটিও অজ্ঞাত ছিল।

সুতরাং, এই পাঁচটি আদিবাসী গোষ্ঠী একই রাষ্ট্রভুক্ত এবং সমকালীন হলেও সংস্কৃতির পর্যায় বিচারের ক্ষেত্রে পরস্পরের থেকে অনেকটাই ফারাকে রয়েছেন। মর্গ্যান যে সমস্ত পারিবেশিক-অর্থনৈতিক বিকাশগুলিকে সাংকেতিক অগ্রগমনের সূচক বলে নির্দেশ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই স্থান-বিন্যাস করে দেখান যায় যে আদিমতম জীবনযাত্রার সূচক মান যদি '১' এবং আধুনিকতম জীবনচর্যা যদি '১০০' হয় তাহলে এখানে আলোচিত পাঁচটি গোষ্ঠীর আনুমানিক মানগুলি অনেকটা এই প্রকার হতে পারে—

(ক) অনামা হিমালয়বাসীরা $= \pm ৫$, (খ) ওঙ্গোরা $= \pm ২৫$, (গ) গির অরণ্যবাসী আফ্রিকান অবতংসরা $- \pm ৩০$, (ঘ) চোলানাইক্কাররা $- \pm ৩৫$, (ঙ) রিয়াংরা $= \pm ৭০/\pm ৮০$ এবং (চ) সাঁওতালরা $= \pm ৮০/\pm ৮৫$। (আনুমানিক হিসেব)

এই পারস্পরিক ক্রমান্বিত স্তরপর্যায়গুলির পরিপ্রেক্ষিতেই মর্গ্যানের তত্ত্বের মূল কাঠামোটিকে স্বচ্ছন্দে বুঝে নেওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুবৃহৎ আদিবাসীগোষ্ঠী ইরোকোয়াদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সূত্রে মর্গ্যান রেড ইণ্ডিয়ান জাতির বিভিন্ন ট্রাইব বা কোম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সূত্রেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের উদ্বর্তনের সাধারণ নিয়মটি আবিষ্কার করেন।' ['লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' : পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা ২০০২; ৫ পৃ. ২০-৩৮ দ্রষ্টব্য।]

মর্গ্যান ইতিহাসের যে-নিয়মকে আবিষ্কার করেছিলেন, তার মাধ্যমে সমকালের পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলির সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি প্রাচীনকালের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল তিনটি পর্যায় নির্দেশ করেছেন। যাদের মধ্যে আবার কতকগুলি উপ-পর্যায়ও রয়েছে। এই পর্যায় ও উপ-পর্যায়গুলি হল এই রকম :

> মর্গ্যান প্রথম স্তরটির নাম দিয়েছেন বন্য অবস্থা (স্যাভেজারি) ; একেবারে আদিমতম প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রার পর্যায় থেকে এর শুরু ; মৃৎপাত্র গড়তে শেখায় শেষ। এরও আবার তিনটি উপ-পর্যায় নির্দেশ করেছেন মর্গ্যান ; (ক) নিম্ন পর্যায়ের বন্য জীবন—যখন থেকে মানুষের মুখে পারস্পরিক ভাবনার আদান-প্রদানের উপযুক্ত ভাষা গড়ে উঠেছে এবং মূলতঃ ফলমূল কুড়িয়ে, গাছ থেকে পেড়ে বা হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে খাবার সংগ্রহ করছে সে ; ছোট ছোট মরা জন্তুর কাঁচা মাংসও তার জীবনযাত্রা নির্বাহের অন্যতম উপকরণ রূপে গণ্য হচ্ছে।' [পূর্ববৎ ; পৃ. ২৪]

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এই স্তরে পৃথিবীর কোন আদিমতম মানুষও আজ আর আটকে নেই। তবে এই পর্যায়ে কোন সামাজিক বিধি তৈরি না হওয়ায়, যৌন সম্পর্কের নিষেধ বা লজ্জা সম্বন্ধে কোনও ধারণা না থাকা, কোনও ক্ষেত্রেই প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করতে না-পারা এই পর্বের লক্ষণ।

এর পরের পর্বের উপ-পর্যায়টি হল, (খ) মধ্যস্তরের বন্যজীবন—যখন মানুষ ছোট ছোট পাথুরে অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে (যেমন—ছুরি, কুড়ুল, খন্তা ইত্যাদি এবং এগুলি দিয়ে ছোটখাট জীবজন্তু শিকার করে বা মাছ ধরে জীবনধারণ করতে শিখেছে। এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল আগুনের ব্যবহার শেখা। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের এই হল শুরু। লজ্জা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তির এবং তারই অনুষঙ্গে যৌন নিষেধ-বিধির উন্মেষও ঘটে এই পর্বে।

এর পরবর্তী উপ-পর্যায় হল : (গ) বন্য অবস্থার উন্নতস্তর। প্রথমে ধনুক এবং তারপর তির-ধনুকের আবিষ্কার এই পর্বের বৃহত্তম গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। তির-ধনুক বা গুলতি জাতীয় জটিল যন্ত্র (সে-যুগের বিচারে) নির্মাণ করতে পারা তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি এবং কারিগরি দক্ষতার সূচক। এই পর্বে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সামাজিক বিধি-বিধান এবং ধর্ম, দেবতা, জাদু, আচার, সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রাথমিক পর্যায়ের নানা ধারণার বিকাশ ঘটেছে, এমনকি আত্মা, পরলোক, প্রেত ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে।

এর পরবর্তী স্তর হল, বর্বর অবস্থা (বার্বারিজম)। এরও তিনটি উপপর্যায় : (ক) নিম্ন, (খ) মধ্য এবং (গ) উচ্চ। বন্যস্তরের উচ্চ পর্যায়ের শেষ আমল থেকেই বর্বরস্তরের নিম্ন পর্যায়ের শুরু। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান পোড়ামাটির বাসন-কোসন তৈরি করতে পারা। তখন মানুষ মোটামুটি ছাউনিওলা

বাসস্থানও তৈরি করতে পারত, বড় জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরি তাঁবুও তৈরি করতে পারে তখনকার মানুষ। গাছের গুঁড়িকে আশ্রয় করে নদীর জলে ভেসে সে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাড়ি জমাতেও শিখেছে। সুনির্দিষ্ট ধর্মধারা-তথা-কাল্‌টও গড়ে উঠেছে এই পর্বে। মানুষ তখন গোষ্ঠী পরিচালনাও করতে শিখেছে কিছু নিয়ম কানুনের বেড়াজালে। পশুচারণ ও পশুপালনও শুরু হয়েছে বর্বর পর্যায়ের নিম্ন উপ-পর্যায়ের শেষ দিকে। ততদিনে মানুষ ধাতু গলাতেও শিখেছে।

বর্বর অবস্থার মধ্য পর্যায়ে পশুপালন এবং পশুচারণ ছিল মানুষের অন্যতম মুখ্য জীবিকা। জীবিকা নিশ্চিত হওয়ায় সে কিছু অবসরও পেল, এবং এই অবসরের সদ্ব্যবহার করতে গিয়েই সে বহু প্রকার শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করতে শুরু করল। এই শিল্পচর্চা ধর্মের গণ্ডি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে না পারলেও, ধর্মবিশ্বাস এবং জীবিকা পরোক্ষভাবে প্রতিভাসিত হতে লাগল মানুষের শিল্পে, সাহিত্যে সেই প্রথম।

বর্বর পর্যায়ের উচ্চস্তরে মানুষের সামাজিক জীবনে যাযাবরত্ব স্থায়ীভাবে ঘুচল। পশুচারণ ও পালনের সূত্রে দীর্ঘদিন একজায়গায় থাকার ফলে কিছু ফসল ফলানো অভিজ্ঞতাও সে আয়ত্ত করতে পারে। ফলে খাদ্যশস্যের আবাদ, কৃষির আবিষ্কার ও ব্যাপ্তি তাকে এনে দেয় স্থায়ী ঠিকানা ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নত স্তর।

কৃষির আবিষ্কার মানুষের জীবনে এক যুগক্রান্তি ঘটায়। নদীর নিকটবর্তী স্থানে স্থায়ী জনপদের পত্তনি ঘটেছে কৃষির স্বার্থেই। অধিকাংশ মানুষেরই যাযাবরত্ব পুরোপুরিভাবে ঘুচে যায় কৃষির অনুষঙ্গ হিসেবে। এছাড়া মানুষের ধর্মবিশ্বাস, দেবতা-কল্পনা, সামাজিক বিধি-বিধান। রীতি সংস্কার, সবকিছুর ওপরেই একটা পরিবর্তিত অভিক্ষেপ পড়ে কৃষির আবিষ্কারের পর। তার মুখের ভাষাও চিহ্ন-সংকেতের মধ্যমে রূপায়িত হতে শুরু করেছে এই সময়, জানপদ-সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান এই লিপির আবিষ্কার।

এখানে অবশ্য একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, মুখ্য দুটি পর্যায়ের অন্তর্গত তিনটি করে উপ-পর্যায় হিসেবে যা নির্দিষ্ট করেছেন মর্গ্যান, সেগুলির প্রতিটির মধ্যেই আবার উদ্বর্তনের অনেকগুলি করে সিঁড়ির ধাপ রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিজস্ব সময়-লক্ষণ আছে। প্রতিটি ধাপেই পূর্ববর্তী ধাপের কিছুটা অবশেষ থেকে যায় এবং পরবর্তী ধাপেরও আভাস একটু-একটু করে ফুটে ওঠে। তাই ঠিক কোন্ মুহূর্তে একটি উপ-পর্যায়ের একটি ধাপ অতিক্রান্ত হল, আর নতুন সিঁড়িতে ঘটল মানুষের পদক্ষেপ, তা কখনও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। মর্গ্যান সুদীর্ঘকাল উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া আদিবাসীদের সেনেকা নামে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে-মিশে, আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার বিবর্তনের একটি 'প্রায়-গাণিতিক' নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর বিহিত ঐ নিয়মের যাথার্থ্য যাচাই হয়ে গেছে।

ইরোকোয়াদের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক বন্ধনের সূত্রে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর জীবনচর্যা সম্পর্কে মর্গ্যানের যে-অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার সঙ্গে প্রাচীন গ্রিকো-রোমক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে সুগভীর প্রজ্ঞা ছিল—সেটির সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক বিচার করে তিনি কতকগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। মানুষের জীবনচর্যায় অসমান অগ্রগমনের যে-প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে তারই ব্যাখ্যান করতে গিয়ে তিনি দেখালেন যে, বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ উদ্বর্তনের সিঁড়িতে পৃথক পৃথক সোপানে অটকে গেছেন আর্থ-পারিবেশিক কারণে। যাঁরা

সভ্যতার সৌধশীর্ষে পৌঁছেছেন, তাঁরা এক-এক করে ঐ সমস্ত ধাপগুলি কিন্তু পেরিয়ে এসেছেন। যাঁরা আটকে আছেন, তাঁদের তাহলে কার কোথায় অবস্থিতি ?

মর্গ্যান দেখালেন যে, "উত্তর-মধ্য আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেখানে একদা মায়া, আজটেক, টোলটেক, ইন্‌কা প্রভৃতি উন্নত নাগরিক সভ্যতার পত্তন হয়েছিল—এখন যে আদিবাসীরা থাকেন (অর্থাৎ মর্গ্যানের সময়ে থাকতেন)—তাঁরা হলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। পশুপালন এবং প্রাথমিক ধরণের কৃষি এঁদের আয়ত্ত, কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে এঁরা পেছিয়ে। কিন্তু এঁদের চেয়েও বেশি পেছিয়ে মিসৌরিতটবাসীরা। তাঁরা শুধু পোড়া মাটির বাসন তৈরি করতে শিখেছেন, আর জানেন তির-ধনুকের ব্যবহার। এঁদের চেয়েও পিছিয়ে আছেন হাডসন উপসাগরীয়রা, তাঁরা শুধুমাত্র তির-ধনুক অবধিই এগোতে পেরেছেন। এঁদের চেয়েও পেছিয়ে কারা ?...মর্গ্যান দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া বা পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের সেই বর্গে ফেলা চলে। তার চেয়ে পিছনে ? মর্গ্যান দেখাননি।" [পূর্ববৎ, পৃ. ২৬-২৭] তবে সম্ভবত পূর্বে উল্লিখিত সিকিম-তিব্বত সীমান্তের 'আদিম গুহাবাসী' মানুষদের সেই বর্গে ফেলা যাবে, যদি তাদের হদিশ আবার কখনও মেলে।

১.৩ তবে মর্গ্যানের এই হিসেব মিলিয়ে আমরা যেমন এথেন্স বা রোমের নাগরিক সভ্যতার মানুষদের সভ্যতার স্তর হিসেব করতে পারি তেমনি তাদের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারে গ্রিক ও ইতালীয় নাগরিক মানুষ, আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান, পলিনেশিয়ান, বিভিন্ন গোষ্ঠীর রেড ইন্ডিয়ান, কিংবা সিকিম সীমান্তবাসী, ওঙ্গে, গির অরণ্যের চোলানাইক্কার, রিয়াং, সাঁওতাল ও বিভিন্ন কৌমজনেরা সভ্যতার স্তরের বিন্যাসে কে কোথায় আটকে আছে দেখাতে পারি। শুধু এঁরাই নয়, আমাদের বিচারে যাঁরা এখন 'সভ্যতার চূড়াশীর্ষে' তাঁদের সকলের সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। নাগরিক পর্যায়ে পৌঁছনোর আগের কতকগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তর সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে আমাদের নির্ভর করতে হবে এঙ্গেলস্-এর 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট', (১৮৮৪) বইয়ের ওপর এবং গর্ডন চাইল্ড-এর 'ম্যান মেক্‌স হিমসেল্‌ফ' (১৯৪৮), 'হোয়াট হ্যাপেন্‌ড ইন হিস্ট্রি' (১৯৪২), 'সোস্যাল এভোল্যুশন' (১৯৫০) প্রভৃতি বইয়ের ওপর। ই. এইচ. কার তাঁর 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' (১৯৬১) গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন।

লোকায়ত, নাগরিক এবং ধ্রুবপদী স্তরগুলি মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং একে অপরের ওপর যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিভাসও বিস্তৃত করে থাকে। কৃষির ব্যাপক প্রচারের সূত্রে সভ্যতার যে-অরুণোদয়ের কথা বলা হয়, গর্ডন-চাইল্ড-এর মতে তা হল 'কৃষি বিপ্লব' বা অ্যাগ্রিকালচারাল রেভোল্যুশন। আদিম কৌমস্তর থেকে আদিবাসী কৌমস্তরে উত্তরণ ঘটে মানুষের, এই পর্যায়ে এসে। মানুষের জানপদ জীবনের শুরু থেকে সমাজ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পালাবদল শুরু হয়েছিল, কৃষিবিপ্লবের পর তার চরিত্রের বাহিরঙ্গিক পরিবর্তন খুব প্রকট হয়ে উঠল। এঙ্গেলস্-এর 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট' (১৯৮৪) বইতে পাই কৃষির সূত্রে ব্যক্তিগত সম্পদের ধারণা কিভাবে উদ্ধৃত হল তার দীর্ঘ ইতিহাস এবং সেই সূত্রে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে যে বিচিত্র সূক্ষ্ম-জটিল সব টানা-পোড়েনের সৃষ্টি করেছিল তার কথা। ছোট-ছোট দ্বীপকল্প-গোষ্ঠীগুলি ক্রমে বিবর্তিত হয়ে গেল ক্ল্যান, ফ্রাত্রি, ট্রাইব ইত্যাদি বৃহত্তর সামাজিক এককে। এইসব ট্রাইব-দের থেকে জন্ম হল ছোটখাট জাতি গোষ্ঠীর যারা ক্রমে নগর সভ্যতা পত্তনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। এমনই কয়েকটি প্রাচীন নগর রাষ্ট্র হল যথাক্রমে ১. মেসোপটেমিয়া ও

মিশরের সভ্যতা (খ্রিঃ পূঃ ৮০০০ ও ৭০০০ বছর আগে), ২. সিন্ধু সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৫০০০-৫৫০০ বছর আগে ; মেহেরগড় অঞ্চলের প্র-নিদর্শ বিচার করলে আরো হাজার দুই বছর আগে), চিন সভ্যতা (খ্রিঃ পূঃ ৪০০০-৩৫০০ বছর আগে) এবং গ্রিস ও রোমের সভ্যতা (আনুঃ খ্রি. পূ. ৩০০০-২৫০০ বছর আগে)। এইভাবে ছোট ছোট জনপদ থেকে ক্রমে গ্রামে ও পরে নগরে নতুনতর অর্থনৈতিক সংগঠনের সূত্রে সভ্যতার বিবর্তন হল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হল। এই শ্রেণীকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোর অনুষঙ্গেই তৈরি হল নেশন বা জাতি।

গর্ডন-চাইল্ড-এর বিভিন্ন লেখার সূত্রে আমরা একটি ধারণায় সুস্পষ্টভাবে পৌঁছতে পারি, তা হল, আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির পার্থক্য কোথায়। জনপদবাসীরা প্রাথমিক পর্বে আদিবাসী কোমে পরিণত হয়েছিলেন যখন এবং পরবর্তীকালে গ্রাম-শহরে পার্থক্য যখন ঘটল, তখন আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলিকে সহজে গ্রহণ করতে পারলেন—তাঁরাই শুরু করলেন লোকায়ত স্তর (অর্থাৎ ফোক-লেভেল)-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা। আদিবাসী সংস্কৃতি খুবই রক্ষণশীল হওয়ায় চট করে তাঁরা অন্য সংস্কৃতির বিশেষত উন্নততর সংস্কৃতি ভাব ও রূপ গ্রহণ করতে পারে না। অপর পক্ষে লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই শ্রেণীগত আদান-প্রদান খুব বেশি চলে। নাগরিক সংস্কৃতির বা গর্ডন চাইল্ড-এর ভাষায় 'আরবান রেভোল্যুশন'-এর সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ভাববিনিময় তাই খুবই সহজ ব্যাপার এবং সর্বদাই এই আদান-প্রদান ঘটে থাকে। নাগরিক সংস্কৃতিক সমান্তরাল ধারার যে ধ্রুবপদী সংস্কৃতি (মধ্যযুগে যার বিকাশ) তার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। ধ্রুবপদী সংস্কৃতির মূল উপজীব্য যে মিথোলজি বা পুরাণবৃত্ত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তা লৌকিক অনুষঙ্গেও স্বাভাবিকভাবেই বজায় থেকেছে। তারই অনিবার্য পরিণাম হল জনসংস্কৃতি এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় নাগরিক জীবনের পরিপেক্ষিতে যার বিবর্তিত রূপ পাই গণসংস্কৃতিতে পপ্‌লোরে।

গর্ডন-চাইল্ড এই 'কালচারাল কনটিন্যুয়াম'-এর অর্থনৈতিক কাঠামোকে বলেছেন 'ইনডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন'। যার মূলকথা হল, পরশ্রমভোগী সুবিধাভোগী শ্রেণী যবে থেকে সমাজে গড়ে উঠেছে, তবে থেকেই সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজের ওপরতলাটি ঐ পরশ্রমভোগী সুবিধাভোগী মানুষেরই অধিকারে চলে যায় আর নীচে পড়ে থাকে আদিবাসী, জনপদবাসী, খেটে-খাওয়া অধিজাতিরা। এঁরা সারা পৃথিবী জুড়েই সমান দুশখবহ অবস্থানে রয়েছেন ; যেমন, রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসী, আদি-অস্ট্রেলীয়, আফ্রিকার অরণ্য জনপদবাসী, ওঙ্গোরা, চোলানাইক্কাররা ইত্যাদি।

১.৪ এই দুই তলার মানুষদের মধ্যেও চলে সংস্কৃতির অবিরাম যাওয়া আসা, দেওয়া নেওয়া। ওপরতলার পরিশীলিত সংস্কৃতির ছাপ পড়ে লোকায়ত ধারার ওপর, যেখান থেকে ঐ ওপরতলার অবসরে জারিত সংস্কৃতির সৃষ্টি। আবার লোকায়ত সংস্কৃতিও উন্নততর সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা তাদের মত করে তাদের সংস্কৃতিতে গ্রহণ বর্জন করেন। এইভাবেই সংস্কৃতির সজীব সত্তা বহমান থাকে। মর্গ্যান ও গর্ডন-চাইল্ড-এর তত্ত্বের সাহায্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের এই চিত্রটিই আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়।

এই আলোচনার শেষে আমরা এটুকু বলতে পারি যে এই মর্গ্যানীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ নির্বিবাদে পণ্ডিতমহলে গৃহীত হয়নি। পরবর্তীকালের গবেষণালব্ধ অনেক সত্য এই তত্ত্বের বিরুদ্ধতা করে। কিন্তু এত সত্ত্বেও মর্গ্যানের

যে মূল প্রতিপাদ্য—সভ্যতা সংস্কৃতির স্তরান্বিত ক্রমবিবর্তন, সেটির ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটে না। বরং মর্গ্যানের ঐ স্তর-নির্দেশের সূত্রেই উত্তরকালের অন্যান্য তথ্যের সত্যতা বিচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যেমন 'বন্যতা' (স্যাভেজারি) এবং 'বর্বরতা' (বার্বারিজ্‌ম) শব্দদুটি নিঃসন্দেহেই আপত্তিকর। যদিও তাঁর সমকালে ওই শব্দগুলির মধ্যে কেউ কোনও গ্লানির সংকেত খুঁজে পেতেন না। এছাড়াও মর্গ্যানের যুগবিভাগেও মাঝে-মাঝেই অস্বস্তিকর ফাঁক পাওয়া যায়। হাতিয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি পাথরের তৈরি কুঠার, ছুরি, বল্লম, চাঁছনি প্রভৃতির উল্লেখ সেভাবে করেননি। যদিও সংস্কৃতির অগ্রগতির বিচারে এগুলি বিশেষভাবেই আলোচিত হওয়া উচিত। মর্গ্যানের সময়ই এসব নিয়ে কিছু কিছু বিচার-অন্বেষণও শুরু হয়েছিল।

মর্গ্যানের তত্ত্বের আরও একটি প্রশ্নসাপেক্ষতা ওঠে লোহার ব্যবহার, কৃষির পত্তন, বর্ণমালার উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে একটি বিশ্বজনীন সূত্র বিহিত করার ব্যাপারে। নীচে ঐ 'ফরমূলা'টি আগে লিপিবদ্ধ করলাম—

নিম্ন পর্যায়ের বন্যতার স্তর	ভাষার উদ্ভব, ফলমূল সংগ্রহ ও মৃতপ্রাণীর মাংস খাওয়ার মাধ্যমে জীবনধারণ
মধ্যপর্যায়ের বন্যতার স্তর	মাছধরা ও আগুনের ব্যবহার, পাথরের অস্ত্র নির্মাণ
উচ্চ পর্যায়ের বন্যতার স্তর	তির-ধনুকের ব্যবহার
নিম্ন পর্যায়ের বর্বরতার স্তর	পোড়ামাটির তৈজসপত্র নির্মাণ
মধ্যপর্যায়ের বর্বরতার স্তর	পশুপালন এবং যাযাবর জীবনের অবসান
উচ্চ পর্যায়ের বর্বরতার স্তর	লোহার ব্যবহার, দীর্ঘস্থায়ী আবাদ শুরু
সভ্যতার স্তর	অক্ষর ও বর্ণমালার উৎপত্তি

এখন উক্ত ছকের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, হাওয়াই দ্বীপের বাসিন্দারা জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ ভিত্তিক সমাজের (মর্গ্যান-কথিত) একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছনোর আগেই কৃষির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে (যা অন্যত্র ঘটেনি), কিংবা হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর সংস্কৃতি-ধারকরা লোহা ঢালাই করতে শেখার আগেই রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করতে সক্ষম হয়েছেন, ইন্‌কারা সুসভ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পরও ধ্বনিনির্ভর অক্ষরমালা সৃষ্টি না করে (বা, না করতে পেরে) রঙিন সূতোর 'কুইপু' সংকেতের মাধ্যমে ভাব-বিনিময় করতেন। এসব ছাড়াও মর্গ্যানের তত্ত্বের একটি বড় দুর্বলতা হল, যে ছ-টি প্রাক্ সভ্য স্তরের বিভাজন তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিরই অনেক উপস্তর ছিল এবং আছে, যা তিনি দেখান নি।

এছাড়াও আধুনিক গবেষণায় আমরা জানতে পারি, প্রধানত, জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক নামগুলি (যেমন মামা-কাকা, জ্যেঠা-খুড়ো, মাসি-পিসি, জা-ননদ, মেসো-পিসে, ভাইপো-ভাগ্নে ইত্যাদি) বিভিন্ন সমাজে নানাভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা, গোষ্ঠীবিবাহ ব্যাপারটির ক্রমবিলয় ঘটা সমাজের অগ্রগতির সূচক কিনা, মাতৃপ্রাধান্য থেকে

পিতৃপ্রাধান্যে বিবর্তন অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল কিনা, এইসব সামাজিক নৃতত্ত্বকেন্দ্রিক প্রশ্নগুলি, যার অনুসূত্রে মর্গ্যানের কোনও কোনও বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ অবশ্যই পুনর্বিবেচ্য।

কিন্তু এত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও মর্গ্যানের তত্ত্বের প্রধান প্রতীতিটিকে অস্বীকার করতে পারা যায় না যে, অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ ঘটে। বস্তুমুখিন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের এই বিবর্তনকে চিহ্নিত করার মধ্যেই তাঁর তত্ত্বের মহত্তম মূল্য নিহিত রয়েছে।

মর্গ্যানের বিরোধিতার দুটি প্রচ্ছন্ন উপলক্ষ হল, (১) নিজে সমাজতন্ত্রী না হয়ে, ববং উদার মানবতাবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত মর্গ্যান দ্বারা তুলনামূলক সমাজ-বিশ্লেষণের ভিত্তির ওপরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুবিশাল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মর্গ্যান সম্বন্ধে প্রতিকূল ও অসহিষ্ণু করে তোলে।

(২) এই পন্ডিতদের মধ্যে অনেকেই আছেন উচ্চমন্যতার দ্বারা কবলিত। যাঁরা বিভিন্ন দেশের আদিবাসী অধিজাতিগুলির প্রতি এক তাচ্ছিল্যের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং তাঁদের ট্র্যাডিশনকে 'লিট্‌ল ট্র্যাডিশন' আখ্যা দিয়ে, পশ্চিমী এথ্‌নোলজিস্টদের অতিপ্রিয় 'গ্রেট ট্র্যাডিশন' যা তাঁদের একচেটিয়া সম্পদ এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। এই থিয়োরিতে মর্গ্যান-এর তত্ত্বকে দাঁড় করানোই যায় না। ফলে সর্বমানবের মৌলিক সাম্যের কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে, যা তাঁদের স্বার্থবিরোধী।

তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও মর্গ্যানের তত্ত্বকে বিবর্তনবাদের প্রাথমিক তত্ত্বরূপে ধরে, পরবর্তীকালের গবেষকদের মত বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা সংস্কৃতি বিকাশের একটি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞান নির্ভর ধারাক্রম খুঁজে পেতে পারি। সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব যে কী এবং কতটা, সে সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিবাহপ্রথা, নারীর প্রাধান্য, যৌনবিধানের বিবর্তন, জ্ঞাতিত্ববাচক সম্পর্কের বিকাশ এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্তির নিয়ম প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তাঁর প্রাথমিক পর্বের কাজগুলিই পরবর্তী গবেষকদের নতুনতর তথ্যের সন্ধানে প্রণোদিত করেছে। সংস্কৃতির পরিভ্রমণ (মাইগ্রেশান) এবং সংমিশ্রণ (ডিফিউস্যন) ইত্যাদি তত্ত্ব পরবর্তীকালে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলেও, মর্গ্যান-নির্দেশিত বিবর্তনের তত্ত্ব পরবর্তীকালে কোনও পন্ডিতই (এমন কী ফ্রানৎস বোয়াস কিংবা র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনও) সম্পূর্ণ নাকচ করে দিতে পারেননি। [পূর্ববৎ ; পৃ. ২৪]

২.২ ❐ লোকসংস্কৃতি : গণসংস্কৃতি : জনসংস্কৃতি : পপ্‌লোর

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান পাঠের সূচনাতেই যে প্রশ্নটি প্রথম মনে আসে, তা হল 'লোক' কে বা কারা? যখন একটি সমাজের কিছু মানুষ একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বা অরাজনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় জীবনের কিছু রীতিনীতির দিক দিয়ে একটা সংহত রূপ ধারণ করে, তখনই তাকে বলে লোক। এই সংহত মানুষের সংস্কৃতিই হল 'লোকসংস্কৃতি'। লোকসংস্কৃতি মার্গীয় সংস্কৃতি ও আদিম সমাজের সংস্কৃতি থেকে পৃথক। ব্যাপক

অর্থে মনুষ্যসমাজের সামাজিক সামগ্রিক ক্রমানুবর্তনই সংস্কৃতিরূপে অভিহিত হয়। "মার্ক্সীয় বিচারপদ্ধতি অনুসারে 'সংস্কৃতি' হল মানুষের সচেতন অস্তিত্বময় অবস্থানের বহিঃসৌধ (অর্থাৎ, সুপার-স্ট্রাকচার)। উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক অবস্থান এবং প্রতি-অবস্থান সৃষ্টি করে সমাজের অন্তঃসৌধ (বা, ডীপ-স্ট্রাকচার) ; তার ওপর ব্যবহারিক প্রয়োজনের গুরুত্ব-অনুযায়ী তৈরী হয় শিল্পকলা, সাহিত্য, আচার-সংস্কার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেবকল্পনা, ধর্মপ্রত্যয়, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মূল্যবোধ ইত্যাদি। আর এই সমস্তকিছুর সমন্বিত ফলশ্রুতিই হল সংস্কৃতি।" ('লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', কলকাতা ; ২০০৪ ; পৃ. – পল্লব সেনগুপ্ত)।

সাধারণত গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ সংহত লোকসমাজের সামগিক জীবনচর্যার বিশিষ্ট রূপ লোকসংস্কৃতিতে অভিব্যক্ত হয়। তাদের সৃষ্টিশীলতার মধ্যে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধিতে থাকবে পরম্পরাগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ব্যক্তির অনুভব সমগ্র গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয়।

এই মতটি হল লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও সীমানা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানে 'লোক' কাদের বলা হবে সে ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের সীমানাও হয়েছে অনেক বিস্তৃত। বর্তমানে ফোকলোরিষ্টদের বা লোকসংস্কৃতিবিদগণের মতে 'ফোক'-এর উনিশশতকীয় ধারণা ভ্রান্ত। তাঁরা তাই 'ফোক'-এর একটি নতুন সংজ্ঞা প্রচার করলেন, যে শুধু গ্রামীণ কৃষিসমাজ নয়, যে কোন জনগোষ্ঠী, তারা যে কোন বর্গের বা যে কোন স্তরের হোক, যখন একটি পরম্পরার নির্ভরতায় সংঘবদ্ধ, তখনই তাঁরা 'ফোক'। এই গোষ্ঠী জাতি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, হতে পারে নাগরিক, শহুরে, গ্রামীণ, হতে পারে কৃষক, শ্রমিক, হতে পারে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, হিন্দু মুসলমান, খ্রিস্টান, ইত্যাদি। এখানে কোন শহর গ্রামের দ্বন্দ্ব নেই। গ্রাম শহর নির্বিশেষে যে কোন স্থানেই তৈরি হতে পারে ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি। 'লোক' বা 'ফোক'-এর পরিচয় তাই কোন পেশাগত, জাতিগত, ধর্মীয় ইত্যাদি গোষ্ঠীবদ্ধতায় ও নির্দিষ্ট পরম্পরায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। ['লোক-এর বিভাজন' : সৌমেন সেন ; 'লোকশ্রুতি' ২০, জুন ২০০২ : পৃ. ১-১১ দ্রষ্টব্য]

'সংস্কৃতি' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি নানা প্রয়োগমূলক কলা যেমন নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রকলা ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সংস্কৃতি' কি তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে সংস্কৃতি কি, তা আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সংস্কৃতি শব্দটি বাংলা ভাষায়ও খুব প্রাচীন নয়। সংস্কৃতি বা কালচার ও পরম্পরা বা ট্র্যাডিশন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণাগুলি তৈরি হয় আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা ও বিশ্লেষণের সূত্রেই। প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলায় আনেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ইংরেজি 'কালচার' শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ রূপে সংস্কৃতি শব্দটি বাংলায় নিয়ে আসেন। পরে ক্ষিতিমোহন সেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি জোরদার করেন। 'কালচার' অর্থে তখনকার ধারণায় বোঝানো হত সভ্যতা, ভব্যতা, ভদ্রতা, উৎকর্ষ তথা পরিমার্জিত চিত্তবৃত্তি যার প্রকাশ সাহিত্যে ও শিল্পে। 'কৃষ্টি' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল কৃষ্টির ক্ষেত্র কেবল চাষবাসে বা আপিসে কারখানায়। আর 'সংস্কৃতি' হল ভদ্রজনের কালচার।

পাশ্চাত্যে কালচারের প্রথম সংজ্ঞা পাই ই. বি. টাইলরের 'প্রিমিটিভ কালচার' (১৮৭৪) গ্রন্থে :

'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society'.

২.২ এই সংজ্ঞা অবশ্য আধুনিককালে সার্বজনীনের সংস্কৃতির সংজ্ঞা রূপে স্বীকৃত নয়। কেবল নৃতাত্ত্বিক ও আদিম সামাজিক মানুষের সংস্কৃতির সংজ্ঞা হিসেবেই চিহ্নিত। বর্তমানে আদিম মানুষের সংস্কৃতি হল 'আদিবাসী সংস্কৃতি' বা ট্রাইবাল কালচার, আর অ-নাগরিকজনের গ্রামীণ সংস্কৃতির নাম 'লোকসংস্কৃতি' বা 'ফোকলোর'। এই বর্গীকরণ ঘটেছে সংস্কৃতির আধুনিক বিশ্লেষণের তাগিদে।

সংস্কৃতির ধারণা নিয়ে এই টানাপোড়েন আমাদের দেশে ঘটেনি। ঘটেছে পাশ্চাত্যে। আধুনিকতার জন্মও সেখানেই। তাই সেই আধুকিতার সূত্রেই কালচার সম্পর্কে যে ধারণায় আমরা অভ্যস্ত, তাকেই বলেছি সংস্কৃতি। অন্যদিকে যে কালচারকে পাশ্চাত্যে অপরিশীলিত বলে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তাকেই আমরা বলেছি কৃষ্টি। কাজেই এ কথা স্বীকার্য যে, 'সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যে সব ধারণায় অভ্যস্ত, তা কালচার-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ শতাধিক বছরে কালচারের যে শতাধিক সংজ্ঞা আমরা পাই, তার ভিত্তিতেই আমাদের সংস্কৃতি -আলোচনা নিজস্ব পক্ষাতে। এবং পাশ্চাত্যে, আধুনিক বিশ্লেষণে যে ছাঁচ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আমরা তাই মেনে নিয়েছি। এখনো মানছি, না মেনে উপায় নেই, নানা কারণেই। অস্বীকার করার উপায় নেই, মননশীলতায় আমরা অধমর্ণ। এই সংবাদও তো অস্বীকার করা যাবে না যে আমরা 'আধুনিক' হয়েছি পশ্চিমের ছাঁচেই' ('লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য' : সৌমেন সেন, কলকাতা ; ২০০৪ দ্রষ্টব্য)

ভারতবর্ষে আমরা সংস্কৃতির বহুধা স্রোতের উল্লেখে অভ্যস্ত, এই নানা ধারার উল্লেখ শুধু আঞ্চলিক ভেদাভেদের নিরিখেই হয় না, সামাজিক বিভাজনও মানা হয়। 'মার্গী' ও 'দেশি' স্রোতের কথা তো এভাবেই ওঠে। এই বিভিন্নতার কথা বলা হয় পাশ্চাত্যের কালচারের ধারণা প্রসঙ্গেও। মনে রাখতে হবে, কালচার, ট্রাইবাল কালচার ও ফোকলোর-এর ত্রিমুখী ধারার বিশ্লেষণ পাশ্চাত্যেই প্রথম হয়, আমরা শুধু প্রতিশব্দ তৈরি করেছি। এ খবর তো সত্যি যে আদিবাসী সংকৃতি ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিকতার প্রয়োজনের একটি যোগ আছে, তা অবশ্যই মানবিক ও প্রাকৃতিক কিন্তু সংস্কৃতি অবস্থান করে এই প্রয়োজনের অস্বীকারে এক স্বতন্ত্র শিল্পবোধ-এ। হাটে মাঠে চাষে বাসে শিল্প তৈরি হয় না ; হেঁটুরে, মেঠো, চাষাড়ে অভিধায় যা চিহ্নিত হয় তা সংস্কৃতি নয়। যাঁরা দ্বিতীয় সত্তার কথা ভাবেন তাঁরা প্রথমটিকে সংস্কৃতি বলে মান্য করেন না। সে সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের মনোযোগ ঐতিহ্যের রোমঞ্চে। আমাদের সংস্কৃতি ও তাদের সংস্কৃতি এই বোধটি সহজে যাবার নয়। অথচ ট্র্যাডিশ্যন বা ঐতিহ্যকে যদি সাংস্কৃতিক পরম্পরা হিসেবে দেখি তাহলে প্রতিটি অঞ্চলের জাতির, ভাষাভাষীর সংস্কৃতি মূলত একটিই। ভেদাভেদ হতে পারে আঞ্চলিক, জাতিগত, ভাষাগত, বিভিন্নতায়। বাঙালি, সাঁওতাল, অসমিয়া, খাসি, নাগা, ইত্যাদি সংস্কৃতি চেনা যাবে তাঁদের আঞ্চলিক, জাতি-পরিচয় বা এথনোলজি ও ভাষার বৈশিষ্ট্যে। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁদের ট্র্যাডিশ্যান, যা ক্রমাবাহিত পরম্পরা। কোনো একটিকে প্রধান ও উন্নত, আর অন্য কোনো একটিকে গৌণ বা অনুন্নত, বলার স্পর্ধা না থাকাই ভালো।

প্রচলিত পশ্চিমি চিন্তাভাবনা অনুসারে (অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী-উন্নাসিকতার লব্ধফল হিসেবে) সংস্কৃতির

দুটি ধারা : 'গ্রেট' এবং 'লিটল' বা 'মুখ্য' এবং 'গৌণ'। এই বিচারে যাদের আমরা সমাজ ও ইতিহাসের প্রান্তে রাখতে চাই তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গৌণ বা 'উপ'। আর যা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত, তাই মুখ্য আসলে সংস্কৃতির এই বিভাজনে সামাজিক বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত। আর সামাজিক বিভাজন তো প্রতিপত্তি ও আধিপত্যের দাপটেই ঘটে থাকে। সংস্কৃতির উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, যেমন বৃহৎ-ক্ষুদ্র, শিষ্ট অশিষ্ট, অমার্জিত-মার্জিত, শালীন-অশালীন কিংবা মার্গী-দেশি, ইত্যাদি আধিপত্য ও প্রতিপত্তির যে বিশ্বজনীন মতামত, সেই অনুযায়ী সৃষ্ট হয়েছে। বাংলায় ট্র্যাডিশ্যানের প্রতিশব্দ ঐতিহ্য, যার গায়ে লেগে আছে প্রাচীনত্বের প্রলেপ। তাই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতির একটি বিরোধ থেকেই যায়।

২.৩ লোকসংস্কৃতি চর্চায় একসময় survival বা উদ্‌বর্তন ছিল খুব জরুরি একটি বিষয়। এই ধারণা অনুসারে 'আমাদের' পরিশীলিত শিষ্ট সংস্কৃতিতে মিশে থাকে কিছু প্রাচীন সংস্কৃতি-অভ্যাস, যা সুপ্ত কিছু ঐতিহ্যবাহী এবং লোকসংস্কৃতি মূলত সেই ঐতিহ্যই যা এখনো লোকসমাজের অন্তর্গত। Oral tradition বা মৌখিক ঐতিহ্য যেমন এই সমাজের আশ্রয় তেমনি ঐ ঐতিহ্যের আশ্রয় এই সমাজ/এমন ধারণাই নিয়ন্ত্রণ করে লোকসংস্কৃতি চর্চা আর এই ধারণতেই সংস্কৃতির নানা বিভাজন ও বিশ্লেষণ হয়।

ট্র্যাডিশ্যন তিনভাবে গৃহীত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে, উপাদান থেকে আর গোষ্ঠীর পরিচয় থেকে। এইভাবে গৃহীত ঐতিহ্য কখনও হয় মৃত, কিছু জীবিত, কিছু অসাড়, আর কিছু জীবিত ও সচল। এবং এই সমস্ত বিচার করি আমরা, তথাকথিত 'এলিট'রা। সংস্কৃতি ও পরম্পরার শ্রেণিবিন্যাস এভাবে ঘটলেও লোকসংস্কৃতি চর্চার অভিজ্ঞতায় সংস্কৃতি ও পরম্পরার ভিন্নতর বিশ্লেষণ সম্ভব। এই বিচার বিশ্লেষণ থেকে আবারও যে কথা উঠে আসছে, তা হল, লোকসমাজ নামে আলাদা কোন সমাজ নেই, সামাজিক শ্রেণিবিভাজনে আমরা উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, এলিট-বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া-প্রোলেতারিয়েৎ, ভূস্বামী-ভূমিদাস-বর্গাদার ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক বিভাজন করতে পারি, কিন্তু এদের একত্রে 'লোক' বলতে পারিনা। কিন্তু এরাই 'লোক'। 'লোক' একটি গোষ্ঠী, যারা জাতিগত, ধর্মগত বা পেশাগত যে কোন স্বতন্ত্র পরিচয়ে একটি পরম্পরার মধ্য দিয়ে চলে। যেমন বাংলার সংস্কৃতি বাংলার লোকসংস্কৃতি থেকে খুব দূরে নয়, তেমনি যখন আমরা অসমের বিহু দেখি তখন তাকে অসমিয়া সংস্কৃতিচিহ্ন বলে মানি আবার এ-ও জানি যে এই উৎসব-আচার কৃষিজীবীদের। তাই লোকসংস্কৃতি মূলত একটি পরম্পরাবাহিত সংস্কৃতি যার কোন নির্দিষ্ট বা গণ্ডীবদ্ধ বিষয় বা ক্ষেত্র নেই।

২.৩ ☐ লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের উৎসে লোকসংস্কৃতির উদ্ভবের ইতিহাস অনেক প্রাচীন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতায় তার অনুশীলন মনন-চর্চার ইতিহাসে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা এবং 'ফোকলোর' শব্দটি উদ্ভবের ইতিহাসও মোটে একশ ষাট বছরেও কম। মূলত পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধিৎসার মৌল উৎসে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত। ইতিহাস-সন্ধানী সমাজবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকের যত্নে ইতিহাসের সীমা যেমন ক্রমপ্রসারিত

হয়েছে সুদূর অতীতে, তেমন সমাজ অগ্রগতির পুরোভাগে দাঁড়িয়েও মননশীল মানুষ সংস্কৃতি অনুশীলনে হয়েছে প্রচীন অনিসন্ধিৎসু। প্রাচীন সংস্কৃতি অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় যে শাস্ত্রের উদ্ভব তা প্রথম 'পপুলার অ্যান্টিকুইটি' বা লোকায়ত পুরাতনী নামে ঘোষিত হয় এবং পরবর্তীকালে 'ফোকলোর' শব্দ দ্বারা সুচিহ্নিত হয়। লৌকিক ঐতিহ্য বা লোকায়ত প্রাচীনতার পরিবর্তে 'ফোকলোর' বা লোকসংস্কৃতি শব্দটি সর্বপ্রথম এথেনিয়ম'-এ প্রকাশিত একটি পত্রে উইলিয়ম টম্‌স, এমব্রস মেরটন ছদ্মনামে ব্যবহার করেন। 'ফোকলোর' অভিধা ১৮৬৪-তে খ্রিঃ দেওয়া হলেও এটি সম্ভবত ১৮০৬ থেকে প্রচলিত 'ভোক্‌সকুণ্ডে' (Volkskunde) এই জার্মান শব্দের অনুবাদ। মোট কথা, ফোকলোর শব্দটি উদ্ভবের পর থেকে অল্পাধিক রূপ বদল করে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গৃহীত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সংস্কৃতি-চর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ এবং ঐ সমস্ত উপাদান-উপকরণসমূহ অনুশীলনের পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। "Folklore—The spiritual tradition of the folk, particularly oral tradition, as well as the science which studies this tradition." [International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, vol I, 1960, page 135.] প্রথম সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ্ লিনিয়স (১৭০৭-১৭৭৮) এবং এরপর জর্মানির গ্রিম-ভ্রাতাদের প্রথম লোককথা সংকলনের প্রকাশলগ্ন [Kinder und Hausen Märchen, 1812] থেকেই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন অনুশীলন কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রমান্বয়ে তা মানবজাতিতত্ত্ব, আদিমধর্ম, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের পরিপেরিক্ষিতে লোক সংস্কৃতি চর্চার প্রথম সূত্রপাত হলেও, লোকসংস্কৃতি চর্চা প্রথম রূপ পায় রেনেসাঁসের যুগে অর্থাৎ এটি প্রধানত নবজাগরণের ফসল।

'এমব্রস মেরটন' এই ছদ্মনামে এথেনিয়ম (লন্ডন) পত্রিকায় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'ফোকলোর' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়ম জন টমস (১৮০৩-১৮৮৫)। শব্দটি চয়ন করে টমস লেখেন (১২আগাস্ট ১৮৪৬)

'Your pages have so often given evidence of the interst which you take in what we in England designate as popular Antiquities, or popular Literature (though by the bye it is more a lore than a literature; and would be most aptly described by a good Saxon compound Folk-lore,— the lore of the people .....remember I claim the honor of introducing the epithet Folk-lore'

৩.২ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পর 'ফোকলোর' শব্দটি সুদৃঢ় গতিময়তা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে 'ফোকলোর' শব্দটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য শব্দকে স্থানচ্যুত করে। বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ফোকলোর' শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অল্পাধিক রূপ বদল করে 'ফোকলোর' শব্দটি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সাধারণ রূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। ভারতীয় পন্ডিতগণ 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ নিয়ে দীর্ঘদিন নানান গবেষণা করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশ্নাতীতভাবে কোন শব্দই গৃহীত হয়নি। 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি অন্যান্য বিভিন্ন পরিভাষার তুলনায় কিছুটা বেশি স্বীকৃত এবং বর্তমানে এটিই সর্বত্র ব্যবহৃত।

ঐতিহ্য ক্ষেত্রবিশেষে ঐতিহাসিক ধারায় লোকসংস্কৃতির স্বরূপবিকাশে কার্যকর হলেও, আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের কেউ-কেউ লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী চরিত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন না। যেমন, ডন বেন আমোস তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন :

"....the traditional character of folklore is an analytical construct. It is a scholarly and not a cultural fact... Therefore, tradition should not be a criterian for the definition of folklre in its context... Some traditions are folklore, but not all folklore is traditional." [Don Ben Amous—Towards a Definition of Folklore Context /Journal of American Folklore, vol. 84, No. 331, January—March 1971, pp-13-14]

লোকসংস্কৃতির বিচারে প্রধানত তিনটি শর্ত পরিলক্ষিত হয়— যৌথ শ্রমপ্রক্রিয়া বা জীবনপ্রয়াস, সমবেত আবেগ বা সমষ্টিচেতনা এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা বা সামাজিক স্বীকৃতি। অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে লোকসংস্কৃতির স্বরূপলক্ষণ মূলত মানসিকতা, ক্রিয়া ও স্বীকৃতির ত্রিবিধ ধারায় উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। শ্রমের সমবেত প্রক্রিয়ায় মানবসমাজে যে-চিন্তা ও ভাষার উদ্ভব, মূলত সেই উৎসে জীবনপ্রয়াসের বাস্তব সৌধের (Structure)-উপরে যে সাংস্কৃতিক বহিঃসৌধের (Super-structure) বিকাশ, তারই এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি লোকসংস্কৃতি। সুতরাং, লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত মানুষের জীবনপ্রয়াসের সামগ্রিক কাজই লোকসংস্কৃতি।

২.৪ ❐ গণসংস্কৃতি : জনসংস্কৃতি : পপ্‌লোর

মুখবন্ধে এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি মূলত যে তত্ত্বটি বলার চেষ্টা করেছি তা হল, লোকসংস্কৃতির কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। নাগরিক সংস্কৃতি বা গ্রাম্য সংস্কৃতি বা উচ্চ সংস্কৃতি—এমন কোন বিভাজনও লোকসংস্কৃতির মধ্যে নেই বা উক্ত সংস্কৃতি বলে আলাদা কিছু হয় না। লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সবই লোকসংস্কৃতির একেকটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইদানিংকালে আমেরিকাসহ কয়েক উন্নত দেশে লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোরকে অস্বীকার করে তার স্থানে গণসংস্কৃতি বা পপলোর-এর ধারণা প্রচলনের একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। এই ধারণার প্রথম সূত্রপাত গবেষকদের কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে।

যেমন ধরা যাক, পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একজন গবেষক দেখলেন যে বর্তমানে বিভিন্ন Stage show -তে মহিলারাও ছৌ নাচছেন, বা মহিষাসুরমর্দিনীর পায়ে জুতো পরা : অমনি তিনি 'গেল' 'গেল' রব তুলে বললেন, নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবে এখানকার প্রকৃত লোকসংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অনেক প্রক্ষেপ দেখা যাচ্ছে, মেয়েরা ছৌ নাচছে যা একেবারে প্রথাবিরোধী, গ্রাম্য ওস্তাদরা এখন আর রক্ষণশীল থাকছে না, ছৌ-তে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে — ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অথবা,

আমেরিকার গবেষকরা দাবী করছেন যে তাঁদের ওখানে লোকসংস্কৃতি নেই। লোকসংস্কৃতির যে গ্রামীণ ঐতিহ্য বা মৌখিক পরম্পরা ও মৌখিক সাহিত্য তা তাঁদের দেশে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেখানে কৃষকরাও এখন অনেকে এক একজন ছোটখাট উদ্যোগপতি। আমেরিকার 'জনসমাজ' একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ঐতিহ্যের বাহক নন। তাই সেখাকার কৃষককুল উনিশ শতকীয় ধারার কৃষককুলও নন। আমেরিকার মানুষ সেখানকার আদিম বাসিন্দা নন, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সংস্কৃতি হল আসলে সেখানকার পপলোর। ইত্যাদি।

এই সমস্ত যুক্তির উত্তরে তাত্ত্বিক গবেষকগণ বললেন 'ফোক' এর উনিশ শতকীয় ধারণা ভ্রান্ত, আমেরিকায় অবশ্যই ফোকলোর আছে ও তৈরি হচ্ছে। তাঁরা তাই 'ফোক'-এর একটি নতুন সংজ্ঞা প্রচার করলেন, বললেন যে শুধু গ্রামীণ কৃষি সমাজ নয়, যে কোনো জনগোষ্ঠী, যে কোনো বর্গের, যে কোনো স্তরের, যখন একটি পরম্পরার নির্ভরতায় সংঘবদ্ধ, তখনই তাঁরা 'ফোক'। এই গোষ্ঠী হতে পারে যে কোন জাতি, বা পরিবার, বা নাগরিক, শহুরে, গ্রামীণ অথবা কৃষক, শ্রমিক, উকিল, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার শিক্ষক, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি। এখানে কোন গ্রাম-শহর বা জাত-পাত, ধর্ম-অধর্ম, বা পেশাগত দ্বন্দ্ব নেই।

বাংলায় 'ফোকলোর' ও 'পপ্‌লোর'-এর এই দ্বন্দ্বকে প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন ও আমেরিকার প্রেক্ষাপটে প্রথম পরিচিত করান ড. পল্লব সেনগুপ্ত। তাঁর মতে, ইতিহাসের একটি মৌলিক সত্য হল এই যে, "মানুষের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যতই বদ্‌লে বদ্‌লে যায়, ততই তার সামাজিক অভিব্যক্তিগুলিও পাল্টাতে থাকে। এটারই অভিক্ষেপ ঘটে মানুষের ব্যবহারিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে—ফলে সংস্কৃতির অনুষঙ্গেও প্রতীয়মান হয় একটা পালাবদল। কিন্তু বক্তব্য এটাই যে, ঐ পালাবদল নেহাৎই পোষাকী। লোকজীবনের শিকড়ে বহুকালীন যে ঐতিহ্য-চেতনা প্রাণরস সঞ্চার করে যায় নিরন্তরভাবে, তার অলক্ষ্য কিন্তু অপ্রতিরোধ্য সঞ্জীবনী শক্তি নাগরিক/পরিশীলিত কলাকৃষ্টিকেও পুষ্ট করে। সেই ঐতিহ্যকে আমরা কোনও সময়ই মন থেকে নির্মাঞ্ছিত করতে পারি না, পারি নি। মর্গ্যান, ফ্রেজার, টাইলর থেকে শুরু করে ম্যালিনৌস্কি, মিড, দুর্খহেইম, রেডফিল্ড, ব্যাসকম অবধি কোনও সমাজবিজ্ঞানীই এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন নি। সাম্প্রতিককালের চমস্কি কিংবা লেভি-স্ট্রোস বা আমাদের অমর্ত্য সেনও না। আমাদের দেশের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস যাঁরা আমাদের নিজস্ব মানস-পটভূমিতেই বিচার করেছেন—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কিংবা

দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী কি রামশরণ শর্মা বা রোমিলা থাপার বা ইরফান হাবিব—তাঁরাও না। পশ্চিমি পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের স্তরগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, সেই এ. এল ব্যাশমও এঁদের মূল সিদ্ধান্তেরই সমর্থক।" [লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ : ড: পল্লব সেনগুপ্ত : ২০০২]

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুযায়ী মানুষের জীবননির্বাহের প্রকরণ ধীরে ধীরে বদলায়। এর সঙ্গে তাল রেখে বদলায় সংস্কৃতির ব্যবহারিক, বাহিরঙ্গিক রূপ ; কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত মানস-পরিকাঠামোটি মোটামুটি অপরিবর্তিতই থাকে। যেমন— মানুষ যেকালে পশুশিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে দিন কাটাত, তখন তাদরে নাচ-গান-চিত্রকলা-ভাস্কর্য-দেবকল্পনা-মন্ত্র-আচার-সংস্কার-কাহিনি-বাসস্থান-তৈজস ইত্যাদি ছিল তখনকার অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করা। আবার যখন প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ঐ পশুপালনের যুগ থেকে আরেকটু উন্নততর যুগে উপনীত হল তখন এক নতুন অর্থনৈতিক পর্যায়ের সূচনা হল ও তখন ঐ সবকিছুতেই আবার নতুন ভাবনার প্রতিফলন ঘটল ও তাদের রূপ ও চরিত্র বদলে যেতে লাগল, যদিও মূল কাঠামো একই থাকল। কৃষির উদ্ভবের পর আরও নতুন আর্থ-সামজিক পরিপ্রেক্ষিতে আবার বদলে গেল বাইরের রূপটুকু, যদিও পূর্বতন প্রতীতির অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোই বজায় থাকল। এই বিবর্তনের ধারার রেখাচিত্র বহুকাল আগেই দেখিয়েছেন মর্গ্যান ও পরবর্তীকালে এঙ্গেলস। এই তত্ত্বের প্রচুর বিরোধিতা থাকলেও, অর্থনীতিই যে সমাজের মৌল পরিচালিকা শক্তি এটা ভাববাদী দার্শনিকেরা না মেনে নিলেও, এটি সমাজবিজ্ঞানে বর্তমানে স্বীকৃত সত্য, যদিও সংস্কৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী পণ্ডিতেরা তা মেনে নেন নি। ড. সেনগুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়েছেন, তা হল—

"একটা সময় ছিল যখন আদিম পিতামহরা পশু শিকার করে, নিহত প্রাণীর কিছুটা অংশ নিবেদন করতেন তাঁদের কল্পিত দেবতাদের তুষ্টির জন্য অর্ঘ্য হিশেবে। শিকারভিত্তিক অর্থনীতি যখন কৃষিভিত্তিক হয়ে উঠেছে। তখন বন্য প্রাণী শিকার করাটা অপ্রচলিত হয়েছে বটে, কিন্তু দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের ব্যাপারটা প্রচলিতই থেকেছে। শিকারের পরিবর্তে বলি হয়েছে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যম। মুরগির মুণ্ডু ছিঁড়ে নরবলি দিয়ে, পশুবলি দিয়ে—যেভাবে হোক না কেন, মূল প্রথাটা অপরিবর্তিত থেকেই গেল। আর এরই আধুনিক রূপান্তরণ, একটা জাহাজ ভাসানোর আগে, কিংবা কারখানায় একটা নতুন প্ল্যান্ট বসানোর প্রাক্কালে মদের বোতল বা নারকোল আছড়ে ভাঙা। বোতল বা নারকোল এখানে নরমুণ্ডের প্রতীক। সেতু বা বাঁধ বাঁধবার সময়ে নরবলি দিয়ে 'শুভ' সূচনা করার ঘটনা মধ্যযুগোত্তর পর্বেও অবিরল ছিল।" [পূর্ববৎ, পৃঃ ৩৭]

উক্ত মতটিকে একটি তালিকার সাহায্যে লিপিবদ্ধ করলে এমন একটি ছক তৈরি করা যায় যাতে আদিম সংস্কৃতি থেকে অধুনা পপুলার-এর মধ্যে লোকসংস্কৃতির যোগসূত্র বেরিয়ে আসে –

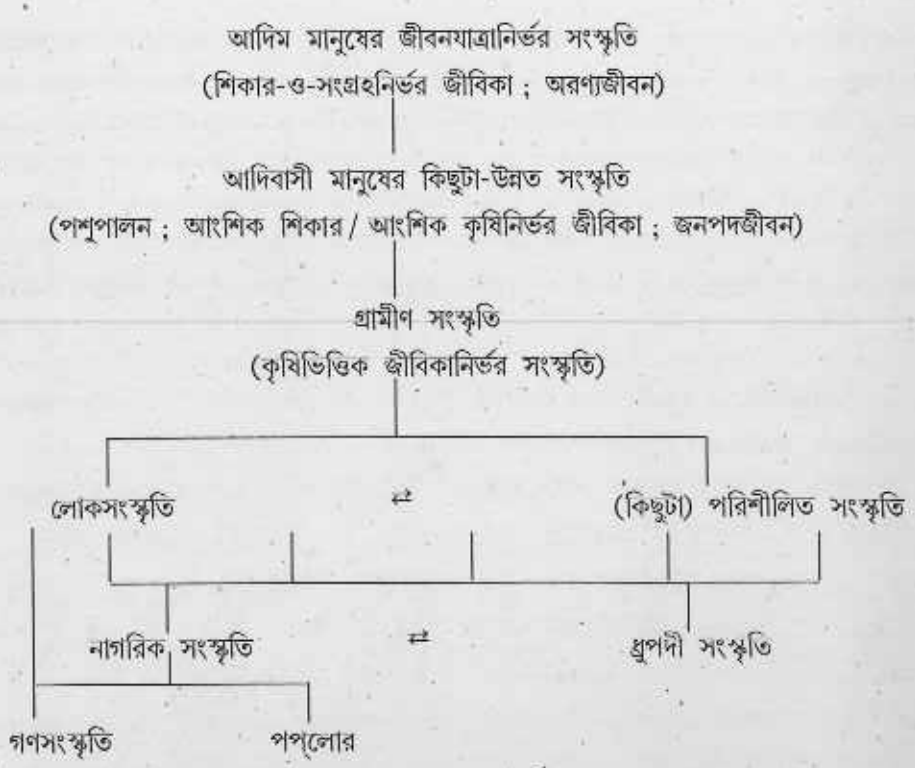

ডঃ সেনগুপ্ত তাঁর বইতে এই ছকটি সাজিয়েছেন। তাঁর মতে, এই ছক-অনুযায়ী লোকসংস্কৃতি কৃষ্টি-বিবর্তনের পথে কোন 'টার্মিনাস' নয়, বরং তাকে 'জংশন-স্টেশন' বলা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সামাজিক নানা দ্বান্দ্বিকতার কারণে সংস্কৃতির অনেক বিশ্লেষণী বর্গ বা রূপ (অ্যানালিটিক্যাল ক্যাটিগরি)-এর কথা বর্তমানে বলা হচ্ছে মূলত ইউরোপ ও আমেরিকায়। যথা—এলিটিস্ট কালচার, ম্যাসকালচার, ফোকলোর, আর্বান ফোকলোর, এথনিক ফোকলোর, ট্রাইব্যাল লোর, পপ্‌লোর, পপুলার কালচার, মোডিফায়েড ফোকলোর, অ্যাপ্লায়েড ফোকলোর, পাবলিক ফোকলোর ইত্যাদি। উক্ত ছকের মধ্যে আরো বিভিন্ন ভাগে ভাগে এইগুলিকে দেখানো যেতে পারে কিন্তু তাতে প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করলে কি তারা লোকসংস্কৃতির থেকে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে? যদিও এগুলি এখানে আলোচ্য নয়, তবু এই সমস্ত অধুনা নির্মিত তত্ত্বগুলিও গণসংস্কৃতি বা পপ্‌লোরের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত—তাই এদের উল্লেখ এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়।

আধুনিক আমেরিকান ফোকলোরিস্ট অ্যালান ডান্ডেস 'ফোক' ও 'ফোকলোর'-এর যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে ফোকলোরের সম্পর্কে এই ধারণাই ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে :

"If modern folklorists accepted the nineteenth century definition of the folk as illliterate, rural backward peasants, then the study of the lore of such folk might well be strictly a salvage operation and the discipline of folkloristics might in time follow the folk itself into oblivion.

Certainly it is conceivable that eventually all the peasants of the world will become urbanized or, at least, so much influenced by the urban centres as to lose their peasant qualities. The impact of the mass media has tended to encourage standardization of food, dress, language etc. But if we look at the question who are the folk? In a new light, we shall see that the folk are not dying out; that their are folk cultures alive and well in the united states, Canada and Europe; and that new folk cultures are bound to arise—the term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor....it could be a common occupation, language or religion–but what is important is that a group formed for whatever reason will have some traditions which it calls its own... With this flexible definition of folk, a group could be as large as nation or as small as a family. ("Who are the folk" : 'Interpreting Folklore'; Bloomington : Indiana University Press, 1980)

পপ্‌লোর-এর প্রবক্তা প্রধানত জেন্যে ব্রুস্টাইন। তিনি মানেন না যে আমেরিকায় ফোকলোর বলে কিছু আছে। তাঁর মতে, "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, 'ফোক' বলতে যদি সর্বস্তরের মানুষকে বোঝায় তাহলে সেটা ভালভাবেই সেখানে আছে বটে, কিন্তু যথা অর্থে 'ফোকলোর' সেখানে নেই, জনসাধারণের সংস্কৃতি সে দেশে যে বিমিশ্রিত এবং শিল্পায়ন-কেন্দ্রিক একটি নাগরিক চরিত্রের অধিকারী সেটা 'খাঁটি' এবং ঐতিহ্য পরম্পরিত কৃষি-অর্থনীতিজাত লোকসংস্কৃতির সমগোত্রীয় নয়। এই নতুন ধরণের সংস্কৃতিরই তিনি নামকরণ করেছেন 'পপ্‌লোর' হিসেবে (পল্লব সেনগুপ্ত : 'ফোকলোর থেকে পপ্‌লোর', লোকশ্রুতি ১৩, পৃ: ২০৭-২১৯)

এখানে ব্রুস্টাইন যে-'খাঁটি' লোকসংস্কৃতির 'অভাব' লক্ষ করে আমেরিকান ফোকলোর বলে কোন কিছুর অস্তিত্বকে মানতে চান না এবং 'জনসাধারণের সংস্কৃতি'-কে পপ্‌লোর অভিধায় ভূষিত করেন, সেই 'খাঁটি ফোকলোরের তত্ত্ব দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত। পরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবীতেই ফোকলোরের সংজ্ঞা যদিও পাল্টেছে, কিন্তু তবুও এই পপ্‌লোর বা গণসংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতির ধারণা আলাদা করে করে বার বার উঠে আসছে কেন ? তবে কি এই সমস্ত নতুন ধারাগুলি কোনও-না-কোনও ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র ? তাই কি উপরে প্রদত্ত ছকে লোকসংস্কৃতির থেকে একটু পরে অথচ একই ছত্রছায়ায় পপ্‌লোর ও গণসংস্কৃতির অবস্থান। এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রথমেই বুঝে নিতে হয় যে, যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রসঙ্গে এই বিচার, সে পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সম্যক্ পরিচয় নেই। আর আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশে পপ্‌লোর ধারণাটির সমান্তরালও সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে না। তাহলে পপ্‌লোর -এর স্থান কোথায় ? ডঃ সেনগুপ্তের মতে "মার্কিন লোকসমাজ এবং মার্কিন লোকজীবনের সংস্কৃতির মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার লব্ধফল হল 'পপ্‌লোর' কিংবা 'সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পরম্পরা' যে-সমস্ত দেশ বা জাতির সংস্কৃতির সৌধকে গড়ে তুলেছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই দ্বান্দ্বিকতার উদ্ভবের জন্য কোনও অবকাশ নেই। সে-সব ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি ও তার পরবর্তী পর্যায়, গণসংস্কৃতি (যাকে পপ্‌লোর-এর সঙ্গে পুরোপুরি না হলেও, খানিকটা অবধি তুলনা করা যায় হয়ত বা) যার-যার নিজের নিজের অবস্থানে সুস্থিত হয়ে আছে। কালের বিবর্তনে ঘটা আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে লোকসংস্কৃতির বহিরঙ্গিক কিছু রূপান্তর ঘটেই ; নাগরিক জীবনের শিল্পায়ন নির্ভর অর্থনীতির অভিক্ষেপ নতুন সাংস্কৃতিক স্তরটাকে ধীরে ধীরে তৈরি করে, সেখানে বিভিন্ন এলাকার, সমাজের, ভাষার, সংস্কৃতির মানুষেরা

একত্রে জড়ো হন বলে, ...। এই পর্যায়ের সংস্কৃতি বিন্যাস ওই কারণেই অংশত পপ্‌লোরধর্মী।' ["ফোকলোর থেকে পপ্‌লোর", পূর্ববৎ]

তাঁর মতে, নাগরিক জীবনের সামাজিক চরিত্র গ্রামীণ সমাজের চরিত্র থেকে অনেক কম রক্ষণশীল। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ সেখানে একত্র হন বলে, শহরের সংস্কৃতির মধ্যে একটা বহুজনীনতা থাকে। পক্ষান্তরে গ্রামীণ সংস্কৃতি তুলনায় অনেক বেশি একমাত্রিক এবং সীমায়ত। তাছাড়া, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যও শহুরে মানুষের বেশি থাকে, তাই নাগরিক জীবনের চমক, চটক আর মোহও প্রবলতর। গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর তাই চলচ্চিত্র, রেডিও, দূরদর্শন, সংবাদপত্রের খবর-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি থেকে নির্যাস করা নতুন এক মোহময়ী 'নাগরিক' সংস্কৃতির অভিক্ষেপ অপ্রতিরোধ্য ভাবেই পড়ে। যে জীবন গ্রামের (এবং শহরেরও) বিরাটসংখ্যক মানুষের অনায়ত্ত, তারই মোহ গ্রামের জীবন ও লোকসংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে চলেছে। কিন্তু এরজন্য গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা নষ্ট হচ্ছে না বা প্রভাবান্বিত হচ্ছে না। সেটি অন্তঃশীলা হয়েই থাকছে। এই গ্রামীণ নির্যাসেই গড়ে উঠছে শহুরে এবং তারও পরে ধ্রুবপদী সংস্কৃতি। যেমন—যেকোন শাস্ত্রীয় নৃত্যই লোকনৃত্য-এর বীজ থেকে সৃষ্ট। যেমন ধ্রুপদী সঙ্গীতের যে রাগ-রাগিনীর নাম বা তার চলন সবই গড়ে ওঠে কোনও না কোনও বিশেষ অঞ্চল বা গোষ্ঠীর লৌকিক সুররীতির পরিকাঠামোর ওপর। অপরপক্ষে, শহরের মানুষের বাগ্‌রীতির মধ্যেও থাকে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন; হাঁচি-টিকটিকির সংস্কারে তাঁরাও অনেকেই আবদ্ধ, পূজা, বিবাহ-অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আচারভিত্তিক অনুষ্ঠান শহুরে মানুষ আজও প্রভূত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। তাই এভাবে লোকসংস্কৃতির ভাবরেণুগুলি শহরের মানুষের মানসকে সর্বদাই রাঙিয়ে রাখে। ফারাক যা হয় তা নেহাতই বহিরঙ্গে। শহর ও গ্রামের কালচারলাল কনটিন্যুয়াম অনিবার্যভাবেই অন্তর্কাঠামোয় বজায় থাকে। এই পরিস্থিতিতে পপ্‌লোর ফোকলোর-এর বিকল্প নয় কখনই, এমনকি আমেরিকান পরিবেশেও নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া, যা ফোকলোরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ড. সৌমেন সেন পপ্‌লোর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'পপ্‌লোর-এর ধারণাটি গড়ে উঠেছে মূলত সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। গত শতকের মধ্যপর্বে আমেরিকার সঙ্গীতজগতে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়, যাকে লোকসঙ্গীত হিসেবে মানতে অনেকের দ্বিধা ছিল যদিও তার ভিত্তি ছিল লোক-পরম্পরা'। এই দ্বিধা দ্বন্দ্বে যে বিতর্ক তৈরি হয় তার একটি প্রতিবেদন পিটার সিগারের একটি রচনা থেকে তুলেছেন ড. সেন, যার মূল বাংলা অর্থ দাঁড়ায় এইরকম—১৯৩০ ও ১৯৪০ এর মধ্যবর্তী সময়ে অ্যালান লোম্যাক্স, যিনি কংগ্রেসের লাইব্রেরীর লোকসঙ্গীত বিভাগের কিউরেটর ছিলেন, শহুরে মানুষদেরকে লোকসঙ্গীত শোনানোর শপথ নেন এবং শহরের মধ্যেই তিনি গ্রামের পরিবেশ তৈরি করবেন বলে দাবী করেন। সে সময় কলেজ স্টুডেন্ট সেদিন প্রথম সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা ও সততার সঙ্গে আমেরিকান ফোক মিউজিক গাইবার ও শোনবার জন্য অ্যালানের দলে যোগ দেন পিটার সিগার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অ্যালান লোম্যাক্সের মূল গানের আর্তি ছিল ফ্যাসিস্টদের বিরোধী এবং ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে। উদার স্পেনের পক্ষে আরো বেশি টাকা পয়সার সংস্থান বাড়ানোর জন্য লিবেডলি গান গাইতেন। পিটার ও উডি প্রায়ই CIO Labor Unions-এর জন্য গান সংগ্রহে বেরিয়ে যেতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তাঁরা একটি পত্রিকা বার করেন, নাম দেন মানুষের গান ("Songs of Labor and the American People")। পিটার লিখছেন যে, তাঁরা স্বভাবতই ভেবেছিলেন যে তাঁরা সমস্ত

ক্ষমতাবান এবং সম্মানীয়দের কাছ থেকে লড়াই করে এই গানগুলি গাওয়ার ক্ষমতা পেয়েছেন তাতে তাঁরা বেতারে সুযোগ পেতেই পারেন না তাঁদের গান গাইবার জন্য। কিন্তু তাঁদের সে আশঙ্কা সত্য হল না। ১৯৪৮-এ long-playing phonagraph record -এর আবিষ্কারের পর রেকর্ড কোম্পানিগুলিই বিভিন্ন আঞ্চলিক ও লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে সেগুলি রেকর্ড করে বার করতে লাগল। F.M. রেডিও-র আবিষ্কারের পর তারা ঐ সব রেকর্ড বাজিয়ে লোকসঙ্গীত প্রচার করতে লাগল। এইভাবে ধীরে ধীরে আমেরিকানরা জানল যে তাদের দেশের লোকসঙ্গীত বলে এক বিশেষ সঙ্গীত আছে।' ৬০-এর দশকের পর এই লোকসঙ্গীতের চাহিদা শ্রোতাদের মধ্যে এত বাড়ল, এত এর বাজার প্রশস্ত হল যে দলে দলে কলেজ ইউনিভারসিটির স্টুডেন্টরা ব্যান্জো এবং গীটার নিয়ে এই সমস্ত গানের শো করতে শুরু করল। তখন লিবেডলি এবং উডি শুধুমাত্র সংগৃহীত গানই যে গাইতেন তা নয়, বরং ঐ একই আঙ্গিকের নতুন গান সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। সুতরাং এই সময় একজন প্রচলিত বা শিক্ষিত লোকসঙ্গীত শিল্পী যখন এই সমস্ত গীটার-ব্যান্জো বাজানো নতুন শিল্পীদের চ্যালেঞ্জ করে বলতেন যে তাদের গানগুলি আসলে লোকসঙ্গীতই নয়, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি প্রশ্নমালার সম্মুখীন হতেন, যেমন :

'Is the old English ballad about the outlaw Robin Hood a folk song ?

Yes.

Is the ballad of Jesse James, the 1870 train robber a folk song?

Yes.

Is Woody Guthric's ballad of Pretty Boy Floyd, the 1935 bank robber....?

Well, Yes.

How about Bob Dylan's 1963 ballad of Hattie Carrol?

No, there I drew the line.

Why? Because Dylan came from Minnesota, instead of Oklahoma?

The folklorist who based his criterion solely on age or anonymity, or rural, illiterate origins, was cornered. The young guiter picker didn't care, in any case.' ['The Popularisation of Folksongs in the U.S.A', Flok Music and Folklore: An Anthology vol I, Ed. Hemango Biswas et al.; Calcutta: Folk Music and Folklore Research Institute, 1967 : pp. 134-42].

রুস্টাইন পিট সিগারকে পপ্লোর তত্ত্বের প্রতীক বলেই মানেন তাঁর গ্রন্থে। পিট সিগারের এই রচনা থেকেই প্রকৃতপক্ষে পপ্লোরের ধারণা উঠে আসে ও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় যে লোকসংস্কৃতির যে বিবর্তন সেটি কতদূর পর্যন্ত বিবর্তিত হলে তা একটি নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে ? পিট্ সিগারের সঙ্গীত কি লোকসঙ্গীত, না গণসঙ্গীত, না পপ্লোর ?

পিটারের বক্তব্য থেকেই জানা যায় যে আমেরিকায় লোকসঙ্গীত ছিল এবং আছে। যাকে নাগরিক সমাজে জনপ্রিয় করে, গণ-আন্দোলনের স্বার্থে নতুন করে রচনা করেন সিগারেরা। সুতরাং এই নতুন সৃষ্ট গানগুলির প্রাণভোমরা হল লোকসঙ্গীত, কিন্তু বহিরঙ্গে আছে নাগরিক প্রক্ষেপ। এই কারণে এগুলি লোকসঙ্গীত থেকে পৃথক। কিন্তু আমাদের দেশের গণসঙ্গীতও তো তাই। লোকসঙ্গীতের সুর ও আঙ্গিক

কিন্তু বাণীগুলি গণচেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট। গণসঙ্গীত গণসংস্কৃতির (আমাদের দেশের) দান। এখানেই সম্ভবত আমাদের গণসংস্কৃতির সঙ্গে ওঁদের আন্দোলনের একটা মিল কোথাও পাওয়া যাবে। এই নতুন সঙ্গীত ধারাকেই ব্রুস্টাইনরা বলেছেন পপ্‌লোর, আর, আমাদের দেশে হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরা এই নতুন ধারাকেই বলেছেন গণসংস্কৃতি। এখানেও গণসঙ্গীত বা গণসংস্কৃতি গণ-সৃষ্টি নয়, জনগণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে কিছু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। অনেক লোকশিল্পী বা কবিয়ালদের মত স্রষ্টারা বা চারণকবিরা এই আন্দোলনের শরিক হয়েছেন। তবে গণসঙ্গীত ও পপ্‌লোর কোথায় এক বা কোথায় প্রকরণ অনুযায়ী ভিন্ন সে বিষয়ে তত্ত্বিকদের মতে অনেক দ্বিমত রয়েছে।

পপ্‌লোর-এর উদ্ভব ও বিকাশ কীভাবে হয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে বলি :

'প্রধানত, পশ্চিম উপকূল ধরে অতলান্তিক মহাসাগরের তীরবর্তী যে-সব আফ্রিকীয় দেশগুলি অবস্থিত সেখান থেকেই দাসব্যবসায়ীরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল অগণ্য সংখ্যক মানুষকে কয়েকশো বছর ধরে। এই মানুষরা ছিলেন অজস্র রকমের সম্পূর্ণ পৃথক জাতি ভাষা-সংস্কৃতির মানুষ। আর যাঁরা তাঁদের কিনে এনে দাস হিসেবে নিযুক্ত করতেন, তাঁরা অধিকাংশই ইংরেজ-আইরিশ-স্কটিশ, এবং কিছু সংখ্যক জার্মান-ফরাসি-হিস্পানি ও ইতালীয়। ১৭৯০-এর আমেরিকার প্রথম আদমশুমারি অনুযায়ী সে দেশের প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫০% ইংরেজ (ব্রিটিশ), ২০% আফ্রিকীয় এবং বাকী অন্যান্যেরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির অবতংস। আফ্রিকীয় জাতিগুলির মানুষেরা খুব তাড়াতাড়িই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে বিবাহসূত্রে এবং ক্রীতদাসীদের গর্ভের যে সাদা চামড়ার মানুষের সন্তানেরা, তাঁরাও এই দ্রুত মিশ্রণকে আরো ত্বরান্বিত করেন। সাদা মানুষেরা সহজে নিজেদের গণ্ডির বাইরে কোনদিনই বিয়ে-শাদি করতে পারেনি। এই মেলামেশায় তাদের অনেক সময় লেগেছে। পক্ষান্তরে কালোমানুষদের একটি অভিন্ন কৃষ্টিকলা' গড়ে ওঠে। আফ্রিকীয় সংস্কৃতিগুলির ধারকরা তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে যাবার ফলে, কিন্তু সেভাবে সাদা চামড়ার মানুষদের কোনও সংহত সংস্কৃতি তৈরি হয়নি। ফলে সংখ্যায় কম হলেও কালো চামড়ার মানুষদের সুসংহত একটি সাংস্কৃতিক চরিত্র গড়ে তুলতে পারা এবং তারই অনুসূত্রে অসংহত ইউরোপীয় সংস্কৃতি-ধারাগুলিকে প্রভাবিত করত সক্ষম হওয়া—এই দুই কারণে ধীরে ধীরে মার্কিনি জনজীবনের সংস্কৃতি রূপে যা আত্মপ্রকাশ করল, তার বৃহত্তর অংশই ভূতপূর্ব আফ্রিকীয় কৃষ্টিধারাগুলির মিশ্রিত রূপেরই সামগ্রিক অভিব্যক্তি। নেগ্রোয়েড ট্রাইবগুলির মানুষদের নাচ-গানের যে সহজাতবোধ ও দক্ষতা তা এই সঙ্গীতকে হাতিয়ার করে আন্দোলন ঘটানোর মানসিকতার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সেই ১৬১৯ খ্রিঃ থেকে পরবর্তী শ-দেড়েক বছর অবধি আফ্রিকা থেকে ধরে এনে জাহাজের খোলে পুরে এই মানুষগুলিকে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে আমেরিকায় পাচার করার সময়ে মাঝে মাঝেই তাঁদেরকে যখন ডেকের ওপর নিয়ে আসা হত-তখন তাঁদের ওই নিদারুণ দুঃখের সময়ও তাঁরা গান করতেন এবং দলবদ্ধভাবে নাচতেন। এই শিল্প ঋদ্ধির ঐতিহ্য অচিনদেশে গিয়েও তাঁরা অনাহত রেখেছিলেন। (লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ ; পূর্ববৎ)

এই সমস্ত 'দাস'-এরা ইউরোপীয় বেহালা এবং ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি দেখে তাঁদের চিরন্তন বাদ্যযন্ত্র 'ব্যাঞ্জের' বা 'ব্যাঙোর' নতুনভাবে বানিয়ে নেন, যা অন্যান্য দেশে 'ব্যাঞ্জো' নামে পরিচিত। এইভাবে বাজনা তৈরি করে 'আইরিশ, স্কটিশ, ইংলিশ টিউন'-এ নিজেদের 'লিরিক' বসিয়ে, নিজেদের গায়নরীতির বৈশিষ্ট্যসমেত

গানও গাইতেন ওই দাসশ্রমিকরা। এর বহুবিচিত্র বিকাশ কখনও দেখা দিয়েছে 'জাজ্ মিউজিক'-এ, কখনও বা 'ব্ল্যাক স্পিরিচুয়ালে'। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিয়ে আসা গ্রাম্য তথা 'ফোক' সুর এবং আফ্রিকা থেকে এসে-পড়া কৌম-ওরফে-'ট্রাইব্যাল' সঙ্গীত এইভাবেই ধীরে ধীরে মিশে গিয়ে মার্কিনি 'পপ্‌লোরিক টিউন' সৃষ্টি করতে লাগল, ব্লুস্টাইন এটাই প্রমাণ করেছেন।

পপ্‌লোরের উদ্ভবের ও বিকাশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অচির-পূর্ববর্তী সময় থেকে গড়ে ওঠা 'চারণ'-সংস্কৃতি, তথা—'মিনস্ট্রেল্‌সি'। 'আমেরিকান মিউজিক : ফ্রম দ্য পিলগ্রিমস টু দ্য প্রেজেন্ট' (১৯৫৫) বইতে গিলবার্ট চেজ এই সংঘটনাটির উৎস সম্পর্কে বলেছেন : "মেনি মিনস্ট্রেল-সংস হ্যাঙ দেয়ার অরিজিন্‌স ইন অ্যানোনিমাস ফোক টিউন্‌স সো দ্যাট দে হ্যাভ পাস্‌ড ফ্রম দ্য ডোমেইন অব ফোকলোর অ্যান্ড ব্যাক টু ইট এগেইন আফটার দ্য ইউজ্যুয়াল প্রসেস অব বীইং মোডিফায়েড অর রি-ওয়র্কড।" (পৃঃ ২৭৮)

লোকসঙ্গীতের এই যে পরিবর্তিত ধারা তা আফ্রিকীয় বা ইউরোপীয় যে বর্ণেরই হোক না কেন, তাকে চেজ 'ফোকলোর' বললেও ব্লুস্টাইন একেই বলেছেন 'পপ্‌লোর'-এর প্রথম সোপান। উনি ঐতিহাসিক এরিক লটকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, এটি হল প্রকৃপক্ষে, "অ্যান আউটকাম অব দ্য ইকোনমিক্স অব স্লেভারি।" (পৃঃ ৭৩)

ব্লুস্টাইনের মতে, নিগ্রো 'স্পিরিচুয়াল' তথা 'আধ্যাত্মিক' গানগুলির ভূমিকাও 'পপ্‌লোর' গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিগ্রো দাস-শ্রমিকরা তাঁদের শ্রম-ক্লান্তি এবং সামাজিক অবমাননার মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের যে-উৎসকে সন্ধান করতেন, অজস্র সংখ্যায় রচিত এই গান গুলির মাধ্যমে সেগুলিকেই তাঁরা প্রকাশ করতেন। তাঁদের খ্রিস্টান মনিবদের পীড়নে তাঁদেরও খ্রিস্টভক্ত হতে হয়, বাইবেলকেও মানতে হয় ; কিন্তু একদিন এই বাইবেলের 'স্পিরিচুয়াল' সঙ্গীতকেই হাতিয়ার করে তাঁরা তাঁদের সংঘাতের মানসিক হাতিয়ার তৈরি করে ফেলেন। যেমন, পিট সিগারের মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত 'উই শ্যাল ওভারকাম' গানটি যার মূল গান ছিল একটি লাতিন ক্যাথলিক স্তোত্র 'ওহ্ স্যাংটিসিমা'—সেটি আমেরিকার দক্ষিণী ক্ষেত মজুর তথা নিগ্রো দাসদের গায়নরীতির সঙ্গে মিশে, প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণের তামাকের ক্ষেতের মজুরদের ধর্মঘটের গান হিসেবে। অবশেষ গত শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায় সিগার এটিকে সিভিল রাইটস আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে নিয়ে প্রথমে দেশজুড়ে, তারপরে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন। মূলতঃ এইভাবেই 'পপ্‌লোরে'র সৃষ্টি হয়েছে।

ব্লুস্টাইন তাঁর 'পপ্‌লোর : ফোক অ্যান্ড পপ্ ইন আমেরিকান কালচার' (১৯৯৪) গ্রন্থে পিট সিগার, উডি গাথারি এবং আরো অনেকে যাঁরা মার্কিন প্রশাসনের চাপের মধ্যে থেকেও সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় প্রবুদ্ধ, তাঁদের কথা বারবার বলেছেন মূলত গানের প্রসঙ্গেই। কিন্তু তিনি লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রকরণগুলির বিবর্তন ব্যাখ্যা করেননি। একটি 'স্লেভ মিথ'-এর কথা এখানে স্মরণযোগ্য : যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'পপ্‌লোরে'র মূল দর্শনচিন্তা।

'বাইবেলের মিথে আছে যে আদম এবং ইভের পুত্র কেইন তার ভাই আবেলকে হত্যা করেছিল। নিগ্রো ক্রীতদাসরা তাঁদের মতো করে এই বাইবেলীয় কাহিনীর রূপান্তরণ করেছিলেন : খুন করে পালানোর সময়ে কেইন ঈশ্বরের সামনাসামনি পড়ে যায়— ফলে ভয়ে তার মুখ এবং সর্বাঙ্গ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার

বংশধররাই হল শাদা মানুষ! আর আবেলের মৃতদেহ রোদে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে যায়; তার সন্ততিরাই কালো মানুষ। আবেলের সন্তানেরা দক্ষিণে (অর্থাৎ আফ্রিকায়) চলে যায়। কেইন সপরিবারে পালায় উত্তরে (অর্থাৎ ইউরোপে)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়।... এই স্লেভমিথের তাৎপর্য এটিই : ইউরোপীয় বংশজ শাদা মানুষরা জন্মসূত্রেই খুনি; আর আফ্রিকার অবতংসরা তাদের দ্বারা পীড়িত এবং নিহতই হয় এখনও!"

এই যে তথাকথিত পপলোরের উদ্ভব এবং তার জয়যাত্রা তা প্রথম থেকেই মোটেই খুব সুগম ছিল না। ১৯৫০-এর দশকে আমেরিকার লোকগায়ক/পপ্‌গায়কদের ওপর ম্যাকার্থিবাদের আক্রমণ ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিকভাবে প্রকাশিত প্রতিবাদমুখরতা এবং লোকসংস্কৃতির বিবর্তন যে একালে অনিবার্য একটি প্রক্রিয়া—এটা বুঝতে মার্কিনী প্রশাসনের দেরী হয়নি। তাই ডরসনেরা পপলোরের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব আনেন, এই সংস্কৃতিকে 'ফোকলোর' বলা হয় অর্থাৎ 'ভেজাল সংস্কৃতি'। কিন্তু বর্তমানে ক্রমে এই 'ফেকলোর' তত্ত্ব সকলের বোধগম্য হয়ে উঠতে, চারিপাশের দামামাও থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে বলা যায়। ('লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' : পূর্ববৎ; পৃ. ৩৬২-৩৬৩ দ্রষ্টব্য)

গণসংস্কৃতির প্রেরণা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী আন্দোলন, তথা প্রাক্-স্বাধীনতা কালে গণ-আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে নতুন গণচেতনাভিত্তিক সংস্কৃতি-নির্মাণের আদর্শ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য হোতা। "১৯৫১ সালের ১ জুন প্রাদেশিক খসড়া প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে সুরপতি নন্দী সংঘের মূল নীতির একটি খসড়া প্রচার করেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যে জানা যায় যে এই খসড়ার প্রাথমিক রূপটি তৈরি হয় সংঘের। অতীতের সব ঘোষণাপত্র, অন্যান্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের ঘোষণাপত্র ও জেলাভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও আলোচনার ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক রূপটি প্রস্তুত করেন ঋত্বিককুমার ঘটক। এই খসড়ায় গণনাট্য সংঘের চারটি প্রধান কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়, 'এক, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে নিজেদের সংঘবদ্ধ করা; দুই সর্ব শিল্পকর্মকে নিয়োজিত করিয়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে শক্তিশালী করা; তিন, জনতার স্বার্থের কথা ভাবিয়া ও তাহাকে অনুধাবন করিয়া সৃজনশীল সত্যকার জনগণের শিল্প সৃষ্টি করা ও তাহাকে লইয়া জনতার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং চার, জাতীয় সংস্কৃতির উপর যে কোন রকম আক্রমন প্রতিহাত করা।' এই কর্তব্যসাধনে প্রস্তাবিত নানা পন্থার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হিসেবে খসড়ায় বলা হয়, 'গণনাট্য সংঘ হাজার হাজার নামগোত্রহীন ভারতীয় কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমগ্র লোকসংস্কৃতিকে জাতীয় জীবনের ব্যথা-বেদনা আশাকে মূর্ত করার প্রধান পন্থা হিসাবে ব্যবহার করিবে এবং ঐ ঐতিহ্যকে উন্নত স্তরে লইয়া যাইবে।.... এইভাবে তাঁহারা গণনাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইবেন।' এই পন্থা কীভাবে বাস্তবায়িত করা হয় তার কিছু সংবাদ পাই গণনাট্য নেতা সজল রায়চৌধুরীর একটি রচনায় : গণনাট্য আন্দোলনে মধ্যবিত্ত কমরেডদের পাশাপাশি লোকশিল্পীদের অবদান অন্যনসাধারণ। সারি, জারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ভাদু, টুসু, আলকাপ, গম্ভীরা, তরজা, কবিগান প্রভৃতি লোকশিল্প গণনাট্যকে প্রভাবিত করেছে। রমেশ শীল, শেখ গোমানী, রাইমোহন, নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল, হলধরজী, মিসিরজী, আসগর, বিশ্বনাথ পণ্ডিত, সিরাজ প্রমুখ লোকশিল্পীরা গণনাট্য সংঘকে শুধু জনপ্রিয় করেননি, শোষণমুক্তির সংগ্রামে হাতিয়ার করা হয়েছে গণনাট্য কর্মীদের। বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সাধন দাশগুপ্ত প্রমুখ মধ্যবিত্ত শিল্পীরাও গান বেঁধেছেন লোকসংস্কৃতির আধারে। তখনকার দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ করবার ও

তাকে নতুন কথায় সঞ্জীবিত করবার একটা সচেষ্টতা ছিল। লোকসঙ্গীতকে ব্যবহার করে বিজন ভট্টাচার্য রচনা করেছিলন 'জীয়ন কন্যা'/তিনি, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্ররাও লোকসঙ্গীতের সুর আত্মস্থ করে নতুন সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।"

—["ফোকলোর, পপ্‌লোর গণসংস্কৃতি ইত্যাদি" : 'লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য' : সৌমেন সেন, ২০০৪, পৃঃ ; লেখক উক্ত অংশটি 'গণনাট্য আন্দোলনের স্মৃতি ও সুধীপ্রধান,' সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ সম্পা., মালিনী ভট্টাচার্য, ১৯৯৯ ; পৃ. ৮৩-৮৫—থেকে উদ্ধৃত করেছেন।]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'গণসংস্কৃতি'-র স্বরূপ লক্ষণকে ব্রুস্টাইন চিহ্নিত করতে না পারলেও, গণসংস্কৃতির প্রাণসত্তা হল প্রতিবাদের প্রবণতা ; পপ্‌লোরের সঙ্গে যা অনেকটাই মেলে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মূলত রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেই গণসংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছে আমাদের মত পিছিয়ে পড়া দেশে। অর্থনীতির আওতাভুক্ত এই দেশে গণসংস্কৃতির চর্যা-চর্চা বহুলভাবে শ্রেণি সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে পপ্‌লোর উদ্ভব হয় মূলত আমেরিকার মতে দেশে ক্রীতদাস কালো মানুষ ও মালিক উচ্ছৃঙ্খল নিষ্পেষণকারী শাদা মানুষদের চিরকালীন দ্বন্দ্ব থেকে। যেটিকে শ্রেণিসংগ্রাম না বলে মুক্তির সংগ্রাম বলা যায়। আর এই দ্বন্দ্ব পশ্চিম ইউরোপের প্রত্যেকটি ঔপনিবেশিক দেশেই বিস্তৃত। তবে আমেরিকার 'সংস্কৃতি' গড়ে তোলার জন্য যে-কালো মানুষেরা এবং যে শাদা মানুষেরা শ্রেণিগত ফারাক থাকলেও, হয়ত "মহাকালের অনিবার্য, অমোঘ, অলক্ষ্য অভিক্ষেপেই পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা নিজের নিজের বর্গের মধ্যেও কিন্তু একশৈলিক (মনোলিথিক) ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না।

ড. পল্লব সেনগুপ্তের মতে, "এই ব্যাপারটা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি। একই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক সংস্কৃতিগুচ্ছের মানুষেরা এভাবে ঘৃণা ও নির্ভরশীলতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি কোনও দেশে, কোনও সংস্কৃতিবলয়ে। অন্যত্র, শোষক এবং শোষিত-এই দুই বর্গের মানুষেরা একই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও, দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সংস্কৃতিবলয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনওদিনই ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই ব্যাপারটিই ঘটেছে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার আগের আমল থেকে গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে। তাই আমেরিকার 'পপ্‌লোর'-এর অন্যরহিত একটি চরিত্র আছে। অন্য সর্বত্রই যেটা ঘটেছে, তার একটা নিয়মিত ছক আছে : ওপরওলার সাচ্ছল্যভোগী মানুষেরা লোকসংস্কৃতি এবং তার পরিশীলিত পরিণাম ধ্রুবপদী সংস্কৃতি—দুইয়েরই অংশভাক ছিল, এবং এখনও আছে বহু-বহু আর্থ-সামাজিক বলয়ে। আর লোকসংস্কৃতির আর একটি বিবর্তিত পরিণাম—গণসংস্কৃতি— তার বিকাশ ঘটেছে, ঘটে চলেছে শিল্পায়নসঞ্জাত নাগরিক সমাজে, যেখানে বিভিন্ন এলাকার মানুষ তাদের স্থানিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকসংস্কৃতির উপকরণগুলি নিয়ে আসে কর্মসূত্রে সেখানেতে জড়ো হবার অবিভাজ্য অনুষঙ্গ হিসেবেই। বিমিশ্রণ সেখানেও ঘটে, কিন্তু তা মার্কিন দেশের মতো সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত দু-ধরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাংস্কৃতিক পরিণয়ের লব্ধফল ওই 'পপ্‌লোর' এর সঙ্গে আদৌ তুলনাসাপেক্ষ নয়।"...

[লোকসংস্কৃতি ও একালের প্রেক্ষিত' : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' পূর্ববৎ ; পৃ. ৩৬২-৬৩।]

গণ সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হল নাটক। গণনাটক বা পোস্টার ড্রামা বা যাকে আমরা পথনাটিকা বলছি, লোকনাট্যের শিকড় তার মধ্যে থাকলেও, শহুরে আর্থ-সামাজিকতাই হল এর বিষয়। এগুলি

প্রধানত রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে নির্বাচনের প্রাক্কালে সম-সাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক উপলক্ষগুলি অবলম্বন করে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীরা এই ধরণের নাট্যচিত্র (পূর্ণাঙ্গ নাটক এদেরকে বলা চলে না, এমন কী একাঙ্কিকাও নয়) শহরের পথে পথে, কল-কারখানাগুলির গেটের সামনে, পার্কে-ময়দানে অভিনয় করেন।

"লোকনাট্যের উপকরণ নিয়ে পথনাটিকা তৈরি এবং অভিনয় করে রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার ব্যাপকভাবে শুরু হয় চিন দেশে, লংমার্চের সময়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণে হাজার-হাজার মাইল পথ যখন মাও-জে-দঙের নেতৃত্বে 'রেড আর্মি' পরিক্রমা করে আসছিল তখন সেই সুবিশাল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকা মহাচিনের অজস্র জাতি-অধিজাতিদের আস্থা অর্জনের জন্য, "আমি (ওরফে, আমরা !) তেমাদেরই লোক"—এই সত্যটাকে প্রতিপন্ন করবার জন্য চিনা কম্যুনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান শ্রীমতী তিং লিং একটি বহুদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেন : তিনি মাও-জে-দং, লি শাউ-চি, চু-এন লাই, মার্শাল চু-তে প্রমুখ প্রধান নেতাদের বোঝান যে, রেড আর্মির পাশাপাশি কম্যুনিস্ট পার্টির স্বেচ্ছাসেবকরাও যদি গ্রামে গঞ্জে যান এবং স্থানীয় ভাষায় প্রথমে স্থানীয় প্রকরণের প্রচলিত লোকনাট্যগুলির অভিনয় করেন এবং তারপরে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রচারমূলক পথনাটিকার পালাগুলির উপস্থাপনা করেন কৃষদের কাছে, তাহলে মানুষকে কাছে টানার কাজটাও অনেক সহজসাধ্য হবে। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর ঐ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা চিনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল অল্পদিনের মধ্যেই।" (ঐ, পৃঃ ৩৬৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গণসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হিসেবে পথনাটিকার অবদানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা সে চিনেই হোক বা আমাদের দেশে এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনই এর মূল উপজীব্য।

পথনাটিকাগুলিতে লোকনাট্যের ট্র্যাডিশন মানা হয় ঠিকই কিন্তু ঘটনাক্রমটি সাজানা হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তাই তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাড়তি সংলাপ যোগ করা হয়, বিশেষ কোন মেক-আপ বা সাজসজ্জার ব্যবহার করা যেতেও পারে বা নাও যেতে পারে এবং নাটক জমানোর জন্য মধ্যে মধ্যে নাচ গানের ব্যবহার করা পথনাটিকাগুলির বৈশিষ্ট্য। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং নাটকটির মূল অর্থ রাজনৈতিক বক্তব্যও মানুষের কাছে সহজে পৌঁছতে পারে। লোকনাট্যের পরম্পরাক্রম বা গতানুগতিকতা পথনাটিকায় নেই। বরং পথ নাটককে আছে কিছু প্রতীক যার উপলক্ষে দর্শকরা নিজেদের মত করে এক-একটা তাৎপর্য অন্বেষণ করে নিতে পারেন। এখানে সজ্জা, সংকেত, প্রতীক ইত্যাদি বহু কিছুই আপেক্ষিক আবেদন বহন করে। পপ্‌লোর এবং গণসংস্কৃতি দুইই আধুনিক জীবনচর্যার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট। দুয়েরই জন্ম লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসূত্রে কিন্তু বিবর্তন ঘটেছে নাগরিক পারিপার্শ্বিকে। দুয়ের মধ্যে রয়েছে একটা অলক্ষিত ঐক্যভাবনা—প্রতিবাদ প্রবণতা, যদিও তাদের উৎপত্তি আলাদা আলাদা দেশ-কাল-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে। এই কারণেই এরা লোকায়ত সংস্কৃতির যথার্থ উত্তরাধিকারী। লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে বিশ্বজনীন ভিত্তি, তাতেই আমেরিকার পপ্‌লোর বা আমাদের গণসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক বাধ্যতা, দায়বদ্ধতাও। আবার উভয়েই বস্তুত লোকসংস্কৃতির অধমর্ণ। তাই কখন-ও সমান্তরাল অসম্ভব নয়।

জনসংস্কৃতিকে এককথায় জনগণের সংস্কৃতি বলা চলে, অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির ভাবকেন্দ্র থেকে এর

বিকাশ ঘটলেও লোকসংস্কৃতির যে মূল বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, সেটি জনসংস্কৃতিতে নেই। আবার ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল সংস্কৃতির সম্পূর্ণ কৃত্রিম ছকে বাঁধা বৈশিষ্ট্য—সেটিও জনসংস্কৃতির নেই। লোকসংস্কৃতি থেকে গণসংস্কৃতি ঠিক যে রেখাচিহ্ন ধরে সরে এসেছে, জনসংস্কৃতির বিকাশ সেই মধ্যবর্তী অবস্থা থেকেই হয়। জনসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার হয় মূলত জনসাধারণের মুখে মুখে, মৌখিক বা Oral ধারায়। লিখিত সাহিত্যে তা পরে ধারবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হতেও পারে। তবে জনসংস্কৃতির মধ্যে কোন একটি বিশেষ অবতল বা স্থানের সংস্কৃতিক বিকাশকে ধরা সম্ভব নয় সবসময়। কারণ বিভিন্ন অঞ্চল বা শ্রেণি বা বর্ণ নির্বিশেষে সার্বিক জনগণের চেতনায় এই সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশ নির্ভরশীল হওয়ায় একটি সার্বিক চেতনাবোধ সর্বদাই জনসংস্কৃতির মধ্যে থাকতে দেখা যায়। যেমন ধরা যাক কথাধর্মী জনসংস্কৃতির সবচেয়ে বড় নিদর্শন বাংলার মঙ্গালকাব্যগুলি। মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গাল কাব্যের ধারা মধ্যযুগে বাংলার জনসাধারণের কাছে অতীব জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক বিনোদনমূলক ধারা এতে সন্দেহ নেই। এই মঙ্গাল কাব্যগুলি মানুষের মুখে মুখে সৃষ্ট অর্থাৎ মৌখিক সাহিত্য, বাংলার গ্রাম্যজীবনে অত্যন্ত প্রিয় ধারা হওয়ায় জনগণ সকলে দিনের পর দিন রাত জেগে এই মঙ্গালকাব্যের গল্প শুনতে এবং পরবর্তীকালে ঐ গল্প নিয়ে তৈরী যাত্রাপালা বা নাটক বা পটের গান ইত্যাদি দেখতে ও শুনতে তাঁরা অভ্যস্ত। এই মঙ্গাল কাব্যগুলি কিন্তু জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়নি। বিভিন্ন পুরাণ থেকে গল্প নিয়ে মঙ্গাল কাব্যের গল্পগুলি সৃষ্ট। যেমন– মনসামঙ্গালের উৎস হল পদ্মাপুরাণ। পুরাণগুলি যদিও কোন মহাকাব্য বা ধর্মগ্রন্থ নয়, তবুও বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অনুষঙ্গে ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠা মিথ। এই মিথগুলি যখন প্রচারিত হতে শুরু করে, তখন সেই মিথকথাই হয়ে ওঠে মঙ্গালকাব্যের এক একটি শাখা। যেমন, মনসার মিথ কথা নিয়ে গড়ে ওঠা যে কাহিনি তা শুনলে ও পাঠ করলে মানুষের মঙ্গাল হবে, তার সন্তান ও সংসার সুখে শান্তিতে থাকবে, মনসার কোপ থেকে রক্ষা পাবে, এই সার্বিক ধর্মবোধ বা চেতনা থেকেই মনসা মঙ্গালের জনপ্রিয়তা জনসমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং প্রাথমিকভাবে হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে সকলের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পায়।

পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে এই মঙ্গালকাব্যগুলি আপন আপন ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠে। নিম্নবর্ণের হিন্দুপ্রজারা, যাঁরা মুসলমান ধর্ম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন হিন্দুসমাজব্যবস্থার কঠোরতার কারণে বা মুসলমান সুলতানদের পীড়নে, তাঁদের মধ্যেও এই মঙ্গালকাব্যধারা সাংস্কৃতিক বিনোদনের ক্ষেত্রে জোয়ার আনে। ফলে একটা সময়ে হিন্দু মুসলিম উভয় বাঙালিই এই মঙ্গালকাব্যের ভক্ত হয়ে ওঠে। মনসামঙ্গালে বর্ণিত 'মনসা' পুরাণের চরিত্র হলেও, বেহুলা ছিল বাঙালি ঘরের বউ এবং লখিন্দর বাঙালি ঘরের আদরের ছোট ছেলে লখা। চাঁদসদাগরের দাপুটে চরিত্র উচ্চ-মধ্যবিত্ত ব্যবসাদার দাপুটে দুঁদে বাঙালির চরিত্রকে চিত্রিত করে, যাকে কোন প্রলোভনে ও অভিশাপেই কাবু করা যায় না। অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গালে কালকেতু উপাখ্যান বর্ণিত কালকেতু ও ফুল্লরা চরিত্রের সঙ্গে খেটে খাওয়া আপামর দরিদ্র বাঙালি প্রাণের আত্মীয়তা অনুভব করে, যদিও চণ্ডীর চরিত্রের নানা লীলাখেলা পুরাণআশ্রিত। অন্যদিকে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি খোঁজে প্রাণের আত্মীয়তা। এইভাবে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে জনসংস্কৃতি। পুরাণ বা ধর্মকথা সেখানে নিমিত্ত মাত্র। মানুষ রাতের পর রাত গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বা কোন জমিদারের দাওয়ায় বা গ্রামের কোন সাধারণ পালা-পার্বণে, আনন্দ-উৎসবে একত্রিত হয়ে এই মঙ্গালকাব্যগুলি শোনে কেবল

মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁরা প্রাণের আত্মীয়তা বোধ করে বলে। উৎসবের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই আত্মার আত্মীকরণ, এটিই জনসংস্কৃতির মূল চরিত্র। ধর্মমঙ্গলের 'ধর্ম' বৌদ্ধ সংস্কৃতির দান হলেও এখানে রাঢ়বাংলার সাধারণ মানুষেরই জীবনগাথা ধর্মীয় আঙ্গিকে তুলে ধরা আছে। এইসমস্ত গল্পগুলি লোকগল্প হলেও ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস গল্পগুলিকে একটি বাঁধনে বেঁধেছে। যেমন, সত্যপিরের গল্পটি, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গল্পটি সৃষ্ট, তা গল্পের বাঁধুনি দেখলেই বোঝা যায়। সত্যপীরকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই বা সত্যনারায়ণকে আটা আর সন্দেশ দিলেই ব্রাহ্মণের ঘরে সুখ শান্তি আসে, নতুবা তা ধ্বংস হয়ে যায়। ধর্মমঙ্গালের লাউসেন আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ কিন্তু ধর্মের কৃপাই তাকে আমাদের থেকে আলাদা করে দেয়।

এমনিভাবেই যদি দেখি গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি, সেগুলি আমাদের জনসংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অতি প্রিয় চরিত্র এবং চিরকালীন ভাঁড় যে গোপাল ভাঁড়, সেও মানুষেরই সৃষ্টি। তবে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে তার জন্ম নয়। কতকগুলি লোকগল্প মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে দরবারি কায়দায় অন্যভাবে মাজাঘষা হয়ে রূপ পরিবর্তন করে এবং একটি মাত্র চরিত্রের গুণকীর্তন করে সেগুলি নতুনভাবে রচিত হয়। পরে সেগুলি আবার মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা পায়। লিখিত সাহিত্যে পরিবর্তিত হয়ে, দেশি-বিদেশি ভাষায় অনুদিতও হয়। ফলে জনসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

জনসংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতির পার্থক্য এদের বৈপ্লবিক চরিত্রের মাত্রায়। গণসংস্কৃতিতে যেমন কোন স্থানের বা কালের মানুষের প্রতিবাদ প্রবণতা দেখা যায়, সেখানে রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও তার সমাধানের আবেদনই মুখ্য, জনসংস্কৃতির মূল ভাবনা মানুষের আবেগ ও সংগ্রামের কাহিনি।

যে সমস্ত লোকসঙ্গীতের ব্যবহার অঞ্চলভেদে, দেশভেদে মিশ্র আবেদন সৃষ্টি করছে ও জনপ্রিয় হচ্ছে সেগুলিও আমাদের জনসংস্কৃতির অঙ্গ। যেমন, ঝুমুরের সুরে ও আঙ্গিকে অসমের চা-বাগানের কুলি কাবারিদের মধ্যে প্রচলিত গান। বিহার ও ঝরিয়া থেকে অনেক মজুর আসামে গেছে একটু ভালো রোজগারের আশায় কিন্তু অবধারিতভাবে তার আশাভঙ্গ হয়েছে। এমতাবস্থায় তার দেশীয় লোকসঙ্গীতের সুরে যদি সে নিজেই একটা গান বাঁধে নিজের মনের টানাপোড়েনের বর্ণনা দিয়ে তবে সেই গানে অসমের লোকসঙ্গীতের একটি প্রভাবও অবধারিতভাবে পড়ে, যেহেতু সে বর্তমানে অসমেরই অধিবাসী হয়ে গেছে। পরে এই গানটির কোনওভাবে রেকর্ডবন্দী হয়ে যখন মানুষের মনে ঐ বিশেষ কুলি বা কামিনের প্রতি একটা সহানুভূতির আবেদন তৈরি করে এবং ঐ কুলি-কামিনদের অবস্থার মর্মন্তুদ চিত্র গানের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদের ভাষায় ফুটে ওঠে তখন ঐ গানটি নিশ্চিতভাবেই লোকগান থেকে গণসংস্কৃতি হয়ে ওঠার মাঝে জনসংস্কৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ লোকগানের ঐতিহ্য পুরোমাত্রায় গানটিতে নেই আবার গণসংস্কৃতি সোচ্চার প্রতিবাদের ভাষাও তার মধ্যে নেই মধ্যবর্তী অবস্থার সৃষ্টি এটি—

চল মিনি আসাম যাব
দেশে বড় দুখ রে—
আসাম দেশে রে মিনি চা-বাগান হরিয়া
... ...

সর্দার বলে কাম কাম
ধাক্কু বলে ধরে আন
সাহেব বলে নিব পিঠের চাম, ও যদুরাম
ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম
... ...
এক পয়সার পুঁটিমাছ
কয়াগুলার তেল গো
মিনির বাপে মাঙ্গো যদি, আরুই দিব জোল গো।

এই গানটির থেকেই উঠে আসছে ঐ মানুষগুলির গুমরোনো কষ্ট ও আবেগ। সামান্য এক পয়সার পুঁটিমাছের ঝোল যে গ্রাম্য গৃহবধূ তার স্বামীকে খেতে দিতে পারে মা, সে অনেক আশা নিয়ে আসামের চা বাগানে দুটো বাড়তি রোজগারের আশায় গিয়ে, রোজগার তো কিছু বাড়লই না, উল্টে কেবল সাহেব ও বাবুদের অত্যাচার সহ্য করে হাড়ভাঙা খাটুনিই খেটে যেতে হল।—এর থেকে মুক্তি কোথায়!

আমাদের দেশের এমন জনসংস্কৃতির মত জনগণের আর্তি সব দেশেই রয়েছে। 'ফোকলোরে'র আঙ্গিকে যে সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, আবার গণসংস্কৃতি বা 'পপ্‌লোর'-ও সেগুলি নয় কারণ প্রতিবাদ সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। তাই জনসংস্কৃতিকে একটি আলাদা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় সমস্ত দেশের বিচারে।

২.৫ ❐ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় সংস্কার ও অলৌকিকত্ব : মান্যা-ম্যাজিক-ট্যাবু-টোটেম

আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কৃতির যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে মানস-সম্পদ ও ব্যাবহারিক প্রয়োগ, উভয় ক্ষেত্রেই তার মধ্যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের মনে গড়ে উঠেছে নিজেদের ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও তাদের অসংখ্য কল্পিত সমাধান। বহুসময়ই নানান্ অলৌকিক প্রত্যয় সেই সময় কল্পনার অন্তর্কাঠামো তৈরি করে। বাস্তব জগৎ থেকে উঠে আসা নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে ধারণাগুলি মানবমনে কল্পনার অন্তর্লোকে দানা বাঁধে, সেগুলির একটি সর্বজনীনতা সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন এবং তাঁরা তাদেরকে মূল চারটি বর্গে বিন্যস্ত করেন : মান্যা, ম্যাজিক, টোটেম ও ট্যাবু ; অলক্ষ্য-সত্তা, জাদু, কুলপ্রতীক এবং নিষেধ-সংস্কার। এগুলি আবার একে অন্যের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পরেই এদের সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের নানা বিচার-বিশ্লেষণে ও নিয়মের অনুষঙ্গে। এবং তারই অনুষঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে দেবতা, ধর্ম ইত্যাদি ভাবনা।

জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা এবং মৃতেরও আত্মা থাকার বিশ্বাস—এই দুইয়ে মিলে আদিম মানুষের মনকে ধীরে ধীরে দেবতা, জাদু, ধর্মধারণা প্রভৃতির দিকে ঠেলে দিতে লাগল। এই সূত্রেই

অধ্যাত্মবোধের জন্ম। বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্তর্লীন শক্তিকে আয়ত্তে আনার সম্ভাব্য প্রয়াস থেকে উৎপন্ন হল জাদু বিশ্বাস, তারই সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিভিন্ন 'মান্যা'র বিবর্তন ঘটল। যার পরিণাম দেবতার কল্পনা। এই দেবতাদের কিসে কিসে রোষ হয় এবং কিভাবে দেবতাদের তুষ্টিসাধন করলে তাদের কোপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, যথাক্রমে সেই সাধন ও প্রতিরোধ করার প্রয়াসই পরিণতি পায় ধর্মাচারে এবং ধর্মসংস্কারে। এই সমস্ত কিছু সংশ্লেষণের ফলশ্রুতি হল 'ধর্মধারা' ওরফে 'কাল্ট' ; এক একটি বস্তু বা বিষয়ের দেবতাকে অবলম্বন করে যা গড়ে উঠেছে সর্বত্র। পূর্বপুরুষের পূজা থেকে এসেছে প্রেতের কল্পনা এবং নানা বিচিত্র কারণে পশু-পাখি-সরীসৃপ-ফল-শস্য প্রভৃতি হরেক প্রাণী/বস্তু থেকেই উদ্ভব হয়েছে এক একটি কোম-এর। টোটেম ধারণার সঙ্গে যার সম্পর্ক গভীর।

'মান্যা' শব্দটি নৃবিজ্ঞানের সূত্রে এখন বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মেলানেশীয় শব্দ ; দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপবাসীদের আদিবাসীদের মধ্যে যা প্রচলিত। তবে 'মান্যা'র ধারণাটি সর্বজনীন ও সারা পৃথিবীতেই বর্তমান। এমনকি আজকের আধুনিক নাগরিক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও 'মান্যা'র ধারণা অটুট। 'মান্যা' হল মূলত একটি অলক্ষ্য শক্তি, যা মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়ে উঠে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয় এবং এর অবস্থান প্রকৃতির সমস্ত বস্তুনিচয়ের মধ্যে (যা নৈসর্গিক ঘটনা ঘটায়)। সেই অলক্ষ্য শক্তি নিরাকার, অনির্দেশিত—কিন্তু এটি তার ক্ষমতাবলে যেমন মানুষের ভাল করে, তেমনি আবার চূড়ান্ত অনিষ্টও ঘটাতে পারে। ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা, বরফ পড়া, অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়া, নদীর স্রোতে মানুষের হঠাৎ ভেসে যাওয়া, ডুবে মরা, দাবানল জ্বলা প্রভৃতি আরও অজস্র নৈসর্গিক ঘটনার পিছনে যে অলৌকিক শক্তির 'হাত' এমনই একটি ধারণা ছিল আদিম প্রপিতামহদের মনে স্মরণাতীত কাল থেকে। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই ঘটনাগুলির গবেষণার পর একটি মতবাদ প্রচার করেন—সর্বপ্রাণবাদ (animism), যার সূত্রে এই 'মান্যা'র ধারণার সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

সর্বপ্রাণবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে মানস প্রত্যয়ের মতবাদ (প্রবক্তা ই. বি. টাইলর), এবং উদার দৃষ্টিতে সাধারণত এটা আধ্যাত্মিক জীবকে বোঝায়। নিসর্গভীতি, আপাতদৃষ্টিতে নির্জীব বস্তুতে প্রাণবত্তার প্রয়োগ এই বিষয়ের একটি উপরিভাগ (প্রবক্তা আর. আর. ম্যারেট), যার মধ্যে নিসর্গভীতি ও সর্বপ্রাণবাদ উভয়েই বর্তমান।

এই নামকরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে একেবারে নিসর্গ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ধারণার প্রতি এবং ঐতিহাসিক ও আমাদের সমসাময়িক জ্ঞান দিয়ে আমরা যে আদিম জাতিদের জেনেছি, তাদের জগতে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এই জাতিরা মনে করে, এই পৃথিবীতে অগণিত আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে। এই সত্তাগুলির মধ্যে কতকগুলি তাদের কল্যাণকামী আর কতকগুলি অকল্যাণকামী। এবং এদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এই সব দেব-দানবদের দ্বারাই সাধিত হয়। তাদের আরও বিশ্বাস যে শুধু প্রাণী আর উদ্ভিদ জগৎই নয় নিষ্প্রাণ বস্তুবর্গও ঐ আত্মাসকল কর্তৃক প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। সম্ভবত আদিম জাতিদের 'প্রকৃতি দর্শন'-এর তৃতীয় অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক হলেও আমর' তা মানতে পারি না, কারণ আমরা নিজেরাই এর থেকে বেশি দূর যেতে পারিনি। যদিও আমাদের প্রেতাত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ ও ধারণা বর্তমানে অনেক সঙ্কীর্ণ এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের আনুকূল্যে আমরা অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জেনে গেছি। তবে আদিম প্রপিতামহদের এ ব্যাপারে আশ্চর্য ও বিস্ময়বোধ ছিল অনেক অনেক বেশি মাত্রায়।

প্রকৃতির মধ্যেই তারা ঘুরত ফিরত এবং এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যখন তারা একা হয়ে পড়ত বা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ত তখনই এক বিশালত্বের ধারণা তাকে আরো একা ও অসহায় করে দিত। সূর্যের রশ্মি দেখে সে ভাবত কোথায় এর রহস্য, দীঘির জলের কালো গভীরতা হঠাৎ অরণ্যের বিশাল ঘনত্বের মাঝে তার বুকের ধুকপুকুনি বাড়িয়ে দিত, ফুলের সুন্দর রঙের বাহার, প্রজাপতির মায়া তার মনে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও আনত কিভাবে এর উৎপত্তি। আদিম অধিবাসীরা মানুষের ক্ষেত্রেও 'প্রাণবন্ততা'র মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। মানুষের আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা তার বর্তমান আশ্রয় পরিত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে ; তা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ-এর বাহক এবং খানিকটা দেহ-নিরপেক্ষ। আগে আত্মা ও ব্যক্তিকে প্রায়শই এক করে দেখা হলেও, বর্তমানে আত্মা তার পার্থিব প্রকৃতিকে হারিয়ে 'আধ্যাত্মিকতা'র উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, আত্মাবাদই যে সর্বপ্রাণবাদের আদি কারণ, প্রায় সব গ্রন্থকারই এই মত বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, প্রেতাত্মা হল স্বাধীন আত্মা। আর, মানুষের আত্মা যেভাবে গড়ে উঠেছে সেই ভাবেই জন্তুর, উদ্ভিদের ও বস্তুর আত্মা গড়ে উঠেছে।

আদিবাসীদের মধ্যে এই সর্বপ্রাণবাদী ভাবনা আসার মূল কারণ হল, নিদ্রা ও তার সঙ্গে স্বপ্ন, এবং নিদ্রারই অনুরূপ মৃত্যুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার যা মানসিক অবস্থা—যার মাধ্যমে তারা নিজেরাও যেমন গভীরভাবে প্রভাবিত হত, তেমনি ভাবে চেষ্টা করত তার ব্যাখ্যা দিতে। সর্বোপরি মৃত্যুর সমস্যাই মনে হয় এই মতবাদ সৃষ্টির আদি কারণ। আদিম মানুষের কাছে জীবন ধারাবাহিক ও অবিনশ্বর। মৃত্যুর ধারণা তাই তার কাছে দ্বিধামন্ডিত। সেটা অকারণ নয়, এমনকি আমাদের কাছেও এখনও পর্যন্ত এটি একটি সারহীন এবং উপলব্ধি বহির্ভূত বিষয়। মৃত্যুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে স্বপ্ন, প্রতিরূপসমষ্টি, ছায়া, প্রতিফলন প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও তাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সর্বপ্রাণবাদের মূল ধারণ। ('টোটেম ও টাবু' : সিগমুন্ড ফ্রয়েড ; বঙ্গানুবাদ : ধনপতি বাগ, কলকাতা ; ১৯৯৩। পৃ. ৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য)

'মানুষ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে নিজেই দেখছে যে, সে এটা করছে, ওটা করছে, এখানে-ওখানে যাচ্ছে। তাহলে নিশ্চই বুঝতে হবে যে সে একজন নয়, দুজন ; কারণ, একজন 'সে' তো দ্বিতীয় 'সে'-কে 'প্রত্যক্ষ' করছে। এই অনুষঙ্গেই মৃত মানুষের এবং পশুপাখির সত্তার বিষয়েও একটা কল্পনাসঞ্জাত বোধের উদ্ভব হয়েছে। যে-মানুষটা ধরা যাক, ডুবে গেছে হ্রদের জলে কিংবা মরে গেছে সাপের কামড়ে, তাকে আবার কী করে স্বপ্নের মধ্যে দেখা যায়, যেখানে সে চলছে ফিরছে কথা বলছে কাজ করছে! তবে তো তার আরও একটা অস্তিত্ব আছে! ঠিক এভাবেই মরে-যাওয়া পোষা কুকুরটা কিংবা শিকার করে আনা এবং আগুনে ঝলসে খেয়ে ফেলা জন্তুটাও যখন স্বপ্নের মধ্যে ফের দেখা দিল, তাহলে তো তখন মেনে নিতেই হবে যে, তারও একটা আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে।" (লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ : পল্লব সেনগুপ্ত : পৃ: ৫১)

যেহেতু সর্বপ্রাণবাদের ধারণা সব সময়ে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই রকম হতে পারে বলে দেখানো হয়েছে। সেই সূত্রে আই. সি. ভুগু বলেন যে, এগুলি 'অতিকথা-সংগঠনী সচেতনা'র আবশ্যিক মানস বিষয়বস্তু এবং আদি সর্বপ্রাণবাদের উৎস থেকে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার আধ্যাত্মিক প্রকাশ। অবশ্য দার্শনিক হিউম ভুগুর আগেই তাঁর 'Natural History of Religion' গ্রন্থে নির্জীবের মধ্যেও যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, সে কথা বলেছিলেন।

ফ্রয়েডের মতে সর্বপ্রাণবাদ হল একটি চিন্তাধারা। এটা যে কেবল একটিমাত্র বিষয়েরই ব্যাখ্যা দিতে পারে তা নয়। এই চিন্তাধারা, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীকে সামগ্রিভাবে, নিরবচ্ছিন্নরূপে দেখতে সাহায্য করেছে। কালক্রমে এরূপ তিনটি চিন্তাধারা, তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ব চিন্তাধারার সৃষ্টি করে—সর্বপ্রাণবাদ (পৌরাণিক), ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রাণবাদই প্রথম। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ। এই মতবাদ আমাদের ক্ষেত্রের গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবে আজকের দিনের জীবনেও এর প্রভাব কতদূর প্রতিপন্ন করা যায়। এর অকিঞ্চিৎকর উদ্‌বর্তন রয়েছে আমাদের কুসংস্কারে, ভাষার ভিত্তিতে, আমাদের অন্ধবিশ্বাসে ও আমাদের দর্শনশাস্ত্রে। তাই বলা যায়, সর্বপ্রাণবাদ নিজে ধর্ম হিসেবে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু তার উপাদানগুলি দিয়েই পরে ধর্মমত গড়ে উঠেছে। পুরাণ বা অতিকথা যে সর্বপ্রাণবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পুরাণ ও সর্বপ্রাণবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমন অনেক বিষয় আছে যার ব্যাখ্যা আজও হয়নি।

জেমস ফ্রেজার, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের মতে, মানুষ যে কেবল জ্ঞানতৃষ্ণাবশত তার চিন্তার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বচিন্তা শুরু করে তা নয়, বরং মানুষের, পশুর, বস্তুর, এমনকি প্রেতাত্মার উপর প্রভুত্ব করার বাসনায় নিজস্ব শক্তির উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। এস. রেইনাক এই পদ্ধতিগুলিকে—সেগুলি জাদু ও ইন্দ্রজাল নামে প্রচলিত—সর্বপ্রাণবাদের রণকৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। ['টোটেম ও টাবু' : পূর্ববৎ ; পৃ. ৬৫ দ্রষ্টব্য]

জাদুবিদ্যা (Sorcery) হল, মানুষের প্রতি ব্যবহারের মতোই প্রেতাত্মাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত করার কলাকৌশল। আর ম্যাজিক হল সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। ম্যাজিক মূলত প্রাকৃতিক কার্য-প্রক্রিয়াকে মানুষের ইচ্ছার বশবর্তী করে। ব্যক্তিকে তার শত্রু ও বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং ঐ ব্যক্তিকে তার শত্রু নিধনের জন্য শক্তি যোগায়। কিন্তু ম্যাজিকের মূল নীতিগুলি অতি প্রাচীন আর খুবই স্পষ্ট। ই. বি. টাইলরের মতে, ম্যাজিক হল 'একটি কাল্পনিক যোগসূত্রকে আসল বলে ভুল করা।' শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্য ম্যাজিকের একটা খুব প্রচলিত পদ্ধতি হল, কোন বস্তু দিয়ে ঐ শত্রুর একটি প্রতিকৃতি তৈরি করা। মূর্তির সাদৃশ্য থাকলেও হয় না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে-কোন বস্তুকেই তার মূর্তি বলে 'নামকরণ' করলেই হল। এই প্রতিমূর্তির প্রতি পরে যেরূপ ব্যবহার করা হবে ঠিক সেই রকমই ঐ ঘৃণিত শত্রুর ক্ষেত্রে ফলবে। ফ্রেজারের মতে এইরকম ম্যাজিকের নাম অনুকরণপ্রিয় বা হোমিওপ্যাথিক। যেমন, বৃষ্টি চাইলে এমন কিছু আচারভিত্তিক অনুষ্ঠান করা হয় যা বৃষ্টির মতো দেখতে হবে বা বৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পরবর্তীস্তরে এই ম্যাজিকের যাদুমন্ত্র প্রয়োগের বদলে দেবতার মন্দিরে শোভাযাত্রার প্রচলন হয়েছে। যাতে ঐ দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং বারি বর্ষণ করেন। ফ্রয়েডের মতে, "আরো পরে এই ধর্মপ্রক্রিয়া ত্যাজ্য হবে এবং তার পরিবর্তে অনুসন্ধান চলবে, কী করে বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে বৃষ্টি ঘটানো যায়।" (টোটেম ও টাবু : পূর্ববৎ, পৃ. ৬৮]

ম্যাজিক ক্রিয়ার অন্য পর্যায়টিতে এই সাদৃশ্যের নীতি অনুসৃত হয় না ; পরিবর্তে ঐ পর্যায়ের আচারগুলিতে সম্পর্ক বা সম্বন্ধের প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে শত্রুর চুল, নখ কিংবা সে ফেলে দিয়েছে এমন যে কোনো জিনিষ, এমনকি তার পোষাকের যে-কোনো অংশ সংগ্রহ করে, সেইগুলির ওপর অনিষ্ঠকর

কোন ইচ্ছার প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন আচারের মাধ্যমে, সেগুলি হল ম্যাজিক ক্রিয়া তাতে মন্ত্রও থাকে এবং কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ ক্রিয়া থাকে। উদ্দিষ্ট লোকটিকে সশরীরে আয়ত্তে পেলে ম্যাজিক ক্রিয়া যতটা কার্যকরী হত, এই প্রক্রিয়াতেও ঠিক তেমনই কাজ হবে এবং ঐ ব্যক্তির ব্যবহৃত বা অধিকৃত যে কোন বস্তুর ওপর যেমন ব্যবহার করা হবে, ঐ লোকটির কপালে ঠিক সেই রূপটিই ঘটবে, এরূপই বিশ্বাস। অতএব, এখানে কোন ব্যক্তি বা প্রেতাত্মার নামটিই আসল। ঐ নামটি নিয়েই নামের মালিকের ওপর জোর খাটানো যাবে। এর থেকে পরে নামের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য সাবধানতা ও সংযমের তাৎপর্য রয়েছে, যা টাবু ক্রিয়া রূপে পরে গণ্য হয়।

সুতরাং, জাদু ও ধর্ম এই দুটি সংস্কারেরই আদিরূপ 'মান্যা'র মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ 'মান্যা' হল এই দুই বিশ্বজনীন সংস্কারের প্রাথমিক উৎস। মান্যা-কেন্দ্রিত সর্বপ্রাণবাদ হল 'চিন্তার সর্বশক্তিময়তা', অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছাই এখানে শক্তির উৎস। ইচ্ছা করলেই আমি প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে পারি বা অন্যের উপকার বা অপকার করতে পারি তা সে যেখানেই থাকুক ; জড়সত্তাবাদ বা অ্যানিমেটিজম-ও তাই, আমি মনে করি সবের প্রাণ আছে জড় বস্তুরও আত্মা আছে—অতএব আছে। এই অ্যানিমিজম ও অ্যানিমেটিজমকে 'মান্যা'র চিন্তায় মোটামুটি তিনটি প্রকরণে ভাগ করা যায়—

১. জড়বস্তু এবং নিসর্গ ব্যাপারগুলির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সজীব শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস।

২. মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় একটি / একাধিক সত্তা কিংবা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস।

৩. অনির্দেশ্য-কিছুর মধ্যে অবলীন-থাকা কতকগুলি অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস।

এই তিনটি প্রত্যয়ের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে সর্বপ্রাণবাদ। জড়বস্তু এবং নিসর্গব্যাপারগুলির অন্তর্বাসী শক্তিগুলির বিষয়ে আদিম মানুষের ধারণার স্বরূপকে অনুধাবন করতে পারলে এর প্রারম্ভিক পর্য্যায়টিকে (মান্যা) চেনা যায়। যথা—জ্বলন্ত আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাওয়ার কারণ আদিম মানুষের মতে, আগুনের ভিতরে থাকা 'মান্যা' হাতে কামড়ে দিল। ঝড়টার 'মান্যা' ঐ গাছটার 'মান্যা'র চেয়ে বেশি জোরালো। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে, অর্থাৎ কোন এক অজানা 'মান্যা' এসে আক্রমণ করছে ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি সম্ভাব্য ঘটনার প্রকৃত কারণটা কী তাই বুঝতে চেষ্টা করার সূত্রেই 'মান্যা'-'ওরেণ্ডা'-'ওয়াকান্দা'-'মানিটু'-'বারাকা'—ইত্যাদি অলখ্য সমস্ত নির্দেশ্য-অনির্দেশ্য সত্তাময় শক্তির কথা কল্পনা করেছে মানুষ। প্রকৃতির বিচিত্র সব রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর সৃষ্টি, যার থেকেই পরবর্তীকালে উদ্ভব 'মিথ'-এর। সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে তাই 'মান্যা'র উদ্ভব একথা মানতেই হয়।

ধর্মাচার ও ধর্মসংস্কারের অনুসূত্রে "এই-এই কাজ করতে বাধা নেই" বা "এই-এই কাজ করতে বাধা আছে" বা "করতে নেই"—এমন সব ভাবনার উৎসও সামাজিক ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই 'বাধা-থাকা' বা 'করতে নেই' 'খেতে নেই' ইত্যাদি ভাবনাগুলিই হল 'ট্যাবু', যা বহুসময়েই আবার 'টোটেম' বা কুলকেতুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রহস্যময় সম্বন্ধের যে-ধারণা, তার অনুষঙ্গবাহী।

আসলে মান্যা-জাদু-দেবতা-ট্যাবু-টোটেম-প্রেত ইত্যাদি সম্পর্কগুলো পারস্পরিক টানাপোড়েনের বুননে একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা সর্বপ্রাণবাদের আলোচনাতেই দেখেছি সমস্ত ধারণার উৎস কিন্তু ঐ

সর্বপ্রাণবাদ বা জড়সত্তাবাদেই নিহিত। আর সকলের উপরে রয়েছে আদিম মানুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যা অনেকটা মনস্তত্ত্বের বিষয়, এবং ব্যক্তিমনের ধারণা বা বোধ যেটা চৈতন্যের নানান মাত্রায় সজ্জিত থাকে, তার প্রকাশ কিন্তু আদিম মানুষ গোষ্ঠীকেন্দ্রিকভাবেই করতেন। গোষ্ঠীমনের উপলব্ধি রূপে এই ধারণাগুলির বহিঃপ্রকাশই সমাজবিবর্তনে নানা বিধিনিষেধের সৃষ্টি করেছিল একদিকে, তেমনি তৈরি করেছিল জাদুশক্তির ব্যবহার আবার টোটেম প্রথার উৎপত্তিও সেখান থেকে।' ('লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' : পূর্ববৎ পৃ. ৫০)

ঐ গ্রন্থে এই ব্যাপারটিকে একটি ছকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মতে, "মান্যা-ভাবনার থেকে মোটামুটি সমান্তরালভাবেই উৎসারিত হয়েছে জাদু এবং দেবতার ধারণা। কিন্তু প্রকৃতির ওপরে জাদুর কল্পিত-শক্তির মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করা যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যখন তা যায়, তার অবশ্যই কিছু-না-কিছু কার্যকারণ থাকে), এটা যখন থেকে মানুষ বুঝতে শিখল, তখন থেকেই দেবতার বিষয়ে এমন একটা ভাবনারও সৃষ্টি হল তার মনে যে, দেবতা তার ভাল-মন্দ বিহিত করতে পারবেন। যে-মান্যাকে 'সংযোগসাধ্য মৌলশক্তি' (আর. আর. ম্যারেট), কিংবা "সামাজিক জীবনের আদি অধিশাস্তা" (এমিল দুর্খেইম) বলে ধার্য করা হয়, তার পক্ষে দেবতায় বিবর্তিত হয়ে গাছপালা-প্রাণী-নদী-অরণ্য পর্বতের রূপে প্রতিভাত হওয়াটা কী আর এমন অস্বাভাবিক!

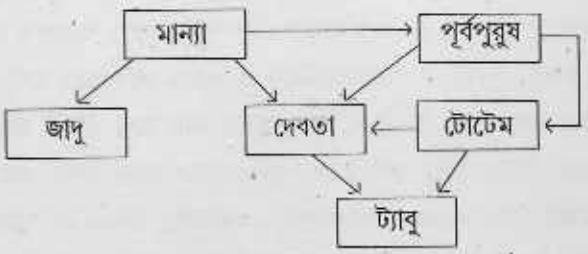

সেই কথারই সূত্রে প্রাসঙ্গিক এই রেখাচিত্রটি অনুধাবন করলে মান্যা, দেবতা, পূর্বপুরুষ, জাদু, টোটেম, ট্যাবু—ইত্যাদির পারস্পরিক সমীকরণ সম্বন্ধে টাইলরের তত্ত্বের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটির তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করা যায় স্বচ্ছন্দেই : ধর্ম হল প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন যে-সমস্ত বিদেহী শক্তির (বা সত্তার) দ্বারা অধিকৃত, আকীর্ণ এবং পরিচালিত বলে মানুষ নিজেকে মনে করে, তার নিজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ; বরং বলা ভাল, প্রতীতি।" [পূর্ববৎ, পৃঃ ৫১-৫২]

এই 'মান্যা'র থেকে আরেকটি জিনিষও পরে উদ্ভূত হয়, তা হল বহুদেবতার ধারণা। 'মান্যা'র আদি উৎসগুলির মধ্যে একটি যে নিসর্গভীতি বা animatism, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই ভয় হল অনির্দেশ্য, অলৌকিক এবং একে জয় করার শক্তি মানুষ পুরোপুরি আজও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। সাপের ভয়, বাঘের ভয় কিংবা মানুষের থেকে অন্য মানুষের ভয়ের থেকে এ ভয় পৃথক। কিন্তু এ ভয়ের রূপও আবার ভিন্ন ভিন্ন নৈসর্গিকতায় ভিন্ন ভিন্ন। আদিম মানুষ ঐ ভয়গুলির পিছনে এক একটি শক্তির কল্পনা করে নিত সর্বদা, সেই শক্তির ভয়াল রূপ ছিল তাদের কাছে অনিষ্টকারী এবং যে রূপ তাদের উপকারে আসত তা কল্যাণকামী। এই রূপগুলি এক না অজস্র—দুটি জিজ্ঞাসারই উত্তর পরস্পর-সম্পর্কিত। নৈসর্গিক ঘটনাবলীর

পিছনে তাদের কল্পিত সংঘটক 'মান্যা'রা অসংখ্য, অজস্র। এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের অধিষ্ঠাতা মান্যাও অনেক। কিন্তু সামাজিক পরিকাঠামোয় সেই অতি-আদিম যুগের সমাজে যেহেতু কোনও একক ব্যক্তির আধিপত্য ছিল না, তাই অনির্দেশ্য ভয়গুলিরও উৎসে একটিই মাত্র 'মহাশক্তি'র অস্তিত্ব কল্পনা করাটাও ছিল অসম্ভাব্য। মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের বাইরে মানুষ কোনও কিছুই কল্পনা করতে পারে না। সুতরাং প্রতিটি নৈসর্গিক শক্তির পিছনে 'মান্যা'দের সংখ্যা ছিল অনেক, অজস্র। আর এই দ্বিবিধ অতিলৌকিক শক্তির কল্পনাই জন্ম দিয়েছে বহুদেবতার ধারণাকে (পলিথীইজ্‌ম)।

এই বহুদৈবিক ধারণার সঙ্গে এসে মিলেছে সর্বপ্রাণবাদের অন্যতর ধারাটি, যেখানে আদিম মানুষ নিজেদের দ্বৈত সত্তার কথা ভেবেছে। মৃত্যুর পরে যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা, প্রেতাত্মার প্রতি এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি উপচার নিবেদন, তাদের পূজা, ক্রমেক্রমে তাদের সঙ্গে পশু-পাখি-লতা-গুল্ম-শস্যকে সমীকৃত ভাবা (টোটেমবাদ) সমস্ত ব্যাপারগুলো আবির্ভূত হয়েছে। এর পিছনে আগেও বলেছি একটি ব্যাবহারিক কারণ ছিল, তা হল খাদ্য, নিরাপত্তা, ভয়বিমুক্তি ইত্যাদির সংস্থান করা। মান্যাদের তুষ্ট রাখতে পারলেই প্রকৃতির রোষের হাত থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে, খাদ্যলাভে বাধা আসবে না, রোগমুক্তি, ভয়মুক্তি ঘটবে, যৌনতৃপ্তি ও সন্তানপ্রাপ্তি হবে ; ফলত : মানুষ আরো বেশি করে পূজা-পার্বণ, আচারবিধি তৈরি করতে থাকে এবং মান্যারা দেবতায় উত্তীর্ণ হয়। প্রথমে আগুন, বাতাস, জল প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর পূজা বা তার মান্যাকে সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়, পরে ধীরে ধীরে পশু ও পশু-মানুষের মিশ্ররূপ এবং অবশেষে মানবীয় অবয়বে তাদেরকে ভাবা হতে থাকে। এক একটি দেবতা বা দেবতাগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে ধর্মধারা বা কাল্ট এবং অলৌকিকের ধারণার একাংশের সঙ্গে দেবতা কল্পনা মিশে গেল। আর অন্য একটি অংশের সঙ্গে কোন ধর্ম সম্পর্ক রইল না, সেটিই হল জাদু বা ম্যাজিক। এই সম্পর্কগুলি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিশেও গেছে ফলত চিন্তার জটিলতা সৃষ্টি করেছে। "জাদুর সূত্রে 'শামান্‌ইজম্' (ওঝাতন্ত্র), টোটেমের সূত্রে 'ক্ল্যান' ('গোত্র' বলা যেতে পারে) ও বহির্বিবাহ এবং ট্যাবুর সূত্রে কৃত্য-অকৃত্যের ক্রমবর্ধমানতা মানুষের সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে ফেলল। এই পরিবর্তন সুদীর্ঘকাল ধরে ঘটেছে ; সমস্ত সমাজেই এটা ঘটেছে ; সমস্ত সমাজেই এটা অবশ্য একসঙ্গে ঘটেনি এবং সেই অ-সমবিবর্তনের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ ছিল আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন। শামান্ বা ওঝার আয়ত্তগত জাদুবিদ্যা তাকে অন্যদের চেয়ে সুবিধাভোগী করেছে। টোটেম-ট্যাবু-ঘটিত বহির্বিবাহ (এক্সোগ্যামি) কৌমসমাজকে ক্রমবর্ধিত করে 'জাতি' হবার পথে নিয়ে গেছে। কৃত্যাকৃত্যের ধারণাগত পাপ-পুণ্য ইত্যাদির বোধ ধর্মীয় সংহিতার (রিলিজিয়াস কোড) পত্তন করেছে তারই পাশাপাশি। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেয়-অশ্রেয়ের সঙ্গে ধর্মীয় অনুভাবনারও স্যংমিশ্রণ ঘটেছে। ধর্ম এবং তার ধারকরাই ফলত প্রবল হতে শুরু করেছে সর্বত্র।

এরই অনিবার্য লব্ধফল : পুরোহিত-প্রধান সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।" (পূর্ববৎ পৃ. ৫৪-৫৫)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 'মান্যা'গুলি মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে সৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে সেগুলি ধর্মীয় অনুশাসনের নাগপাশে মানুষকেই বেঁধে ফেলেছে। পাশাপাশি জাদুবিদ্যার ধারাটিও ব্যবহারিক দিক হারিয়ে ওঝাদের রুজি রোজগারের উপায় হয়ে উঠেছে মাত্র। প্রাথমিকভাবে চিত্রকলা (যেমন, গুহাচিত্রগুলি, অনুকরণমূলক জাদুবিদ্যার ফসল), ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, এমনকি মৌখিক সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছিল মূলত মান্যাদের তুষ্ট করার

জন্য অথবা প্রকৃতির উপর নিজেদের বিজয় উৎসব ঘোষণা করার জন্য। সুতরাং ধর্ম ও জাদু দুই ধারা একসঙ্গে মান্যা কল্পনা থেকে নির্গত হয়ে সংস্কৃতির প্রকরণগুলিকে রূপায়িত করত। মান্যাকেন্দ্রিক সমাজে যেহেতু একনায়ক ভাবনা গড়ে ওঠেনি, তাই গড়ে ওঠেনি কোন একেশ্বর মতবাদ এবং পুরোহিত প্রাধান্যও তখন ছিল না, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে শ্রেণীভেদের তিক্ততাও ছিল না, কিন্তু এ সবেরই উৎসটুকু সৃষ্টি হয়েছিল সেযুগেই 'মান্যা' কল্পনার মাধ্যমে। (ঐ, পৃঃ ৫৪-৫৫)

ম্যাজিক বা জাদুর উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে এবং তার দুটি ভাগের কথা আমি আগেই সর্বপ্রাণবাদ আলোচনার সূত্রে বলেছি। 'ম্যাজিক' হল গ্রিক 'ম্যাজাই শব্দের বিবর্তিত রূপ। আদিম মানুষের ধারণায় প্রত্যেক বস্তু এবং ঘটনার অন্তরালেই আছে কোন না কোন জাদুশক্তি—এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের নানান অভিব্যক্তিই ধর্মবিশ্বাস, আচার, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি গড়ে ওঠার পিছনে সক্রিয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। যে কোনও ধরণের অলৌকিকতার প্রতি আস্থা রাখার পিছনেই আছে মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আদিম জাদুবিশ্বাস। এই বিশ্বাস আসে মূলত দুর্বলতা থেকে এবং দুর্বলতা সৃষ্টি হয় অসহায়বোধ থেকে। মানুষ যখনই কোন ঘটনার বা বস্তুর বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না, তখন অলৌকিকের ভরসায় চলে যেতে চায় এবং এখান থেকে জাদুর উৎপত্তি। তাই জাদুর জয় বর্তমানেও চলছে সমানতালে। শিক্ষা, সংস্কৃতির পরিশীলন ও বিজ্ঞানের পরিশীলন কিছুই ঐ জাদুপ্রত্যয়কে মন থেকে উৎপাটন করতে পারে না।

জাদু তথা জাদুকরদের অস্তিত্বের সবচেয়ে প্রাচীন যে হদিশ পাওয়া যায় তাও প্রায় ২৫,০০০ বছরের পুরোন। ফ্রান্সের পিরেনিজ পর্বতমালার আরীজ অঞ্চলে 'তিন ভাই' (ত্রোয়া ফ্রের) নামের একটি গুহায় এক নৃত্যরত মূর্তির ছবি আঁকা আছে দেওয়ালের গায়ে। মূর্তিটির মাথায় বল্গা হরিণের শিং, দাড়িওয়ালা মুখে পেঁচার মুখোশ, পিছনে নেকড়েজাতীয় কোনও প্রাণীর লেজ, হাত দুটি মুঠো করে ভালুকের থাবার মত ভঙ্গীতে জড়ো করে রাখা এবং দুটি পা এবং পুরুষাঙ্গটি স্বাভাবিক মানুষের মতই। গুহাচিত্রকলার প্রবীণতম পন্ডিত অ্যাবে ব্রুইল তাঁর 'ফোর হানড্রেড সেনচুরিজ অব কেভ আর্ট' বইতে এই মূর্তিকে জাদুকরের বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যা সূত্রে তিনি বলেছেন, ওই সব উপকরণ এবং ভঙ্গিমার মাধ্যমে আদিমকালের লোকপৌরাণিক (মিথিক) কোনও দেবতার মূর্তিতে সেজে, অলৌকিকতার সংস্কার-সঞ্জাত একটা কিছু জাদু-অভিচার সাধন করা হচ্ছিল যে, তারই প্রমাণ ঐ ছবির মাধ্যমে মেলে। (লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ : পূর্ববৎ ; পৃ ৫৭)

এমন উদাহরণ আজও পাওয়া যায় রেড ইন্ডিয়ান বা আফ্রিকার আদিম অরণ্যবাসীদের সমাজে। জাদুক্রিয়া করে নাচ করার সময়ে তারা পশুর ছদ্মবেশ ধরে বা বিশেষ ভঙ্গিমা করে যা অনুকরণাত্মক। আমাদের দেশে দিনাজপুরের 'মুখাখেল' হল পোল্যে সম্প্রদায়ের মুখ্য গুনিনদের নৃত্য। তাঁরা বাঘ, ভালুক, নরসিংহ প্রভৃতির মুখোশকে মন্ত্রঃপুত করে নিয়ে, যথাযোগ্য আচার মেনে ধারণ করে তারপর জাদু ক্রিয়াত্মক এই নৃত্যানুষ্ঠান করেন, তা না হলে এঁদের বিশ্বাস ঐ জন্তুগুলি স্বমূর্তি ধারণ করে নর্তককেই হত্যা করে। এই ধরণের ভাবনার উৎস থেকেই ধর্মবিশ্বাস বিবর্তিত হয়েছে।

স্যর জেমস ফেজার 'গোলডেন বাও' (১৯১০) গ্রন্থে যে জাদুক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছেন, সেটি প্রকরণগত ভাগ :

১. অনুকৃতিমূলক (সিমপ্যাথেটিক / হোমিওপ্যাথিক)

২. সংস্পর্শমূলক (কনটাজিয়াস)

অন্য কিছু সমাজবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা আবার ভাবগত দিক থেকেও জাদুকে দুভাগে ভাগ করেছেন :

১. শুভকারী (হোয়াইট ম্যাজিক)

২. অশুভকারী (ব্ল্যাক আর্ট)

এদের আবার দুটি ভাগ—

১. প্রবর্তক (পজিটিভ বা ইনসপিরেটিভ)

২. নিবর্তক (নেগেটিভ বা প্রিভেনটিভ)

নিচের ছকটি থেকে বিভিন্ন জাদুর পারস্পরিক সম্বন্ধটি ধরা যায়

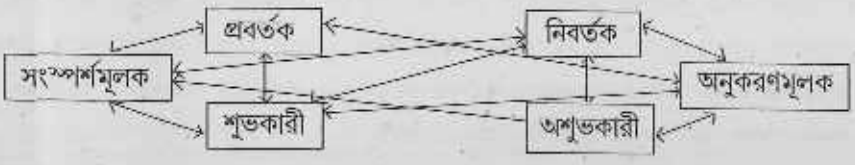

অনুকৃতিমূলক জাদুর ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গুহাচিত্রগুলিতে এবং বাংলার মেয়েলি ব্রতগুলির আলপনায় ও আচার পালনের মধ্যে। গুহাচিত্রগুলিতে প্রায়ই শিকারের ছবি আঁকা হতে দেখা যায়, যেমন, হরিণ শিকারের ছবি, বাইসন শিকারের ছবি, শিকারের পর আনন্দ-উচ্ছ্বাসমূলক নাচের ছবি এবং শিকার করার আগে আচারপালনভিত্তিক নাচের ছবি ইত্যাদি। শিকারের ছবি এঁকে শিকারে বেরোলে যে পশুটির ছবি আঁকা হয়েছে এবং যতগুলি সংখ্যায় আঁকা হয়েছে ততগুলি শিকারই পাওয়া যাবে—এ বিশ্বাস থেকেই এই অনুকৃতিমূলক জাদুর সৃষ্টি। আলপনাগুলিতে দেখা যায় ধানের ছড়া, ধানের গোলা, ঘরবাড়ি, গহনা, পুকুর আঁকা হয়, এই বিশ্বাসে যে, ঐ বস্তুগুলি নির্দিষ্ট ব্রতপালনের পর ঘরে আসবে বা ব্রতিনী ও তার সংসার সেগুলি পেয়ে সুখী হবেন ইত্যাদি কামনায়। এর সঙ্গে থাকে ব্রতের উপচারগুলি, যেমন—সিঁদুর, কলা, হলুদ, পান, সুপুরি, চাল, বাতাসা, ফুল ইত্যাদি ; থাকে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ ও কিছু অবশ্যপালনীয় বিধি। যেমন—স্নান, উপবাস ইত্যাদি। এই সবই জাদুশক্তির সঞ্চার করার জন্যই করা হয়। যাতে দেবতার আড়ালে যে 'মান্যা' আছে, তা সন্তুষ্ট হয় এবং পিটুলিগোলায় আঁকা ছবিগুলি বাস্তবে মেলে।

সংস্পর্শমূলক জাদু আদিম জাতিদের মানুষের মাংস খাওয়ার অভ্যাসে দেখা যায় যা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। কোনো ব্যক্তির শরীরের কোনো অংশ ভক্ষণ করে তার সেই অংশের গুণগুলি অর্জন করাই হল উদ্দেশ্য। এর থেকেই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় খাদ্য সম্পর্কে বাছবিচারের সৃষ্টি। যেমন, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এমন কোন প্রাণীর মাংস খাবে না, যাতে ঐ প্রাণীর অবাঞ্ছনীয় ধর্মগুলি, যেমন কাপুরুষতা, ইত্যাদি গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়। যদি কোন মেলানেশীয়াবাসী কোনো ধনুকের দ্বারা আহত হয়, তাহলে সেই ধনুক সংগ্রহ করে তা ঠাণ্ডা জায়গায় সন্তর্পণে রক্ষা করে থাকে, যাতে তার আহত স্থানের ক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা কম থাকে। কিন্তু কোন শত্রুশিবিরে ধনুকটি নিয়ে গেলে সে অবশ্যই সেটিকে আগুনের খুব কাছে রাখবে যাতে তার শত্রুর আহত স্থানের যন্ত্রণা বাড়ে।

প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রেও দেখতে পাই। মানুষ হরিণের শিং, ছাল ইত্যাদি গায়ে-মাথায় চাপিয়ে তার অঙ্গভঙ্গী ও স্বর নকল করে বনের মধ্যে নাচছে। এর মধ্যেকার জাদুবিশ্বাস খানিকটা অনুকরণমূলক হলেও বাকিটা সংশ্রবমূলক। ঐ হরিণের শিং-ছাল ইত্যাদির সংস্পর্শে থাকার ফলে নতুন একটা হরিণও ঐ বস্তুগুলির অন্তর্লীন অতিলৌকিক ক্ষমতার বলে শিকারী নর্তকের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে—এটাই হল কামনা।

দ্বিতীয় ভাবনা অনুযায়ী শুভকারী ও অশুভকারী জাদুর কথাও আগে কথাপ্রসঙ্গে এসেছে। ব্রনিশ্লউ ম্যালিনৌস্কি তাঁর 'ম্যাজিক, সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজন' গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভারতীয় বিচারে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদির পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে, সেটি শুভকারী জাদুবিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছে। বৃষ্টি নামাতে বা ফসল ফলানোর জন্য, যুদ্ধ জয়ের জন্য, বিত্ত অর্জনের জন্য, আহার্যের সুবন্দোবস্তের জন্য, রোগ নিরাময়ের জন্য এই জাদুর প্রয়োগ ঘটানো হয়। বর্তমানেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পূজা আচার-এর ব্যবস্থা করার উৎসগত কারণ এই জাদুবিশ্বাসই। ফসল ফলানো বা বৃষ্টি আনার জন্য যে জাদু, সেগুলি প্রায় সবই উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস, তাই এরূপ অনেকগুলি জাদুর ক্ষেত্রে প্রতীকী দেহমিলন ঘটার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যাতে ঐ মিলনের ফলে উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে, বৃষ্টি আসবে, ফসল ফলবে এরূপ ধারণা করা হয়ে থাকে। এই কারণে ফসল ফলানোর জন্য শস্যদেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টায় গোষ্ঠীবদ্ধ নাচ-গান—ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করবার পর, কোনও কোনও সমাজে শস্যক্ষেত্রকে অবাধ রতিক্রিয়া প্রদর্শনের আচারবিধিও রয়েছে। এই প্রকার আচার-বিধিগুলি পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসেই মেলে। বৃষ্টি আনা ও ফসল উৎপাদনের অনুকরণমূলক ও সংস্পর্শভিত্তিক জাদুগুলি পৃথিবীর সমস্তদেশেই একই চেহারায় বিদ্যমান। আদিবাসী সমাজ মূলত যৌন-বিষয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল হলেও, এক্ষেত্রে এই বিশেষ ছাড়পত্র কেবল জাদুর সাফল্য ঘটানোর কারণে। এই রকমই আরেকটি আচারবিধি রয়েছে উত্তরবঙ্গের হুদুমদেও-এর পূজায়। এই সময় গ্রামশুদ্ধ মেয়েরা অন্ধকার রাতে মাঠে গিয়ে বসনমুক্ত অবস্থায় নাচ-গান-ইত্যাদি করেন। পরে গ্রাম পরিক্রমা করে ভোররাতে মাঠে গিয়ে পোষাক-আশাক পরার পর ঘরে ফেরেন। এই সময়টুকুতে গ্রামের কোনও পুরুষ ঘরের বাইরে বেরোন না। হুদুম-দেবতার সঙ্গেই যেন এই মেয়েদের একটা প্রতীকী সংরাগের ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং এই প্রথাটি আপাতভাবে ধর্মধারা বা কাল্ট-জাত বলে মনে হয়।

অশুভকারী জাদুগুলি শুভকারী জাদুর সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত। কারণ শত্রুর অমঙ্গল চাওয়ার পরই মানুষ নিজের মঙ্গলের বিষয় সতর্ক হয়। মারণ-উচটিন অভিচার ইত্যাদি অশুভকারী জাদু, যার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে 'কৃত্যা' এবং 'যাতু' রূপে পরিচিত। ডাকিনিবিদ্যা বা পিশাচবিদ্যা এর থেকেই সৃষ্ট অথবা পূর্বেই এগুলি আদিবাসীদের মধ্যে ছিল পরে তা বৈদিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। 'যাতু' কথাটি 'জাদু' কথার সমার্থক। সেক্ষেত্রে দুটির মধ্যেকার একটি বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে এ কথা ভেবে নেওয়াই যায়।

এমন রাশি রাশি ম্যাজিকের ক্রিয়াকলাপ আছে যেগুলি একই রকম উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। এগুলি আদিম জাতির জীবনে সব সময়ই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে এবং ক্রমোন্নতির উচ্চস্তরে পুরাণ ও ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আংশিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। যেমন, রূপকথা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তি-প্রায় সমস্ত পর্যায়ের লোককথাতেই অলৌকিকতার যে বিপুল গুরুত্ব, তার বৃহত্তম উপকরণ হল জাদু। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়ানো বা জাগানো, রাক্ষসীর প্রাণ থাকে সাগরের নিচে রাখা কৌটোর মধ্যে

আটকানো ভোমরার মধ্যে, ডাইনির জাদুতে মানুষ পাথরে পরিণত হয় ; পশু এবং মানুষ পরস্পরের চেহারা ধারণ করতে পারে ; জাদু-তরবারির আঘাতে রাক্ষসের লোহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়—এই সব মোটিফ সব দেশের রূপকথাতেই আছে। সিণ্ডেরেলার গল্প, দুঃখী রাজকন্যার মুখ থেকে বুড়ির জাদুর জোরে হিরে মানিক ঝরা আর তার সঙ্গেই রাজপুত্রের বিয়ে, অন্যদিকে উদ্ধত সুখী রাজকন্যার মুখ দিয়ে সাপ ব্যাঙ বেরোতে থাকে আর তার বরই তাকে অজগর রূপে গিলে খায়।

এই জাদুর প্রভাব রয়েছে মানুষের সমগ্র সংস্কৃতিক ইতিহাসে। জাদুর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোন মিল না থাকলেও লোকচিকিৎসা, ওঝা বা শামানদের রমরমা, লোককথার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অলৌকিকের জয়জয়কার মানুষের মনে এই জাদুর প্রভাবকে গভীর থেকে গভীরতরভাবে গেঁথে দিয়েছে। ধর্ম এবং শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব সেই পাথরের মত জমে যাওয়া বিশ্বাসকে আরও মজবুত করেছে, এবং তার ওপরই নির্ভর করে ও তাকে ভাঙিয়েই গড়ে তুলেছে তাদের আধিপত্য।

এবার *'টোটেম'* এবং *'ট্যাবু'*-র আলোচনা। 'টোটেম' শব্দটি রেড ইণ্ডিয়ান জাতিকোম-দের থেকে ধার করা এবং 'ট্যাবু' শব্দটির উৎস পলিনেশিয়া। 'টোটেম' শব্দটির উৎসগত শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞাতি'। এই সূত্রেই 'ওটোটেমান' (রেড-ইণ্ডিয়ান শব্দ) কথাটির অর্থ 'রক্ত-সম্পর্কের নিকট আত্মীয়', অন্যদিকে 'নটোটেম' (অ্যালোনকুইয়ান শব্দ) কথাটির অর্থ 'আমার আত্মীয়' এবং ক্রী-ইণ্ডিয়ানদের উচ্চারণে 'ওটোটেমা' মানে ঐ একই : 'আমার আত্মীয়'।

ট্যাবু' শব্দের মূল অর্থ 'নিষিদ্ধ', যদিও এটি পলিনেশিয়ান অর্থ নয়। সেখানে এর অর্থ ছিল 'নোংরা' বা 'অপরিচ্ছন্ন'। শব্দ দুটির ধ্বনিগত উৎস যা-ই হোক না কেন এদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যবাহী সংস্কারটি বিশ্বজনীন।

'টোটেম' সংস্কারের মূল কথা হল কোনও একটি পশুকে গোষ্ঠীর আদি প্রবক্তা হিসেবে ধরে নিয়ে তার পূজা করা। কিন্তু পশু (বা ফুল-ফল) এভাবে পরম পবিত্র হয়ে বিশ্বজনীন হয়ে উঠল কি করে তাও একটি প্রশ্ন। এর উত্তরে বলা যায় 'সর্বভূতবাদ' যা একটি আন্তর্জাতিক ধারণা ও তত্ত্ব তার থেকেই 'টোটেম'-এর ধারণাটি এসেছে। সমস্ত আদিম জাতি উপজাতিদের ক্ষেত্রেই এই তত্ত্ব খাটে। তাই 'সর্বপ্রাণবাদ' থেকে সৃষ্ট এই 'টোটেম' ধারণা আদিবাসী কৌম সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'মান্যা'র ধারণা আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু সেই 'মান্যা' কিভাবে টোটেমে পরিবর্তিত হল, তা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে 'টোটেম' ধারণাটি এসেছে যে পূর্বপুরুষের ধারণাটি থেকে, তার মূলতত্ত্ব কি ? মানুষ মৃত্যু সম্বন্ধে ভীত হল তখনই যখন সে দেখল যে মানুষ মরে গেলে নড়েও না, চড়েও না, কথাও বলে না—হঠাৎ একটা মানুষ চলছিল সে কি করে এমন হয়ে যায়! তাহলে এ নিশ্চই মানুষের মধ্যে থাকা দুষ্ট 'মান্যা'র কাজ। এবার এই মান্যাকে কল্পনা করা হল জীবিতকালে লোকটির মধ্যে যে সত্তা ছিল তার সংরক্ষকরূপে। আত্মার ধারণা এভাবেই গড়ে উঠল। তাকে তুষ্ট করার জন্য শুরু হল পূজা অর্থাৎ আত্মা দেবতায় উন্নীত হল। পশুর 'মান্যা' এবং আত্মার 'মান্যা' যেহেতু একই রকম কাজ করে, তাই ধীরে ধীরে পশু এবং পূর্বপুরুষের আত্মা-বিষয়ক ধারণা মিশে গিয়ে পশুই পূর্বপুরুষ—এমন চেতনার উন্মেষ হয়। মৃত পিতা বা পিতামহের বংশধর যেহেতু সবাই, তাই ঐ পশুদেবতাও পিতা পিতামহের তুল্য, তাকে তুষ্ট করলেও খাদ্য

পাওয়া যায় ও অন্যান্য ভয় থেকে মুক্তি ঘটে। এই পর্বেই পশু ও মানুষ মিশ্রিত হয়ে দেবতার কল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—নৃসিংহ, গণেশ ইত্যাদি। প্রাচীন মিশরের প্রায় সব দেবদেবী, যেমন—বাজপাখির মুখওয়ালা হোরাস, শেয়ালের মুখওয়ালা আনুবিস, জলহস্তীর মুখওয়ালা ও দেশের ষষ্ঠী দেবী 'ট্-আউরেট' ইত্যাদি। অন্যান্য সংস্কৃতিতেও এই একই প্রকার ধারার পুনরাবর্তন দেখি। (লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ ; পূর্ববৎ ; পৃ. ৭০, ৭১ দ্রষ্টব্য)

এর পরের স্তরে দেবতা হয়ে গেছে পুরোপুরি মানবদেহী, পশু হয়ে গেছে তার বাহন। এই পর্যায়েই গোত্র ধারণার উদ্ভব। পশুর নাম ব্যবহৃত হলেও তাকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মুনি-ঋষি। যেমন—ভরদ্বাজ (ঈগল বা বাজ), কাশ্যপ < কুশিক (পেঁচা), ধন্বন্তরী (রাজগোখরো), গৌতম (গরু) ইত্যাদি। নাগ, বাঘ, হাতি, সিংহ—প্রভৃতি পদবী হল এর পরবর্তী বিবর্তন। ঠিক এমনই বিবর্তনের ইতিহাস পাই বিলিতি পদবী উল্‌ফ, ক্রো, ফক্স-প্রভৃতি পদবীর উৎসরূপে।

এই টোটেম ভাবনা থেকে বিশ্বজনীন দুটি ট্যাবুরও উৎপত্তি হয়েছে। যথা ১. রক্তপাত ঘটানো এবং ২. পারস্পরিক যৌন সম্পর্কস্থাপন করা। প্রাথমিকভাবেই রক্তভীতি থেকেই এই দুটি ট্যাবুর ধারণা গড়ে উঠেছে। সম টোটেমভুক্তরা স্বজাতি স্বগোত্রের মানুষ—তাদের নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটানো খুবই অন্যায় বলে গৃহীত হয়েছিল আদিমকাল থেকেই। তাই যৌনসম্পর্ক স্থাপনেও বাধা আসে কারণ ঐ একই রক্তপাত ঘটানো। যৌন সম্পর্ক স্থাপনে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। তাই এ সম্পর্ক অবশ্যই ট্যাবুর নিষেধাজ্ঞায় পৌঁছে গিয়েছিল। অবশ্য এর ফলে কতকটা বুঝে এবং বেশির ভাগটা না বুঝেই একটা ভালো দিকও গড়ে উঠেছিল, তা হল বিভিন্ন টোটেমভুক্ত মানুষদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন ও বংশবৃদ্ধি। কারণ রক্তসম্পর্কিতদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক বন্ধ্যাত্ব এনে দেয়, বিভিন্ন টোটেমভুক্তদের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হলে এই বংশলোপের সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও যুগান্তকারী পালাবদল ঘটে। সমাজ সংগঠিত হয়। গোষ্ঠী > কোম বা ট্রাইব > কোমসংঘ বা ফ্রাত্রি > জাতি বা নেশন—সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান যতই বাড়ে, ততই সৃষ্টি হয় নতুনতর সামাজিক পরিকাঠামো। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ, শুচিতার ধারণা জাগ্রত হয়। ফলে মানুষ শ্লথবন্ধ মূল্যবোধকে সংহত করতে শেখে। তবে টোটেম ভাবনায় যে কোনও ব্যতিক্রম নেই এমন নয়। মানুষ হয়ে মানুষ যখন নরখাদক হতে পারে বিশেষ 'মান্যা'কে আত্মস্থ করার জন্য, তেমনি কোন বিশেষ ঋতুতে বা দিনে কোনও স্বটোটেমের পশুকে হত্যা করে তার মাংস খেতে মানুষ পিছপা হয় না, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সূত্রে। তার দৈবী শক্তিকে নিজের সত্তার সঙ্গে আত্মস্থ করে ফেলার এটি প্রকৃষ্ট প্রণালী। এটা ফুল-লতা-গাছ ইত্যাদি টোটেমের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য।

এই টোটেম ধারণার প্রতিচ্ছবি আমরা বর্তমানেও বিভিন্ন নামকরণ ইত্যাদি ধারণার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। যেমন—জ্যোতিষশাস্ত্রে বিভিন্ন রাশির নামকরণে, কামসূত্রে নারী ও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিভাগে (পদ্মিনী, শঙ্খিনী, শশক, গজ ইত্যাদি), রূপকথায় মানুষের পশুতে পরিণত হওয়া বা পশুর রূপধারণ করে কোনও কার্যসিদ্ধি ইত্যাদি দেখানো (ইউরোপের রূপকথা 'ফ্রগ প্রিন্স', বাংলার ডালিমকুমার ইত্যাদি), মিথে (বুদ্ধের জন্মকাহিনীতে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর দেহে শ্বেতহস্তী বিলীন হওয়ার যে স্বপ্ন সেটিও প্রকৃতপক্ষে হস্তী টোটেম-সম্পন্ন লিচ্ছবিরাজ শুদ্ধোদনের দ্বারা অন্তঃসত্তা হবারই রূপক।) লোককাহিনীগুলিতেও পশুরা প্রায়শই

মানবিক গুণসম্পন্ন। যেমন, ধূর্ত শৃগাল, চালাক কাক, বোকা গাধা ইত্যাদি। এক একটি জাতি তথা দেশও প্রায়শঃই এক একটি পশুর চিহ্নে সূচিত হয় : সিংহ (ইংলণ্ড), ক্যাঙারু (অস্ট্রেলিয়া), ভালুক (রাশিয়া) ইত্যাদি।

আগেই সংস্পর্শমূলক জাদুর উদাহরণে জাদুকরের সাজের বর্ণনায় দেখিয়েছি মানুষ কেমন পশুর পোষাক পরে নকল পশু সেজে নাচগান করে জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করত উদ্ভ পশুরই ওপর যাতে ঐ পশুর শিকার মেলে। বর্তমানেও গম্ভীরা নৃত্যে 'মুখাখেল'-এ, পুরুলিয়া ছৌ-তে 'পশুচাল'-এ পশু সেজে নৃত্য করার প্রথা আছে। গানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সাতটি যে স্বর মানুষ সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীর মানুষের ক্ষেত্রেই তার রূপ একই এবং সেগুলি পশুপাখির ডাকের নকলে তৈরি : সা (ময়ূর), রে (ষাঁড়), গা (ছাগল), মা (সারস), পা (কোকিল), ধা (ঘোড়া), নি (হাতি)।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের মতোই প্রাচীন সভ্যতা চিনের জ্যোতিষশাস্ত্রেও প্রাণীচিহ্নের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রাচীন সভ্যতাগুলি লোকবিশ্বাস ও জাদুসম্পর্কগুলিকে অনেক প্রাথমিক অবস্থায় সরাসরি গ্রহণ করায় প্রাচীন সভ্যতাগুলির সংস্কৃতিতে পরতে পরতে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব খুব বেশি। যদিও এই প্রভাব সমস্ত দেশ ও জাতির সংস্কৃতিতেই দেখা যায়। চিনের পাঁজিতে বছরের ভিন্ন ভিন্ন মাসগুলির নাম এক একটি পশুর নামে চিহ্নিত। যেমন, ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোস, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ছাগল, বাঁদর, মোরগ, কুকুর এবং শুওর। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন খেলার সময় বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে পৃথিবীর উন্নততম দেশ থেকে শুরু করে সব দেশ ম্যাসকট ব্যবহার করে। এই ম্যাসকট হয় কোনও পশু বা পাখির চিহ্ন ; এছাড়া রাষ্ট্রীয় চিহ্ন, জাতীয় পাখি, জাতীয় পশু প্রভৃতিও নির্দেশিত হয় ঐ দেশের সবচেয়ে সুন্দর ও সুলভ পশু ও পাখিকে বিবেচনা করে। পশুই মানুষের পরিত্রাতা এই আদিম মনোভাবই আজও পশুকে এত প্রাধান্য দেয়। এছাড়া বিভিন্ন গালিগালাজ, প্রবাদ প্রবচনেও দেখা যায় মানুষ ও পশুর একাত্মীকরণ ঘটে সহজেই যেমন 'শুয়োরের বাচ্চা' বা 'কুম্ভীরাশ্রু', 'ব্যাঙের সর্দি'।

মানুষ প্রধানত প্রকৃতির মধ্যেই থেকেছে ; প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, প্রকৃতিকে ভালোবেসে ও ঘৃণা করে, তার ফুলের গন্ধ শুঁকে, ফল খেয়ে পাতা থেকে ওষধি সংগ্রহ করে, কাঠ জ্বেলে আগুন ব্যবহার করে পাহাড় কেটে ঘর করে, নদীর-পুকুরের জল খেয়ে জীবনধারণ করেছে। আর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পশু-পাখিদেরও মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে শিখেছে আদিম কাল থেকে। বিবর্তনে ক্রম ইতিহাসের স্তর বেয়ে তাই প্রকৃতি ও পশুপাখি মানুষের আপন সত্তার একটি অংশ হয়ে গেছে মাত্র। তাই টোটেম ভাবনায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতাবোধের ছবিই আমরা দেখি। এইভাবে উদ্ভূত টোটেমের ধারণা মোট তিন প্রকার। (১) গোষ্ঠীগত টোটেম ; আগে উল্লিখিত সমস্ত টোটেমই তাই। এবং গোষ্ঠীগত টোটেমের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। (২) গোষ্ঠীর বিশেষ অংশ (নারী-পুরুষ)-গত এবং (৩) ব্যক্তিগত টোটেম।

যৌন-বিষয়ক টোটেমগুলি সবই প্রায় নারী-পুরুষ সংক্রান্ত। পুরুষের টোটেম বা পুরুষের বিশেষ শক্তিই পরে গোষ্ঠীবিশেষের টোটেমে পরিণত হয়। অপর পক্ষে নারীর বিশেষ টোটেম নারীসমাজকে পুরুষদের থেকে আলাদা করে দেয়। মেয়েদের টোটেম, ছেলেদের টোটেম-এর ভেদজ্ঞান নানাপ্রকার ট্যাবু-র সৃষ্টি করে। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব কিছু সংস্কার-ধারণা ব্যক্তিগত টোটেমের ধারণাটি তৈরি করেছে।

'ট্যাবু' প্রসঙ্গে ফ্রয়েড তাঁর 'টোটেম ও টাবু' নামক গ্রন্থে বলছেন, "আমাদের কাছে 'টাবু'র অর্থ দুইটি, এবং তারা বিপরীতধর্মী। এক পক্ষে ইহা পূত, পবিত্র এবং অপর দিকে ইহা অসোয়াস্তিকর, বিপজ্জনক, নিষিদ্ধ এবং অপবিত্র। পলিনেশিয়াতে টাবুর বিপরীতার্থবোধক শব্দ হচ্ছে 'noa', যার অর্থ হচ্ছে, যা-কিছু সাধারণ এবং সহজলভ্য। অতএব 'টাবু' কথাটির মধ্যে সংরক্ষিত, নিষিদ্ধ এই ধরণের একটি ইঙ্গিত রয়েছে। 'টাবু' বলতে আসলে নিষিদ্ধ এবং আপত্তিজনক ভাবেরই প্রকাশ পাচ্ছে। 'পবিত্র-ভয়' এই যুগ্ম শব্দের দ্বারা অনেক সময় 'টাবু' কথাটির ভাবার্থ প্রকাশ হয়ে থাকে।" ('টোটেম ও টাবু' : পূর্ববৎ ; পৃঃ ১৭)

ভুণ্ড-এর মতে ট্যাবু হল মানবতার সবচেয়ে পুরোন অলিখিত আইন।

ট্যাবুর একটি বড় উপলক্ষ হল যৌনসম্পর্কঘটিত বিধি-বিধানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিক্ষেপ। দ্বিতীয় উপলক্ষ হল ভয়, অর্থাৎ বিচিত্র প্রাকৃত অতিপ্রাকৃত বিষয়ে আদিমকালাগত ভয়। আর তৃতীয় উপলক্ষ হল খাদ্যের সংস্থান যাতে যথাযথ থাকে তার জন্য পবিত্রতা—অশুচিতাবোধজনিত নানা ধরণের আচারমূলক ট্যাবু খাদ্যের 'মান্যা'কে সন্তুষ্ট করা জন্য। তবে বেশিরভাগ ট্যাবুর উৎসরণ হয়েছে যৌনসংস্কারমূলক ট্যাবুগুলি থেকে।

তবে যে কোন প্রকার নিষেধরীতি ট্যাবুর অন্তর্ভুক্ত না নিশ্চয়ই। যে কাজ বা যে-ব্যক্তি অথবা যে-বস্তু কোন না কোনভাবে কিছু একটা অলৌকিক শক্তির দ্বারা শ্লিষ্ট হয়ে আছে বলে গণ্য হয়, তার জন্য যদি কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত থাকে তবেই সেটা ট্যাবু বলে মানা হয়। বস্তু বা ব্যক্তির পবিত্র বা অপবিত্র ভাব এবং তার থেকে উদ্ভূত নিষেধাজ্ঞা এবং সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলে যেসব পবিত্রতার বা অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় সেগুলিই ট্যাবু।

আসলে মানুষ যবে থেকে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে। খুব সম্ভবত তখন থেকেই নানান বিধিনিষেধও মানুষের ওপর চাপানো হয়েছে সমাজপতি, দলপতি বা সর্দার, জাদুকর, পরিবারের প্রধান প্রভৃতির দ্বারা যাতে গোষ্ঠী বা দলটি বা সমাজটি সঠিক নিয়মে চলে। তাই ট্যাবুর মধ্যে সাধারণ নিষেধ বিধি যেমন আছে, তেমনি আছে পাপ-পুণ্যের ধারণা। সাধারণ ভাবে ট্যাবু কথাটির অর্থ অপরিচ্ছন্ন বা অশুচি, অতএব সেই কারণেই নিষিদ্ধ। কিন্তু পরে এর ভাবগত পরিব্যাপ্তি ঘটেছে—অতি পবিত্র, অতি শুচি ইত্যাদি। সভ্যতার সমস্ত স্তরে দেশ-কাল নির্বিশেষে এই বিশেষ বিশেষ ট্যাবু সংস্কারগুলি প্রবহমান ছিল এবং আছে। তাই লোকপুরাণ, মিথ, লোককথা, কিংবদন্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ট্যাবুর খোঁজ মেলে। এই কারণে স্টিথ টমসনের মোটিফ ইনডেক্সের গ্রন্থে বিভিন্ন লোককাহিনিতে এই ট্যাবু ভাঙার অপরাধের শাস্তি বা বিপন্নতাকে বিভিন্ন মোটিফ সূত্রে তিনি সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে গ্রথন করেছেন। তাই লোকমানসে ট্যাবুর গুরুত্ব অনেক গভীর তাতে সন্দেহ নেই।

এই ট্যাবু ব্যবহারের উদ্দেশ্যও প্রচুর। সূত্রাকারে গ্রথিত করলে দেখা যায় :

১. প্রত্যক্ষ ট্যাবুর উদ্দেশ্য : (ক) দলপতি, গুরু প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তি ও বস্তুকে বিপদ থেকে রক্ষা করা ; (খ) কতকগুলি বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া—যেমন, মৃতদেহ নাড়াচাড়া করা বা তার সংস্পর্শে আসা, কোনো খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারজনিত বিপদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ; (ঘ) জন্ম, উপবীত, বিবাহ, যৌনক্রিয়া প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান কাজকে বিপদ থেকে রক্ষা ; (ঙ) দেবতা এবং প্রেতাত্মাদের কোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করা ; (চ) ভ্রূণস্থ শিশু এবং ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।

২. চোরের হাত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, খেত-খামার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রক্ষার জন্য 'ট্যাবু' আরোপিত হয়ে থাকে।

আদিতে ট্যাবু ভাঙার শাস্তি সাধারণত বিবেক-বিচারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হত। লোকে বিশ্বাস করত ট্যাবুর নিয়ম ভাঙলে ট্যাবুই তার প্রতিশোধ নেয়। এন. ডব্লিউ টমাস-এর মতে, ট্যাবুর নিয়ম ভাঙলে সেই ব্যক্তি নিজেই ট্যাবু হয়ে যায়। তাই ট্যাবু কোনও কারণে ভেঙে ফেললে বা ভাঙতে বাধ্য হলে লোকে প্রায়শ্চিত্ত এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ-এর ত্রুটি রাখত না (অর্থাৎ জাদুর প্রয়োগ ঘটাত, খাদ্যে ট্যাবুর শক্তি ভাঙার অবরোধ খণ্ডন হয়)। যখনই দেবতা বা দানবের থিমের সৃষ্টি হল, তখনই এই 'ম্যান্যা' এবং 'ট্যাবু'র শক্তিকে রুষ্ট করার অপরাধে সৃষ্টি হল নানাপ্রকার শাস্তি বিধানের। এই শাস্তির ধারা পরে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি রূপেও আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষ এভাবে শাস্তি বিধান করতে শেখে।

ট্যাবু আবার দু ধরণের স্থায়ী এবং অস্থায়ী। যে সমস্ত ট্যাবু পুরোহিত, নেতা ও মৃত তাদের অধিকৃত যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধীয় তা হল স্থায়ী ট্যাবু। এছাড়া নারীর রজঃস্রাব সংক্রান্ত বা আঁতুড়ঘরের বিচার, যুদ্ধযাত্রার আগে বা পরে যোদ্ধা, মাছধরা, শিকার সংক্রান্ত আচার-বিচার, ইত্যাদি হল অস্থায়ী ট্যাবু। ধর্মসংক্রান্ত ও সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ট্যাবুগুলিও বহুদিন স্থায়ী হতে পারে।' (দ্রষ্টব্য : পূর্ববৎ ; পৃ. ১৭-১৯)

তাই ট্যাবু হল মূলত কুসংস্কার ও মানুষের কিছু অর্জিত বিশ্বাস জাতি সংস্কার থেকে কৃষ্ট। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মার প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কজাত নানান দুর্বলতা। তবে সর্বদা যে সেগুলি ভিত্তিহীন হয় তাও নয়। সাধারণভাবে মানুষকে বারণ করলে হয়ত নাও শুনতে পারে, ট্যাবুর বিধান বলে চালিয়ে দিলে সে শুনতে বাধ্য এভাবেও অনেক সামাজিক-নৈতিক বা মৌলিক নীতি বিচার মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—এটা করতে নেই, ওটা করতে মানা ইত্যাদি বলে। ট্যাবু সম্বন্ধে আদিম জাতিদের এমন অদ্ভুত বিশ্বাস যে তারা বিনা প্রশ্নে ওই সব বিধান সারাজীবন মেনে চলে নিষ্ঠার সঙ্গে। ভেবে নেয় যে নিশ্চই কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, নয়ত এমন বিধান কেন হবে। কিন্তু কখনও এ বিষয় তাদের মনে প্রশ্ন জাগে না বা কৌতূহল জন্মায় না। গোষ্ঠীর বিশ্বাসের প্রতি তাদের আস্থা এত অগাধ এখানেই তার প্রমাণ। এর কারণ হল অভিজ্ঞতা। মানুষ তার আদিম অভিজ্ঞতা থেকে গোষ্ঠী ও সমাজের ব্যাপ্তির মাধ্যমে যেটুকু জ্ঞান আজ অবধি সঞ্চয় করেছে তাতে যা কিছু, যে কোনো কারণেই হোক, ভয় বা ভৌতিক কাণ্ডের সৃষ্টি করেছে তাকেই ট্যাবুর শ্রেণীভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ভুণ্ড-এর মতে, 'যেসব প্রথা কোন ধর্মমতের চিন্তার সঙ্গে বা তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কোন বস্তু সম্বন্ধে ভীতি উৎপাদন করে, তা সবই ট্যাবু পদবাচ্য।' আবার অন্যত্র তিনি বলছেন, 'প্রত্যেক আচার-বিরুদ্ধ প্রথা বা আদব-কায়দা এবং বিশেষ কোনো জিনিষ স্পর্শ করতে নিষেধ বা নিজের জন্য গ্রহণ নিষেধ বা কোনো নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি—ট্যাবু বলতে সাধারণ ভাবে ঐ সমস্তকেই আমরা বুঝি।' তা যদি হয়, তাহলে কোনো জাতি বা সংস্কৃতির কোন স্তরই এর অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পায় নি। ('টোটেম ও টাবু' : পূর্ববৎ ; পৃ. ২১)

ফ্রয়েড এরপর ভুণ্ড কিভাবে অস্ট্রেলীয় ট্যাবুগুলিকে শ্রেণী বিন্যস্ত করেছেন তা দেখিয়েছেন এইভাবে, প্রথমত কোন পশুহত্যা বা ভক্ষণ বিরুদ্ধ প্রথা। এটাই হল টোটেম প্রথার গোড়ার কথা। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির বিশেষ অবস্থার জন্য ট্যাবু। যেমন—যুবকদের সম্প্রদায়ভুক্তি উপলক্ষে ভোজের সময়, স্ত্রীলোকদের রজঃস্রাব অবস্থা বা

প্রসবের পরের অবস্থা, নবজাত শিশু, রুগ্ন ব্যক্তি—বিশেষত মৃত ব্যক্তি, এ সমস্তই ট্যাবু। কোন ব্যক্তির সর্বদা ব্যবহৃত জিনিষপত্র যেমন—কাপড়চোপড়, যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র এসবও অন্যের কাজে স্থায়ী ট্যাবু। অস্ট্রেলিয়াতে বয়ঃপ্রাপ্তি-অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত নতুন নাম স্নাতকের নিজস্ব সম্পত্তি। (ভারতে এটাই উপবীত অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণ ছেলেদের প্রাপ্ত হয় দ্বিতীয় নাম অথবা গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরও অনেকে এমন গোপন নতুন নাম পায়)। এটা ট্যাবু, অর্থাৎ গোপনীয়। কোন গাছপালা, বাড়িঘর বা বিশেষ কোন স্থান প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর ট্যাবু-পর্যায়ভুক্ত। এর আবার অনেক প্রকারভেদ আছে। (ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বা আরও ছোট করে আমাদের বাংলায় এমন ট্যাবুর সংখ্যা প্রচুর। যেমন—রাতে গাছের গায়ে হাত দিতে নেই। রাতে বনে জঙ্গলে বা বাগানে ঘুরতে নেই, তুলসীপাতা মেয়েরা তোলে না, রাতে কেউ তিনবার না ডাকলে দরজা খুলতে নেই। ভাত খেতে খেতে খাওয়া ছেড়ে উঠতে নেই, সন্ধ্যের মুখে চুল বাঁধতে নেই মেয়েদের, সন্ধ্যেবেলা তুলসিতলায় প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজাতে হয়, মাটির ঘর সর্বদা গোবরছড়া দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার রাখতে হয়। বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকি লাগাতে নেই ইত্যাদি।

ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে ট্যাবু ব্যবহারের পিছনে মানুষের মানসিক কতকগুলি বৃত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন শুচিবায়ুগ্রস্ততা, ছোঁয়াচে ব্যাধি ইত্যাদি। এগুলি একদিক থেকে বিচার করলে ঠিক মনে হলেও এর পিছনেও আছে সেই মূল তিনটি আদিম ভয়। যেগুলি এই মানসিক দুর্বলতাগুলি তৈরি করে। 'দ্য গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে স্যর জেমস জর্জ ফ্রেজার দেখিয়েছেন, কী কারণে একজন মাওরি সর্দার মুখ দিয়ে আগুনে ফুঁ দেবে না। কারণ সে জানে, তার পবিত্র শ্বাসবায়ুর পবিত্রতা আগুনের মধ্যে এবং আগুন যে পাত্রে আছে সেখানে এবং সেখান থেকে পাত্রে রাখা মাংসে চলে যাবে। এর ফলে ঐ মাংস যারা খাবে তাদের জীবনহানির সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। এইভাবেই প্রাচীনকালে রাজাদের মধ্যেও সিংহাসনে বসার পর কতগুলি ট্যাবুর বিধান সঠিকভাবে মেনে চলতে হত।

যৌনাচারভিত্তিক ট্যাবুর উৎস থেকে সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত যে বহির্বিবাহ দিয়ে, সে কথা আগেই বলেছি। রক্তপাত বিষয়ক ট্যাবুই এই বিপ্লব ঘটার মূলে। রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে বিচিত্র সংস্কার আদিমকাল থেকেই মানুষের মনে রয়েছে। রক্তকে জীবন্ত প্রাণীর প্রাণ বা আত্মা বা সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করা সেই ধরণের একটি সংস্কার। শত্রুর রক্তপাত করা মানে, তার আত্মার ক্ষতিসাধন করা, শিকার্য পশুর রক্তপাত ঘটানো মানে তাকে কাহিল করে দেওয়া, আবার—নিজের বা নিজের গোষ্ঠীর কারুর রক্তপাত হওয়ার অর্থ নিজেরই প্রাণসত্তার কিছু অংশ অপচিত হল—এমন ভাবা হয়। তাই এক টোটেমের অন্তর্গত যারা, তারা একই পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী হওয়ায়, তাদের কারো রক্তপাত ঘটানোর অর্থ আদি পূর্বপুরুষদের কল্পিত ঐ টোটেমের প্রাণ বা সত্তার কিছু অংশের অপচয় বা ক্ষতিসাধন। তা করলে অনির্দেশ্য অলৌকিক শক্তিরা রুষ্ট হবে এবং তাদের ক্ষতি করবে। সুতরাং স্ব-টোটেমের কারো রক্তপাত ঘটানো পাপ। জ্ঞাতিহত্যা যেমন পাপ, তেমনি স্ব-টোটেমের মধ্যে বিবাহও পাপ। এই অপরাধবোধের উৎস ঐ রক্তপাত-নিষিদ্ধ ট্যাবু।

ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে ট্যাবুর কতগুলি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সেগুলি এরূপ—

১. খাদ্য-পানীয় বেশভূষা ও ব্যবহার্য বস্তু-সংক্রান্ত।
(যেমন—মাছ-মাংস না খাওয়া, লালপাড় শাড়ি, লাল টিপ, সিঁদুর, শাঁখা পরা, নতুন বৌকে কালো কাপড় বা কালোপাড় কাপড় না দেওয়া, ইত্যাদি)

২. কথা বলা, শব্দবিশেষ উচ্চারণ করা, কিছু দেখা, মেলামেশা ইত্যাদি সংক্রান্ত।
(যেমন—স্বামীর নাম মুখে না আনা, ভাসুর-ভাদ্র বৌ-তে কথা না বলা, চাল শেষ হলে বলা 'চাল বাড়ন্ত'। 'ভূত'কে 'ওঁরা' বলা, রাতে সাপকে 'লতা' বলে সম্বোধন। শাশুড়ির সঙ্গে জামাইয়ের সরাসরি তাকানো বারণ, কারণ স্ত্রী-এর আগে জামাই শাশুড়ির প্রেমে পড়ে যেতে পারে বা শাশুড়ি হবু জামাইয়ের প্রতি আগেই আকৃষ্ট হয়ে গেলে মুশকিল। তবে দেওর যেহেতু দ্বিতীয় বর তাই তার সঙ্গে বৌদির মেলামেশায় কোন বাধা নেই। এগুলি সবই মনঃস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট ট্যাবু।)

৩. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত।
(যেমন—শিশুজন্মের পর ষষ্ঠীপূজো পর্যন্ত আঁতুড় সংস্কার, বিয়ের শুভদৃষ্টির আগে বর কনের মুখ দেখবে না, মড়া পুড়িয়ে ফিরে আসার সময় পিছন ফিরে তাকাবে না ইত্যাদি)

৪. কোনও বিশেষ কাজ করা বা না করা সংক্রান্ত।
(যেমন—সন্তানের মায়েদের লাউ-কুমড়ো দুফালা না করা বা নারকোল গাছ না কাটা ইত্যাদি।)

৫. কিছু ছুঁয়ে ফেলা ইত্যাদি সংক্রান্ত।
(যেমন—নারীর নারায়ণ শিলা ছুঁয়ে ফেলা, বাসি কাপড়ে টাকার বাক্স বা চালের কৌটো ধরা ইত্যাদি)

৬. দিনক্ষণ-তিথি ইত্যাদি সংক্রান্ত।
(যেমন—সংক্রান্তির দিন যেখানে গতমাসে কেটেছে পরের মাসেও যেন সেখানেই থাকে। নতুন জায়গায় যেন মাস পড়লে যায় ; গ্রহণের সময় কিছু খাওয়া, চৈত্র-ভাদ্র ইত্যাদি মাসে বিয়ে প্রভৃতি)

৭. কোনও কোনও কাজে বিশেষ বিশেষ কারোর হাজিরা বা গর-হাজিরা সংক্রান্ত।
(যেমন—বিয়ের সময় কোন বিধবা নারী যেন ছাঁদনা তলায় না থাকে, মেয়ের বিয়ের কোন অনুষ্ঠান যেন মা না দেখে। ইত্যাদি)

৮. বিশেষ কিছু ভঙ্গী বা মুদ্রা করা-না-করা সংক্রান্ত।
(যেমন—সকালবেলা কাউকে একচোখ দেখাতে নেই। দক্ষিণদিকে মাথা করে শুতে নেই ইত্যাদি।)

৯. বিশেষ কিছু ভাবা কিংবা না-ভাবা সংক্রান্ত।
(এ বিষয়ে ট্যাবুর সংখ্যা কম। যেমন—ওষুধ খাবার সময়ে মৃত্যুর কথা মনে এলে, সে ওষুধ না-খাওয়া ; কিংবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে অনুচিত চিন্তা এলে সে কাজটি না করা ইত্যাদি)

১০. বিশেষ বিশেষ শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত।
(যেমন—ঋতুকালে মিলিত না হওয়া বা ঐ সময়ে ঠাকুরের আসন না ছোঁওয়া, কোন শুভকাজে না অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি)

উদাহরণগুলি এখানে বাংলার সংস্কৃতি থেকে নেওয়া হলেও, এরূপ ট্যাবু সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। এই দশটি বর্গকে আবার নানা উপবর্গেও বাগ করা যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। পলিনেশিয়ায়

এরা ট্যাবু, পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলে এই নিষেধ-বিধির নাম 'খ্যানোত্', মরোক্কোয় 'বারাকা', নাগাল্যাণ্ডে 'গেন্না', জুলুদের সমাজ 'হলোনিপা', বেচুয়ানাল্যাণ্ডে 'ইলা' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সমস্ত দেশের সংস্কৃতিবলয়েই এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ড. সেনগুপ্তের মতে, ঐতিহ্যানুসরণে গ্রস্ততা এবং অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতাই এই ট্যাবুগুলি সৃষ্টির কারণ, যা আমাদের মুক্ত চিন্তা এবং যুক্তিবুদ্ধির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে আজও অলঙ্ঘ্য, অনড়ভাবে সংস্কৃতির গভীর শিকড়ে অবস্থান করছে।

এই ট্যাবুগুলি তৈরি হওয়ার পিছনে যেমন ভয় কাজ করে তেমনি কাজ করে যৌনকামনার অস্তিত্ব; আর এই দুয়ের ওপর কাজ করে জৈব প্রবণতা—যা ধর্মানুশাসন ও জাদুর প্রত্যয় ঘটায়। যেমন—ভাসুর-ভ্রাতৃবধূ কথা না বলা। রক্তসম্পর্কিত নয় এমন নারী-পুরুষের বাক্যালাপ তাদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের সূচনা করে, এমন একটি আদিম সংস্কার এর মধ্যে আছে। স্বামীর চেয়ে সম্মানে বড় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা ভ্রাতবধূ আগেই পরিগৃহীত হবে—এই সম্পর্ক কোমসমাজের বিধান খর্ব করে। সুতরাং এই বাক্যালাপ ট্যাবু। বাঘের নাম করলে বাঘ সত্যি সত্যিই হাজির হবে, অতএব তাকে 'বড় শেয়াল' বলাই ভাল, এমন ধারণা লোকসমাজে ট্যাবুর সৃষ্টি করেছে। আবার কালো রং যেহেতু অশুভের দ্যোতক তাই কালো কোন শুভ অনুষ্ঠানে অচল। এটি একটি জাদু এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ট্যাবু। কুমড়ো, লাউ গর্ভিনী নারীর অনুরূপ, তাই লাউ বা কুমড়োকে দু ফালা করা নারীর নিজের গর্ভের বা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি করার অনুরূপ। তাই এটি অনুকৃতিমূলক জাদু। ট্যাবুর অন্তর্লীন এই জাদু ও মান্যা-সম্পৃক্ত ধারণাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে। যে সমাজে নারীর চেয়ে পুরুষের সামাজিক গুরুত্ব বেশি বলে স্বীকৃত। শ্বশুর-ভাসুর কেন্দ্রিক ট্যাবুগুলি সেখানেই প্রবল। অর্থাৎ সামাজিক এবং পারিবারিক বিত্তাধিকারটা সেখানে পুরুষেরই আয়ত্তগত। পক্ষান্তরে সমটোটেমীয়রা ভাই-বোন বলে গণ্য, তাই তাদের বিবাহ / যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এটি সভ্যতার একটি উন্নত স্তরের অবদান। প্রাচীন সংস্কৃতিতে ভাই-বোনের বিবাহ কোম সমাজের মধ্যে দেখা যেত। যেমন—ঋগ্বেদের শ্লোকে আছে যমী যমকে বিয়ে করতে চাইলে, যম যমীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইছেন এই বলে যে, এরকম বিবাহ আগে হতো, এখন এটি ঘটলে দেবতারা রুষ্ট হবেন। এটিই ট্যাবু। দক্ষিণভারতে আবার মামা-ভাগ্নীর বিবাহ স্বীকৃত। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণই সামাজিক অবস্থান কেন্দ্রিক একটি বিধান।

তবে এই ট্যাবুগুলি কোনও কারণে ভঙ্গ হলে তার প্রতিবিধান ব্যবস্থাও সমাজে প্রচলিত আছে. ট্যাবু ভাঙলে যে শুধু শাস্তিই পেতে হয় তা নয়। পুরোহিত বা জাদুকরকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেই এই অপরাধের দোষের হাত থেকে মুক্তি ঘটে। সমাজ তাই যেমন নিয়ম সৃষ্টি করে, তেমনি সেই নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থাও করে রাখে এবং সব শ্রেণীর মানুষের জন্যই সমাজব্যবস্থা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিধি বিধান নিয়ম পরিবর্তন করে, মানুষকে তুষ্ট করে চলার বিধানও তাই সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে প্রায়শই দেখা যায়।

২.৬ ❐ উপসংহার

আদিমকাল থেকেই মানুষের মনে বিচিত্র রকমের সংস্কার, বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং তার কারণ ঐ বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির কার্যকারণ সম্পর্কটি ঠিক কি সেটি মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে উঠতে পারে নি। মূলত কোনও ব্যক্তি বা প্রাণী, কিংবা স্থান কাল বস্তু অথবা ঘটনাকে শুভ বা অশুভ বলে গণ্য করার ফলেই

এইসব বিশ্বাসের উৎপত্তি। এইসব সংস্কারগুলির মধ্যে যেগুলিকে আমরা বর্তমানে উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি, এবং বুঝতে পারি আসলে ঐ সংস্কারচক্রের যুক্তিটি ভণ্ড, তখনই তাকে বলি কুসংস্কার। আর যেসব সংস্কারকে আজও আমরা মেনে চলি সেগুলি সবই শুভ অথবা জৈবিক প্রত্যয় তৈরি করে আমাদের মনে।

জীবিকানির্বাহ, যৌন-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ, নিরাপত্তালাভ এবং ভয় ও শত্রুর হানি—মোট এই প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্যই কোন আদিমকালে এই শুভাশুভের সংস্কারগুলির সৃষ্টি। তবে আধুনিক মানুষ, আজকের নাগরিক জীবনেও সেই সব সংস্কারের আত্মপ্রকাশ ঘটতে আমরা প্রায়শই দেখি। মহিলাদের মধ্যে এইসব সংস্কার বা ট্যাবু রূপেই হোক বা মান্যারূপে যার উৎপত্তি আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। টোটেম প্রথা আজ না থাকলেও তার প্রভাব আজও সমাজে কত ব্যাপক তা আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে দেখিয়েছি। ম্যাজিক ক্রিয়া আজও সমাজের নিম্ন আর্থ-সামাজিক এলাকায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জলপড়া, তেলপড়া, চালপড়া, ঝাড়ফুঁক, চড়কের ভক্ত্যাপরব, গাজনের কৃচ্ছ্রসাধন এসবেরই নামান্তর। বিশ্বায়ন, কম্পিউটার কিছুই এইসব বিশ্বাসের গভীর ভিত্তিভূমিকে নড়াতে পারে নি। পুরুষদের মধ্যেও যে সংস্কারের কিছু অভাব আছে তা নয়, সংখ্যা বিষয়ক সংস্কার, জ্যোতিষ-এ বিশ্বাস, কোন বিশেষ ঘটনার পর কোন ভাল কাজে সফল হলে, যেকোন ভাল কাজের আগে ঐ বিশেষ ঘটনাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো,—এগুলি ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে আজও আমাদের সমাজের গ্রাম্য বা নাগরিক নির্বিশেষে বেশিরভাগ লোক মেনে চলেন। সুতরাং আদিমতার ভিত্তিভূমিতে জাদুবিশ্বাসের ও সংস্কারের নিরিখে নাগরিক জীবনের সামাজিক-আর্থনীতিক চরিত্রের সঙ্গে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমজীবী গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ঠ। এই তো আজও, বাসের পিছনে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য জুতো বা ঝাঁটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বা নজর যাতে না লাগে তাই লেখা হয়, 'দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মত ফুলবি'। আবার ছোট বাচ্চার কপালের বাঁদিকে কাজলের টিপ দিয়ে কড়ে আঙুল কামড়ে গায়ে থুথু দিয়ে তাকে খুঁতো করে দেওয়া হয় যাতে কারো কুনজরে তার ক্ষতি করতে না পারে। বড় বড় ডিগ্রির পরীক্ষার ছাত্রও পকেটে ঠাকুরের ফুল রাখে। বড় বড় সার্বজনীন পুজোর পাশে শিবরাত্রি, ঘেঁটুপুজোও চলে জোর কদমে।

আসলে এই ভয়-ভীতি-ভক্তি-বিস্ময় মানুষের অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। তাই আজও মানুষ ধর্ম বা জাদুর মোহ থেকে বার হয়ে আসতে পারেনি। আর্থ-সামাজিক কারণেই ধর্ম ও আচার মানুষকে আরো মোহগ্রস্ত করে তুলেছে, তার সংস্কারকে বিশ্বাসে পরিণত করেছে। তাই মুক্তির আলো এই অন্ধকার কুহেলিতে প্রায়ই পৌঁছোতে পারে না।

২.৭ ☐ অনুশীলনী

২.৭.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী ঃ

১. মর্গ্যানের নির্দেশিত সংস্কৃতি-বিকাশের তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলুন এবং সেই সূত্রে 'সংস্কৃতির সিঁড়ি' ব্যাপারটি কী, তাও ব্যাখ্যা করুন।

২. ভি. গর্ডন-চাইল্ডের মতে 'সভ্যতা' বিকাশের সময়কাল থেকে একান্বিত ভাবে যে-'বিপ্লব'গুলি সংঘটিত হয়েছে, তাদের পরিচয় দিন।

৩. 'সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায়, বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৪. লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা কী? সংস্কৃতি-বিবর্তনের ধারায় লোকসংস্কৃতির অবস্থান কোথায়?

৫. 'গণসংস্কৃতি' কাকে বলে? লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়, বুঝিয়ে বলুন।

৬. 'পপ্‌লোর' কাকে বলে? কীভাবে এর উদ্ভব হয়েছে? গণসংস্কৃতির সঙ্গে এর পার্থক্য নির্ধারণ করা যায় কীভাবে?

৭. সংজ্ঞা লিখে পার্থক্য নির্ণয় করুন (প্রয়োজনে ছক নির্মাণ করা যাবে) ঃ লোকসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, জনসংস্কৃতি, পপ্‌লোর।

৮. 'মান্যা'—ভাবনার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করে বোঝান।

৯. 'ম্যাজিক' বা জাদুকে কতরকম বর্গে বিভাজিত করা হয়ে থাকে? প্রতিটি বর্গ কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত? (ছক এঁকে বোঝানো বাঞ্ছনীয়)

১০. জাদু এবং ধর্মবিশ্বাস কোন্ উৎস থেকে উৎসারিত?

১১. 'টোটেম'-ভাবনার বিচিত্র রূপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১২. 'ট্যাবু' কী? কীভাবে এর সৃষ্টি হয়? টোটেমের সঙ্গে ট্যাবু কী সম্পর্ক? বিস্তৃতভাবে বলুন।

২.৭.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী ঃ

১. মর্গ্যান কীভাবে 'সংস্কৃতির সিঁড়ি' খুঁজে পেয়েছিলেন?

২. আদিবাসী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৩. মর্গ্যান-নির্দেশিত তত্ত্বকে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

৪. মর্গ্যানের তত্ত্বের বিরোধিতা কারা, কেন করেন?

৫. পাশ্চাত্যে "কালাচারের প্রথম সংজ্ঞা" কে, কোথায় কীভাবে দিয়েছিলেন, বলুন।

৬. 'ট্র্যাডিশ্যন' কতভাবে গৃহীত হয়? সেই কথার সূত্রে "পরম্পরাবাহিত"-সংস্কৃতির সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৭. ডন বেন আমোস লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যাশ্রিত চরিত্র সম্পর্কে কোথায়, কী বলেছেন, বলুন।

৮. পপ্‌লোর কী শুধুমাত্র সঙ্গীতকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে?

৯. কোন্ 'প্লেস মিথ'-টি পপ্‌লোরের ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তোলে?

১০ গণনাট্য সংঘের ঘোষিত দায়িত্ব কী কী ছিল?

১১. পথনাটককে কোন্ শ্রেণিতে ফেলা যায়—পপ্‌লোর, না, জনসংস্কৃতি, না-কি গণসংস্কৃতি? —বলুন।

১২. জনসংস্কৃতি এবং গণসংস্কৃতিকে কীভাবে পৃথক রূপে চিহ্নিত করা যায়?

২.৭.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১. 'অরিজিন অব স্পিসিজ', 'প্রিমিটিভ কালচার', 'দ্য এনসেন্ট সোসাইটি', 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট' বইগুলি কে লিখেছিলেন?

২. 'ম্যান মেকস হিমসেল্‌ফ', 'হোয়াট হ্যাপেন্‌ড ইন হিস্ট্রি', 'সোস্যাল এভোলুশন' এবং 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' বইগুলি কার লেখা?

৩. মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু, চিন, গ্রিস ও রোমের সভ্যতা কতদিন আগেকার?

৪. 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলায় প্রথম কে আনেন?

৫. 'কৃষ্টি' শব্দটি কার গ্রহণীয় মনে হয়নি?

৬. 'ফোকলোর' শব্দটি কোন্ ভাষার কোন্ শব্দের অনুবাদ?

৭. এমব্রস মেরটন কে?

৮. ফোকলোরিস্টিক্স শব্দের বাংলা প্রতিশব্দটি কী?

৯. পপ্‌লোরের প্রবক্তা কে?

১০. পিট সিগার এবং উডি গাথারি কে?

১১. "অ্যান আউটকাম অব দ্য ইকোনমিক্স অব গ্লেভারি" কী সম্পর্কে বলা হয়েছে?

১২. শ্রীমতী তিং লিং কে?

১৩. 'মানা' কোন্ দেশের শব্দ? 'টোটেম' কোন্ দেশের শব্দ? 'ট্যাবু' কোন্ দেশের শব্দ? 'ম্যাজিক' শব্দের আদি রূপ কী, কোন ভাষায় প্রাপ্য?

১৪. 'তিনভাই' গুহায় কার ছবি আঁকা আছে?

১৬. স্যার জেমস ফ্রেজার এবং ব্রনিশ্লউ ম্যালিনৌস্কির দুটি বিখ্যাত বইয়ের নাম কী কী?

১৭. 'কৃত্যা' এবং 'যাতু' কাকে বলে?

১৮. হুদুমদেও পূজা কোথায় হয়?

১৯. ট্যাবুর বিপরীতার্থক শব্দটি কী?

২০. যম-যমী সংক্রান্ত শ্লোক কোথায় আছে?

পর্যায় ❐ দুই

২.২.১ ❐ সমাজ ও সংস্কৃতি

ক. লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজ
খ. লোকধর্ম ও লোকদেবতা
গ. ব্রত-পার্বণ
ঘ. লোকাচার
ঙ. লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

২.২.২ ❐ চারু ও কারুশিল্প

ক. লোকসঙ্গীত
খ. লোকনৃত্য
গ. লোকনাট্য
ঘ. লোকচিত্রকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

২.২.৩ ❐ অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলি
অবিস্তৃত প্রশ্নাবলি
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

২.২.১ ❐ সমাজ ও সংস্কৃতি

ক. ❐ লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজ ঃ

আমরা বর্তমানে যে পরিশীলিত সমাজে বাস করি এ হল ক্রম অগ্রসরমান সমাজজীবনের আপাতত সর্বশেষ পর্যায়। মোটামুটিভাবে এই পর্যায়ের পূর্বে আদিবাসী সমাজ ও লোকসমাজ এই দুটি স্তর আমরা অতিক্রম করে এসেছি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এই তিনটি পর্যায়ের প্রতিটিই একেবারে স্বতন্ত্র এবং একের সঙ্গে অন্যের কোনও সম্পর্কই নেই বা যোগ নেই। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব আদিবাসী সংস্কৃতির নানা প্রভাব লোক সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল, দেখব আদিবাসী সংস্কৃতির নানা প্রভাব লোক সমাজের মধ্যে প্রবল ও সক্রিয়। আবার পরিশীলিত সমাজও লোকসমাজের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত যে, তা নয়।

আবার আদিবাসী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্ট। আদিবাসী সংস্কৃতি প্রকৃতিতে অনেক বেশি অনমনীয়। কিন্তু লোকসংস্কৃতি প্রকৃতিতে অনেক বেশি নমনীয়। যেমন ধরা যাক আদিবাসী সমাজে যে পূজা বা পার্বণের অনুষ্ঠান তাতে সমগ্র আদিবাসী সমাজকেই যোগ দিতে হয়। যোগ দিতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে। কিন্তু লোকসমাজে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। টুসু-ভাদু ইত্যাদি উৎসব, যদিও লোকসমাজের সর্বজনীন উৎসব এবং অনেকেই এই সব উৎসবে মাতে, কিন্তু লোকসমাজের সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে এইসব উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয় না।

আদিবাসী সংস্কৃতিতে প্রকৃতির প্রভাব অনেকখানি, আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর অন্তরালে এক অথবা একাধিক দেব-দেবী রয়েছেন। এঁদের আরাধনা করলে এঁরা সন্তুষ্ট হন। আদিবাসী সংস্কৃতিতে প্রকৃতির আরাধনা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদিত হয়। লক্ষণীয় এই প্রভাব লোকসমাজেও ক্রিয়াশীল। আদিবাসীরা অশরীরী আত্মায় বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাসী অপদেবতায়, ভূত-প্রেত ইত্যাদিতে। লোকসমাজেও এই বিশ্বাস অনেকখানিই সঞ্চারিত হয়েছে। তাই বসন্ত-কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের মূলে বিশেষ বিশেষ লৌকিক দেব-দেবীকে দায়ী করা হয়েছে এবং সাধ্যমত তাঁদের প্রশমনেরও নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। আদিবাসী সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ কিংবা সংস্কৃত মন্ত্রের কোন ভূমিকা নেই। লোকসংস্কৃতিতেও তাই। আদিবাসী সংস্কৃতিতে ব্যষ্টির ভূমিকা নগণ্য ; সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিতে গোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ চোখে পড়ে-অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিতে গোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টির অংশগ্রহণও অকিঞ্চিৎকর নয়। আদিবাসী সংস্কৃতি দুষ্পরিবর্তনীয় তাই অনেকাংশে তা বিলীয়মান, কিন্তু লোকসংস্কৃতি পরিবর্তনশীলতাকে মানে।

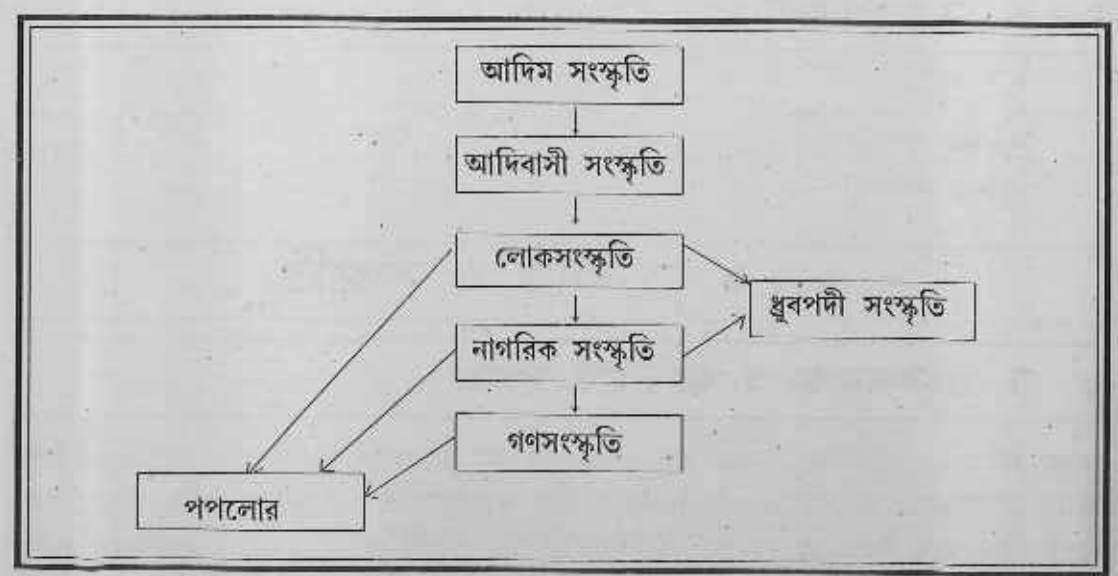

সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ক্রম

খ. ☐ লোকধর্ম ও লোকদেবতা ঃ

পরিশীলিত বা পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে লোকধর্মের গুরুতর পার্থক্য। পরিশীলিত ধর্ম বলতে আমরা বুঝি হিন্দু-ইসলাম-বৌদ্ধ-জৈন-খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদিকে। পরিশীলিত ধর্ম সু-নির্দিষ্ট দর্শন নির্ভর। এই ধর্মাচরণে লিখিত অনুশাসন অনুসৃত হয়। প্রতিটি পরিশীলিত ধর্মেরই নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নির্ভর তথা শাস্ত্রবিহিত কিছু রূপ আছে। পরিশীলিত ধর্মের অনুসরণকারীরা সেই ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে চলে এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ এই ধর্মগ্রন্থভিত্তিক।

কিন্তু লোকধর্মগুলি এইরূপ নির্দিষ্ট কোন ধর্মগ্রন্থ অনুসারী নয়। অর্থাৎ কোনও লোকধর্মেরই ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় নি ; তাই লোকধর্মে বেদ, পুরাণ, কোরাণ কিংবা বাইবেলের মতো কোনো গ্রন্থের সন্ধান মিলবে না।

পরিশীলিত ধর্ম অনুসরণে যে লিখিত অনুশাসন অনুসৃত হয় তার ভাষা মূলত ধ্রুবপদী। যেমন হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। হিন্দুধর্মে দেবপূজা করার অধিকারী একমাত্র পুরোহিতই। ইসলাম ধর্মে ধর্মানুষ্ঠান সম্পৃক্ত ধর্মীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন মৌলবীরা। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ধর্মযাজকদের উপরে। কিন্তু লোকধর্মের ক্ষেত্রে লিখিত কোনও অনুশাসন যেমন মেলে না তেমনি সংস্কৃতে রচিত মন্ত্র উচ্চারণের কোন অবকাশ এখানে নেই। তাছাড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পৌরোহিত্যেরও কোন সুযোগ নেই।

বাংলার লোকধর্মগ্রন্থগুলি মূলত আত্মপ্রকাশ করেছে নদিয়া, বর্ধমান ইত্যাদি জেলাতে চৈতন্যদেবের প্রেরণায়। চৈতন্যদেব, যিনি ধর্মাচরণে পুরোহিততন্ত্রের মূলে কুঠারঘাত করেছিলেন, তা আমাদের তথাকথিত অন্ত্যজ অথবা ব্রাত্য সমাজের মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরিশীলিত ধর্মে অন্ত্যজ, ব্রাত্য মানুষগুলির ঠাঁই ছিল না। অনেকের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না, বিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি অনেকক্ষেত্রে পুরোহিতেরা ব্রাত্যমানুষগুলির কাছ থেকে পূজার উপচারও গ্রহণ করতেন না। সমাজের তথাকথিত নীচু তলার মানুষগুলির আত্মমর্যাদাবোধ প্রতি পদে পদে পদদলিত হত। উচ্চবর্ণের মানুষ এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে এদের আস্থা অন্তর্হিত হল। অথচ একটা কিছুকে আশ্রয় করার তাগিদ তাদের মধ্যে ছিল, যে তাগিদে পরিশীলিত সমাজ পরিশীলিত ধর্মকে আশ্রয় করেছে। এই তাগিদেরই ফলশ্রুতিতে গৌণধর্মগুলির আত্মপ্রকাশ। একে একে দেখা দিল-কর্তাভজা, সাহেবধনী, লালনশাহী, বলাহাড়ী প্রভৃতি লোকধর্মগুলি।

এইসব লোকধর্মগুলির প্রবক্তা যাঁরা তাঁরা সকলেই তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজের, আর এইসব ধর্মকে যারা নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে তারা মূলত সেই সমাজেরই মানুষ।

আমরা লোকধর্মে লক্ষ্য করি, এইসব লোকধর্মের প্রবক্তাদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের গভীর সম্পর্ক। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে গৌণধর্মের প্রবক্তাদের চৈতন্যদেবেরই ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ বলেও বলা হয়। কোন লোকধর্মেই কোন বিগ্রহ আরাধনার অবকাশ নেই। তাছাড়া পরিশীলিত ধর্ম যেমন প্রকৃতিতে অত্যন্ত অনমনীয়, গৌণধর্মগুলি কিন্তু তা নয় ; প্রকৃতিতে সেগুলি নমনীয়। পরিশীলিত ধর্মে উপচার ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। কিন্তু লোকধর্মে এই উপচার ব্যবহারের প্রসঙ্গটি খুবই সীমিত। তাছাড়াও লোকধর্মে আমরা নাম মাহাত্ম্যের গুরুত্ব বেশী করে পাই। এর মূলেও চৈতন্যদেবের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে বোঝা যায়।

এমন কোন লোকধর্মের সন্ধান মিলবে না যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত পরিবেশিত হয় না, তা সে কর্তাভজাই হোক, সাহেবধনীই হোক, বলাহাড়ীই লোক। আসলে সাহেবধনী বা বলাহাড়ীর মধ্য দিয়ে এইসব ধর্মের মূল প্রতিপাদ্যগুলিকে প্রকাশ করা হয়েছে দেখা যায়।

লোকধর্মে যে উদার মানসিকতার পরিচয় পাই তার মূলে একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের প্রভাব পাই তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সুফি ধর্মের প্রভাব। তবে লোক ধর্মগুলিতে কমবেশী দেহ সাধনার বিষয়টি রয়ে গেছে। পুরুষ সাধক সাধনায় আনুকুল্য পেতে তাঁর সাধন সঙ্গিনীকে নির্ভর করেন। যদিও লোকধর্মের তত্ত্বগত ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয় সংযমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সেই সংযম লোকধর্মের অনুসরণকারীরা সকলে না হোক অনেকেই লঙ্ঘন করেছেন। নিজ নিজ পত্নী থাকা সত্ত্বেও সাধনসঙ্গিনীর সহায়তা নিয়েছেন।

লোকধর্মের অনুসরণকারীরা কোন জাতিভেদ প্রথাকে প্রশ্রয় দেন না। এরা একদিকে গোষ্ঠীগতভাবে পূজার্চনার উপর গুরুত্ব দেন তেমনি এঁরা গোষ্ঠীগতভাবে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ একসঙ্গে আহারাদি করেন অন্তত উৎসবে, অনুষ্ঠানে।

আমরা সঙ্গত কারণেই লোকধর্মকে প্রতিবাদী ধর্মের মর্যাদা দিতে পারি। এই প্রতিবাদ পরিশীলিত ধর্মের বিরুদ্ধে, পরিশীলিত ধর্মের পরিচালকদের বিরুদ্ধে, পরিশীলিত ধর্মের আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে। যারা গৌণধর্মগুলির প্রবক্তা অনেক সময় দেখা গেছে তাদের কেউ বা বিনা দোষে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে অপমানিত হয়েছেন, কোথাও বা জায়গা-জমি-ভিটে-মাটি উচ্চবর্ণের মানুষ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে অথবা আত্মসাৎ করা হয়েছে-সেদিক দিয়েও লোকধর্মগুলি প্রতিবাদী। এই কারণে যে অন্যায়ভাবে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বলে যাদের বিনাদোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে শোষণ ও নির্যাতন করা হয়েছে তারা তথাকথিত-উচ্চবর্ণের মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ লোকধর্মের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ উপলব্ধি করেছে যে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অথবা উচ্চবর্ণের মানুষের করুণা যাচ্ঞা করে অথবা নিজেদের তথাকথিত নিম্নবংশে জন্মগ্রহণের জন্য পূর্বজন্মের কর্মগুলিকে দায়ী করে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে কোন দিনও তারা মানুষের প্রাপ্য মর্যাদালাভ করবে না। তাই নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে হবে সংঘ শক্তির উপরে নির্ভর করে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অর্থই দুর্বল হয়ে থাকা। ঐক্যবদ্ধভাবে থাকলে সহজে কেউ তা সে যতই শক্তিশালি হোক শোষণ-পীড়নে সাহসী হবে না। আর ধর্মের নামে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যত সহজ তেমনটি অন্য কোন উপায়ে করা সম্ভব নয়। লোকধর্মগুলির প্রবক্তা যাঁরা তাঁদের এই দুরদৃষ্টিকে আমাদের প্রশংসা করতে হয়।

গ. ❐ ব্রত-পার্বণ ঃ

বাঙালীর প্রবাদকল্প বার মাসে তের পার্বণের কথা সকলেই জানেন। সাধারণভাবে তের পার্বণ বলতে আমরা পূজা পার্বণকেই বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু বাংলার ব্রত-পার্বণ একান্ত নিজস্ব চারিত্র ধর্মে লোকজ ; শাস্ত্রীয় ব্রতের সঙ্গে এগুলির গুরুতর পার্থক্য। আমরা যে ব্রত পার্বণের কথা আলোচনা করতে চলেছি, সাধারণভাবে

সেগুলিকে মেয়েলীব্রত বলে অভিহিত করা চলে। অবশ্য তাই বলে ব্রত কেবল মেয়েদেরই, ছেলেদের হয় না এমনটা ঠিক নয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রত, নারীব্রত এবং কুমারী ব্রত। আমাদের আলোচ্য শেষ দুটি। নারীব্রত এবং কুমারীব্রত। ব্রত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ব্রত কাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। মূলত ঐহিক কল্যাণ কামনায় যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাকেই বলা হয় ব্রত।

শাস্ত্রীয় ব্রতে নানা শাস্ত্রীয় আচার অপরিহার্য। এসবের মধ্যে রয়েছে আচমন, স্বস্তি বাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় ব্রতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, তাছাড়া ব্রতের আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। কিন্তু লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানে আমরা শাস্ত্রীয় প্রভাব মুক্ত এক পরিবেশকে পাই। মেয়েলীব্রতে আমরা লক্ষ্য করি পুরুষের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে সংস্কৃত মন্ত্র তন্ত্রের কোন ভূমিকা নেই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতও সেখানে অপাংক্তেয়।

হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চরিত্র উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি খাঁটি ব্রতের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

> "ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্মবিশেষের কিম্বা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়,....। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকে ব্রত ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে- এই হল ব্রত ; পুরাণের চেয়ে নিশ্চয় পুরানো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"

শাস্ত্রীয় পূজার্চনায় ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনার ভাবটিই প্রধান। এক ধরণের আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থপরতা সেখানে বিদ্যমান। যার নামে পূজার সংকল্প হয় তার এবং তার পরিবারেরই কল্যাণ হয়। অন্তত এই হল প্রচলিত বিশ্বাস। এইখানেই লৌকিক ব্রতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় পূজার্চনার পার্থক্য। শাস্ত্রীয় ব্রত অথবা বৈদিকমতে যে পূজার্চনা তা হল ব্যক্তিগত, অপরপক্ষে লৌকিক ব্রত হল অনেকের জন্য উপাসনার নিদর্শন। যদি একজনের মনের কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য আচার-আচরণ সম্পাদিত হয় তবে তাকে কোন মতেই আমরা ব্রতের অনুষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতে পারি না। একথা ঠিকই যে সকল পূজার্চনার মধ্যেই কামনা চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষা থাকে। ব্রতের বৈশিষ্ট্য হল অনেকজনকে একত্রিতভাবে এক উদ্দেশে। কাজ করতে হবে অর্থাৎ একের কামনাকে দশের মধ্যে প্রবাহিত করে অনুষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ব্রত এবং উপাসনার মধ্যেকার পার্থক্যকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি

> "একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নটিক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা ; দুইই ক্রিয়া কামনার চরিতার্থতার জন্য

কিন্তু একটি একের মধ্যে বন্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত কামনা সফলতাই তার শেষ—এই তফাত।"

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ব্রতের সঙ্গে মেয়েদের যোগ অধিক কেন? ব্রতের সঙ্গে মূলত ঐহিকতার যোগ পারত্রিকতার নয়। বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজনের মূলে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা, পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল যেন উৎপন্ন হয় এই বাসনা, পুকুর যেন মাছে ভরে যায়, রমণী যেন সালঙ্কারা হতে পারে ইত্যাদি। ব্রতে মুক্তি, মোক্ষ লাভ কিংবা স্বর্গ-সুখ ভোগের ব্যাপারটি গৌণ, আর কে না জানে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশী সংসারী। স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে রমণী সুখের সংসার গড়তে চায়। শৈশবে মেয়েরা যে পুতুল খেলে সেখান থেকেই তাদের সংসারী জীবন যাপনের ট্রেনিং চলতে থাকে। ব্রতিনীরা কখনোই ব্যক্তিস্বার্থ-চরিতার্থতার জন্য ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন করে না। সমগ্র পরিবারের কল্যাণ কামনাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য, ঐহিক বাসনা-কামনা চরিতার্থতার জন্যই ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন। নারী যে স্বার্থপর নয়, তারই প্রমাণ এই ব্রতানুষ্ঠানগুলি। পুরুষ শুধু নিজের সংসারের ভালোমন্দ নিয়েই মত্ত থাকে। নারীকে নিজের স্বামী-পুত্র-কন্যা এসবের মঙ্গল কামনার সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ের মঙ্গলকামনাতেও বিভোর দেখা যায়, শুধু স্বামী-পুত্র-কন্যার ঐহিক কল্যাণের ব্যাপারেই তার ব্রতের আয়োজন নয়, সঙ্গে সঙ্গে পিতা, মাতা, ভ্রাতা-ভগিনীর ঐহিক কল্যাণ কামনাও তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত।

রমণী তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে নিজের মত করে দুটি পরিবারের যে ঐহিকতার সন্ধান ক'রে ফেরে, তাতে তার সংসার আসক্তির পরিচয় ও প্রমাণ সুস্পষ্ট। কোন ব্রতেই ব্রতিনী পারত্রিকতার জন্য উদগ্রীব হয় না।

আমরা একটু যদি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করি তাহলে দেখব একদিক দিয়ে ব্রতানুষ্ঠান পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদী আন্দোলন। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় যেখানে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, এমনকি শাস্ত্রীয় পূজানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে, ব্রতে সেই নারীরই একাধিপত্য। সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণের অবকাশ নেই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, এমনকি প্রয়োজনীয় উপচারগুলিও অত্যন্ত সুলভ, যা মেয়েরা নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

ব্রতে মন্ত্রের স্থান নিয়েছে ছড়া ও কথা, যেগুলি একান্তভাবেই মহিলাদের রচিত, ব্রতানুষ্ঠানে সেগুলি এককভাবেই মহিলাদের দ্বারাই কথিত হয়, উচ্চারিত হয়, এগুলির শ্রোতৃমণ্ডলীও নারী।

ব্রতানুষ্ঠানগুলি আদর্শ নারী, আদর্শ গৃহিণী তৈরীতে সহায়তা করত। পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য, গৃহপালিত জন্তু জানোয়ার, গাছ-পালা এসবের প্রতি নারীর দায়বদ্ধতার শিক্ষা ব্রতানুষ্ঠান থেকেই নারী লাভ করত। ব্রত ঐক্য-বোধ ও সংঘত শক্তিরও প্রেরণা দায়ক।

ব্রতিনী তার শ্বশুরালয় এবং পিত্রালয়ের বিভিন্ন আপন জনের ঐহিক কল্যাণ কামনা চরিতার্থতার জন্য ব্রতের আয়োজন করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার আত্মকেন্দ্রিকতার স্থান অনুপস্থিত. একান্তভাবে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে কোন ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না। অনেক রমণীর উপস্থিতিতে কামনাতেই এর আয়োজন এবং চরিতার্থতা। যে গৃহে ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন হয় সেই গৃহের সকল মহিলাই সমবেত হয় ব্রতে

অংশগ্রহণের জন্য। শুধু একটি গৃহেরই বা কেন, প্রতিবেশী গৃহ থেকেও ব্রতানুষ্ঠানে মহিলারা স্বাগত। অতএব যা একান্তভাবে পারিবারিক অনুষ্ঠান হতে পারত, তা হয়ে ওঠে ব্যাপকার্থে সর্বজনীন। সচরাচর মহিলাদের সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে গৃহে তার কর্মজীবন সীমাবদ্ধ থাকত তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনবোধও সঙ্কীর্ণ হয়। বিশেষত নারী অন্য নারীর সৌভাগ্য সুখ ও সমৃদ্ধিকে কখনই নাকি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু ব্রতানুষ্ঠান এর মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ। ব্রতকথায় আমরা দেখি, ঘটনাচক্রে ব্রতানুষ্ঠানে উপস্থিত কন্যা বা রমণী যেমন আয়োজিত ব্রতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আমন্ত্রিত হয়েছে, তেমনি দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী রমণীকে তার দুর্ভাগ্য জয়ের জন্য অন্য রমণী তাকে নির্দিষ্ট ব্রতানুষ্ঠান করার পরামর্শ দানে এগিয়ে এসেছে। অন্যের দুর্ভাগ্যে মৌন থাকে নি।

লৌকিক ব্রতগুলি একান্তভাবে তিথি-নক্ষত্র মাস-বৎসর অমাবস্যা-পূর্ণিমা অর্থাৎ ঋতুনির্ভর। প্রতিটি ব্রত আয়োজিত হয় নির্দিষ্ট তিথিতে, নির্দিষ্ট মাসে অথবা মাসের নির্দিষ্ট দিনে।

ব্রতের সঙ্গে আল্‌পনার যোগ গভীর। মানুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থতায় অভিনয় কলা এবং চিত্রকলার ভূমিকা অতি-প্রাচীন। সাদৃশ্যমূলক জাদু প্রক্রিয়াকে চিত্রকলা এবং অভিনয় কলায় আমরা মূর্ত হতে দেখি। মেয়েলি ব্রতে এই দুটি শিল্পকলার ভূমিকা এবং একই উদ্দেশ্যে দুটিরই ব্যবহার। তবে পার্থক্য যে একেবারে নেই তা নয়, পার্থক্য এইটুকুই বিচিত্র কামনা বাসনা সফল করার ইচ্ছার সঙ্গে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেগুলিকে প্রতিরোধ করার বাসনাও মূর্ত হয়ে উঠেছে ব্রতানুষ্ঠানে। সাদৃশ্যমূলক জাদু প্রক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল এই প্রসঙ্গে—

● ব্রতে যে আলপনা আঁকা হয় তাতে থাকে গৃহাভিমুখী লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের মরাই, পুকুর, নানাবিধ আভরণ ইত্যাদি ; উদ্দেশ্য বাস্তবেও যেন লক্ষ্মী গৃহে অচলা থাকেন, ধানের মরাই ধানে পূর্ণ, পুকুর মাছে ভর্তি থাকে। নথ বালা ইত্যাদি যেসব অলঙ্কারের চিত্র অঙ্কিত হয় বাস্তবেও যেন সেগুলির অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

● ব্রতে আমরা সচরাচর দেখি বিশেষ দেবতা বা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। বিশেষ দেবতা বা দেবীর অনুকম্পায় ব্রতিনী তার ইপ্সিত কামনা বাসনা চরিতার্থতার সুযোগ পায়। এই ব্রতকথাগুলি মঙ্গলকাব্যগুলির বীজ স্বরূপ অর্থাৎ পরবর্তীকালে প্রতিভাবান কবি ব্রতকথাকেই নানাভাবে দীর্ঘায়িত করে মঙ্গলকাব্যে রূপায়িত করেছেন। তাই ভাবের দিক থেকে ব্রতকথা এবং মঙ্গলকাব্যের গভীর সাযুজ্য।

আমরা যদি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করি তবে লক্ষ্য করব ব্রতকথাগুলি সমসাময়িক সমাজজীবনের নির্ভরযোগ্য দলিলে রূপায়িত হয়েছে। সেদিক দিয়েও ব্রতকথাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষত সমাজতত্ত্ববিদের কাছে।

ব্রতের সমাপ্তি ঘটে ব্রতকথার মধ্য দিয়ে। একজন ব্রতকথা বলে যান অন্যজন মনোযোগ সহকারে তা শোনেন। ব্রতকথা কথনের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ভঙ্গি রক্ষিত হয়। এ নিছক কোন গদ্যগ্রন্থের Reading পড়া নয়, ভাব ও বিষয় অনুযায়ী বাক্যগুলি উচ্চারিত হয় উপযুক্ত বিরতি অথবা কণ্ঠস্বরের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ব্রতকথা পাঠের একটা নিজস্ব শৈলী আছে। এ শৈলী সকলের অধিগত করা সম্ভব নয়।

ঘ. ❐ লোকাচার ঃ

Custom-এর বাংলা হল প্রথা অন্যদিকে Ritual-এর বাংলা হল— লোকাচার। প্রশ্ন হল দুটি যেমন পৃথক শব্দ, তেমনি দুটি পৃথক শব্দের অর্থও কি তাই? অর্থাৎ প্রথা এবং লোকাচার কি অভিন্ন।

রাজতন্ত্রে রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ যুবরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতেন বা এখনও হন। এটি হল প্রথা। বলাবাহুল্য প্রথা প্রকৃতিতে অনেকখানি অনমনীয় এবং অনেকটাই যেন আইনানুগ।

আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা , কিন্তু মাতৃবাচক শব্দ পিতৃবাচক শব্দের পূর্বে উচ্চারিত হবার রীতি। রীতি এবং প্রথা এক। প্রথা এবং লোকাচার উভয়ই ঐতিহ্যনির্ভর নিঃসন্দেহে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ দেখা যায় প্রথা এবং লোকাচার দু'য়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যেমন পিতার মৃত্যুর পর বাঙালী হিন্দু পরিবারে জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখাগ্নি করে। এটা প্রথাও বটে লোকাচারও বটে। কিংবা জ্যেষ্ঠ সন্তানই পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের অধিকারী।

বিবাহে অথবা অন্য মাঙ্গালিক সামাজিক কাজের আমন্ত্রণ লিপি কখনই কালো অক্ষরে মুদ্রিত হয় না। লাল অক্ষরে মুদ্রিত হয় যেহেতু লাল রঙটিকে শুভের দ্যোতক রূপে জ্ঞান করা হয়। এটি লোকাচারের নিদর্শন। হিন্দু বিধবা রমণীরা অনেকেই কোনও আমিষ আহার্য গ্রহণ করেন না। এটিও লোকাচার। আমন্ত্রণ লিপি অবশ্যই পারিবারিক কাজে যিনি পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান তার নামে মুদ্রিত হয়। এটিকে আমরা প্রথা বা লোকাচার বলতে পারি। দুয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। তা হল-সকল বিষয়ে লোকাচার হয় না। কিন্তু প্রথা যে কোন বিষয়েই হতে পারে। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকাচার এবং প্রথার বিভিন্নতা লক্ষণীয়। প্রথার সঙ্গে মূলত পরিশীলিত সমাজের যোগ। অন্যদিকে লোকাচার সম্পূর্ণরূপে লোকসমাজের। লোকসমাজ লোকাচারগুলিকে নিষ্ঠা সহকারে মান্য করে চলে। প্রথার সঙ্গে শুভ বা অশুভর যোগ নেই। কিন্তু লোকাচারের সঙ্গে শুভ-অশুভের যোগ রয়েছে। লোকসমাজ তাই সহজে লোকাচার ভাঙতে চায় না এক অজানা আশঙ্কায়। অন্যদিকে প্রথার সঙ্গে অভ্যাস বা সংস্কারের যোগ।

আমরা এইবার বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকাচারগুলির পরিচয় নেব।

১. শিক্ষা সংক্রান্ত ঃ

ক. হাতে খড়ির আগে শিশুকে নিয়মিত লেখাপড়া শেখানো হয় না। আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন এই লোকাচার চলে এসেছে।

খ. লেখাপড়ার সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ—বই, খাতা, কলম-এর উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়, সেগুলিকে মান্য করা হয়। পা ঠেকলে নমস্কার করা হয়। বিশ্বাস করা হয় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্ষুণ্ণ হবেন।

গ. নতুন বই শ্রীপঞ্চমীর দিন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কাছে নিবেদন করা হয় তাঁর আশীর্বাদ পূত করার জন্য।

২. আহার্য সংক্রান্ত ঃ

ক. সরস্বতী পূজার পূর্বে অনেকেই কুল খায় না। সরস্বতীকে নিবেদন করার পর খায়।

খ. নবান্ন না হওয়া পর্যন্ত অনেকেই নতুন গুড় বা নতুন চালে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করে না।

৩. পরিচ্ছদ সংক্রান্ত ঃ

ক. নতুন পরিচ্ছদ না কেচে পরা হয় না।

খ. পিতামাতা জীবিত থাকতে পুত্র থান কাপড় পরে না।

৪. বিবাহ সংক্রান্ত ঃ

ক. এক গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

খ. জ্যেষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ সন্তানের বিবাহ হয় না।

গ. বিবাহে পাত্রের তুলনায় পাত্রীর কম বয়স স্বীকৃত।

ঘ. ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই তিনমাস বিবাহের জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও বিবাহে জলসওয়া, সন্তানসম্ভবা রমণীর সন্তান প্রসবের আগে সাধ ভক্ষণ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন সংক্রান্ত নানা লোকাচার আজও সমাজে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। লোকাচার ভাঙ্গালে তা নিন্দনীয় হয় কিন্তু তা শাস্তির উপযুক্ত নয়।

ঙ. ☐ লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ঃ

আপাতভাবে মনে হবে বুঝি বা লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার অভিন্ন কিন্তু আসলে তা নয়, দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা পরিশীলিত মানুষের মধ্যেকার বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে লোকসমাজে পরিচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা সেরে নেব।

আমাদের প্রচলিত ধারণা এই যে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ইত্যাদিই মানুষকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যতই শিক্ষার প্রসার ঘটবে, মানুষের বিজ্ঞানচেতনা বাড়বে ততই অর্থহীন বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রাধান্যও কমবে। এই ধারণার কিছুটা সত্যতা আছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে এই সত্য অনস্বীকার্য যে বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে নিছক শিক্ষাহীনতা অথবা নিরক্ষতার সম্পর্ক আছে তা নয়। এর প্রমাণ পাশ্চাত্য জগতের উচ্চশিক্ষিত দেশগুলিতেও দেখা যায়। কমবেশী অনেকেই বিশ্বাস এবং সংস্কারের শিকার। এশিয়ার জাপান থেকে শুরু করে ইউরোপের জার্মানী, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—এমন কোন দেশ মিলবে না যে দেশের মানুষ নাকি বিশ্বাস এবং সংস্কারের ধার ধারে না।

আসলে বিশেষ ধরনের কতকগুলি কারণে মানুষ বিশ্বাস এবং সংস্কারে বিশ্বাসী হয় ; এগুলির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যতই বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটুক, প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি সাধিত হোক তথাপি মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান আজও হয় নি। অদূর ভবিষ্যতেও হবে এমন আশা করা যায় না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত,

ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি যেমন রয়ে গেছে, তেমনি রয়ে গেছে এমন অনেক মহামারী কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধি যেগুলি আমরা আজও ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না অথবা ঠিকমত নিরাময় করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারি না। এইসব কারণে মানুষ বিশ্বাস-সংস্কার নির্ভর হয় প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রমনের আশায়। মানুষের মধ্যে এমন এক আন্তর দুর্বলতা রয়ে গেছে যে কারণে মানুষ বিশ্বাস সংস্কার থেকে কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারে না। যে বিষয়ের ফলাফল অনিশ্চিত, যার পরিণতি আমাদের জানা নেই সেক্ষেত্রে বিশ্বাস-সংস্কারকে অবলম্বন করে আমরা লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করি। তাছাড়াও দেখা যাবে যে ব্যক্তি যত বেশী সাফল্যের শিখরে আহরণ করে সেই ব্যক্তিরই সংস্কার নির্ভরতা তত বেশী, এর মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। দেখা যায় দুই শ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস সংস্কারের উপর বেশী করে নির্ভরশীল— এক শ্রেণীর মানুষ যারা উচ্চাভিলাষী, আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা যে সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে অভিলাষী।

পরিশীলিত সমাজের মানুষ নিজস্ব যেসব বিশ্বাস অথবা সংস্কারগুলিকে মেনে চলে তাকে আমরা কখনই লোকবিশ্বাস বা সংস্কারের পর্যায়ে ফেলিনা। এগুলো একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হবে—

১. যে ছাত্র জীবনের প্রথম পরীক্ষায় যে কলম দিয়ে লিখে ভাল ফল করেছে তার স্বাভাবিক দুর্বলতা দেখা যাবে পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতেও সেই কলম ব্যবহার করতে। তার মনে এই রকম বিশ্বাস জন্মাবে যে ঐ কলমে লিখলেই তার সাফল্য করায়ত্ত হবে।

২. যে ক্রিকেট খেলোয়াড় যে ব্যাটে জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী করেন তার স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকবে সেই ব্যাটের উপর এবং এই ব্যাটে খেললে তার সেঞ্চুরী হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্য খেলোয়াড়রা না হোক তিনি অন্তত এতেই খেলতে চাইবেন। এগুলি হল ব্যক্তিগত বিশ্বাস-সংস্কারের দৃষ্টান্ত। এগুলির সঙ্গে ঐতিহ্য বা পরম্পরার কোন সম্পর্ক নেই। তবে এগুলির সঙ্গে অবচেতন ভাবে জাদু প্রতীতি বা বস্তুর অন্তর্গত অলৌকিক শক্তিতে আস্থার উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত আছে। অপরপক্ষে লোকবিশ্বাস এবং সংস্কারের সঙ্গে পরম্পরার যোগ। যে বিশ্বাস এবং সংস্কার পরম্পরাগতভাবে একটি সংহত লোকসমাজের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে বসে তাকেই বলা হবে লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কার। যেমন—

(ক) তিন বামুনে যাত্রা করতে নেই

(খ) এক শালিক দেখা অশুভ

(গ) যাত্রাকালে হাঁচি, টিকটিকির বাধা পড়লে যাত্রা স্থগিত রাখতে হয় (হাঁচি টিকটিকি বাধা— যেনা মানে সে গাধা)

(ঘ) কাউকে তিনটে জিনিস দিতে নেই, দিলে সে শত্রু হয়

এখন প্রশ্ন হল লোকবিশ্বাস এবং সংস্কারের পার্থক্য কোথায়? কোন একটি বিষয়ে মনে মনে যখন আমরা আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করি গোষ্ঠীগতভাবে তখন তাকে বলা হয় লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তিক হলে তা আমাদের আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ যখন বিশ্বাসকে আমরা প্রাত্যহিক আচরণে রূপায়িত করি, বাস্তবায়িত করি তখন তা হয়ে ওঠে লোকসংস্কার। যেমন এক শালিখ দেখা অশুভ। এই ধারণাটা যদি মনের মধ্যে থেকে যায় বাস্তবে যদি তার প্রভাব না পড়ে তবে সেটি লোকবিশ্বাসই থেকে

যায়। তবে যে মুহূর্তে এক শালিখ দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়, অশুভ আশঙ্কায় আমরা চিন্তিত হই, আমাদের আচরণে ব্যবহারে তা প্রতিফলিত হয় তখন সেটি সংস্কার রূপে পরিগণিত হয়।

এইবার আমরা সংস্কারের অন্য একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করব। সংস্কার হলেই তার প্রসঙ্গে 'কু' বিশেষণটি স্বতঃই আমাদের মনে আসে। কিন্তু সংস্কার সব সময়ই ক্ষতিকারক তা কিন্তু নয়। অনেক সময় সংস্কারের মাধ্যমে মানুষকে অভিপ্রেত কাজটি করিয়ে নেওয়া হয় অথবা অনভিপ্রেত কাজে তাকে বিরত রাখা হয়। যেমন হাতে লবণ দিতে নেই। লবণ ক্ষার পদার্থ, হাতে এটি লেগে থাকলে অসাবধানতা বশত যদি সেই হাত চোখে দেওয়া হয় তবে চোখ জ্বালা করা সম্ভব। কিংবা ধরা যাক, রাতের বেলা জোনাকি পোকা ধরতে নেই এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। জোনাকি পোকার গায়ে এক ধরণের রাসায়নিক উপাদান থাকে যা কোন ক্রমে পেটে গেলে পেট খারাপ হওয়া সম্ভব। বালিশে বসতে নেই, কেননা বসলে পেছনে ফোঁড়া হয় বলা হয়। একথা ঠিক যে বালিশে বসার সঙ্গে ফোঁড়া হবার কোন যুক্তি নেই, সম্পূর্ণ অবাস্তব। বাস্তব হল বালিশে বসলে বালিশ ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা তাই ফোঁড়া হবার ভয় দেখিয়ে বালিশে বসা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিহিত পরিচ্ছদ সেলাই করতে নেই। আমরা এর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাটি পাই এইভাবে যে পরিহিত অবস্থায় সেলাই করলে সামান্য অসাবধানে সূঁচ পরিচ্ছদ পরিধানকারীকে বিদ্ধ করতে পারে। শিশুর জামা-কাপড় সন্ধ্যার আগেই তুলে নেবার কথা বলা হয়েছে, এর কারণ সন্ধ্যার পরে তুললে সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেক বিষাক্ত কীটপতঙ্গ শিশুর জামার মধ্যে থেকে যেতে পারে বা ব্যবহৃত কাঁথা বা অন্যান্য উপাদানে তারা আশ্রয় নিতে পারে সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে শিশুর ব্যবহারের সময় এই সব কীটপতঙ্গ শিশুর ক্ষতি করতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা রমণীর সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে যাওয়া নিষেধ। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এমনিতেই শরীর দুর্বল থাকে। তার উপর পিচ্ছিলতার মধ্যে পা হড়কে পড়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা রমণী ও তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে কখনই এমন কথা বলা যাবে না যে সব সংস্কারই উপযুক্ত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন বহু সংস্কারের সন্ধান মিলবে যেগুলির কোন ব্যাখ্যা নেই। একথা ঠিকই যে মানুষ যতই বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, যতই তার ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে, যতই সে যুক্তি তর্কে আস্থাশীল হবে ততই বিশ্বাস এবং সংস্কারে বিশ্বাস তার শিথিল হবে। তাই শিক্ষার সম্প্রসারণ সবিশেষ কাম্য। নতুবা অর্থহীন অথবা কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ তার পরিবারের সমাজের তথা রাষ্ট্রের অকল্পনীয় ক্ষতিসাধন করতে পারে।

২.২.২ ❐ চারু ও কারুশিল্প

ক. ❐ লোকসঙ্গীত ঃ

কবি গেয়েছেন

কি জাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে

গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

কবি এখানে বাংলা গানের প্রাণ-মাতানো সুর এবং তার সর্বাত্মক ব্যাপি প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। আমাদের বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল ইসলাম, রজনীকান্ত সেন এবং অন্যান্যরা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য এই ধরনের পরিশীলিত সঙ্গীত নয়। এখানে আমাদের আলোচ্য হল বাংলার লোকসঙ্গীত।

প্রথমেই আমাদের বুঝে নিতে হবে লোকসঙ্গীত বলতে কি বোঝায়। সোজাভাবে বলতে গেলে একইরূপ ভৌগোলিক পরিবেশে কমবেশী একই রূপ জীবন-দর্শনের অধিকারী হয়ে একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী যে লোকসমাজ তাদের দ্বারা যে সব গান গাওয়া হয়, তারা যে সব গান আস্বাদন করে, যে সব গানের মধ্য দিয়ে লোকসমাজের জীবন মূর্ত হয়ে ওঠে তাই হল লোকসঙ্গীত।

পরিশীলিত সঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের যত না মিল তার থেকে গরমিলের পরিমাণই অধিক। আমরা পরিশীলিত সঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের তুলনা করলেই লোকসঙ্গীতের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেবে।

একথা ঠিকই যে সঙ্গীত মাত্রই তা আনন্দ দেয় মানুষকে। এ সত্য পরিশীলিত সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এইবার দেখা যাক পার্থক্য কতখানি।

- ❑ পরিশীলিত সঙ্গীত মূলত তিন পৃথক ব্যক্তির অবদান সম্বলিত। একজন হলেন সঙ্গীতের গীতিকার, যার কাজ সঙ্গীতের বাণী রচনা করা। দ্বিতীয় জন হলেন সুরকার যিনি গানের বাণীর ভাবকে সম্যকভাবে সুরারোপিত করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয়জন শিল্পী, যিনি পূর্বোক্ত দুজনের সৃষ্টি পরিবেশন করে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা পরিচিত করেন। কদাচিৎ একই ব্যক্তিকে দেখা যায় এই তিনজনেরই ভূমিকায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুর্লভ গুণটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই তিন পৃথক সত্তার স্পষ্টবিভাজন অধিকাংশ সময়েই ধরা যায় না। মূলত লোকসঙ্গীতের বাণীরূপ ঐতিহ্যানুসারী। অর্থাৎ মুখে মুখে এর প্রচার হয়ে এসেছে। তার রচয়িতার সন্ধান মেলে না। আবার কখনো কখনো মেলেও। যেমন পাগলাকানাই, হাছন রাজা, লালন ফকির, ভবপ্রীতানন্দ। পরিশীলিত সঙ্গীতের যেহেতু প্রতিটি গানের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সুরকার, তাই প্রতিটি গানেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরকারের পরিচয় মেলে না, কেননা বাণীরূপের মত সুরও ঐতিহ্যানুসারী। কেবল লোকসঙ্গীতের পরিবেশনকারী শিল্পীর সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটে।
- ❑ লোকসঙ্গীতের একই পর্যায়ের গানে একই সুর রক্ষিত হয়। যেমন তামাম টুসু, ভাদু, গম্ভীরা, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া ; মোটামুটি একইরূপ সুর-কাঠামোকে ধরে রাখা হয়। কিন্তু সব রবীন্দ্রসঙ্গীত, সব দ্বিজেন্দ্রগীতি, সব অতুলপ্রসাদী কি একই সুর কাঠামোয় স্থাপিত ? কখনই নয়। অর্থাৎ পরিশীলিত সঙ্গীতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।
- ❑ পরিশীলিত সঙ্গীত রীতিমত অনুশীলন সাধ্য। গুরুর কাছে নিয়মিত তালিম নিতে হয়। প্রতিদিন গলা সাধতে হয়। কিন্তু লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।

- পরিশীলিত সঙ্গীতের যে-কেউই শ্রোতা হতে পারেন (বোদ্ধা না হলেও) কিন্তু শিল্পী সকলে হয় না। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা যায় লোকসমাজের সকলেই কমবেশী শিল্পী ; কেননা এমন এক বাতাবরণে তাঁরা মানুষ হয়েছেন, যেখানে প্রকৃতির আলো হাওয়ার মতই সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনায় তাঁরা বর্ধিত হন তাই মনোযোগ নিয়ে লোকসঙ্গীতের তালিম না নিয়েও অনেকেই দিব্যি গাইতে পারেন। এবং তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত হয়ত বা সহজাতই একটা গায়নভঙ্গী তৈরি হয়ে যায়, যা ঐ এলাকার নিজস্ব গীতরীতির পক্ষে একান্তই মানানসই একটি প্রকাশরূপ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এটার নাম দিয়েছিলেন "ফোকটিম্বার।" ভাওয়াইয়া, চটকা, ভাটিয়ালি, ঝুমুর সব ধরনের বাংলা লোকগীতির ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। তবে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, একদিকে যেমন তাঁদের শিল্পী প্রতিভা রয়েছে অন্যদিকে তাঁরা সঙ্গীতের তালিমও নিয়ে থাকেন এ সত্য অনস্বীকার্য। উত্তরবঙ্গে দেখা যাবে রাজবংশী সমাজের বহু মানুষই দিব্যি ভাওয়াইয়া গাইতে পারে।

- পরিশীলিত সঙ্গীত খুব বেশী পরিমাণে সঙ্গীতের ব্যাকরণ নির্ভর, নিয়মনিষ্ঠ। অপর দিকে লোকসঙ্গীত সে দিক থেকে অনেকখানি উদার এবং নমনীয়।

- পরিশীলিত সঙ্গীত, বিশেষত মার্গসঙ্গীত ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিচিত এবং স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানে এ সঙ্গীতের সুরগত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ধরা যাক ভৈরবী রাগে খেয়াল গান যে কোন শিল্পী যে কোন স্থানে একই তাল লয়ে একই সুর-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে পরিবেশন করবেন। গুণগত উৎকর্ষে ইতরবিশেষ পার্থক্য থাকতেও পারে এবং থাকবে কিন্তু সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য একই রূপ থাকবে। লোকসঙ্গীতের এমনতর ব্যাপক প্রচার নেই। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের মত লোকসঙ্গীত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে পরিচিত। শুধু তাই নয় লোকসঙ্গীতে আঞ্চলিকতার ধর্ম রক্ষিত হয়ে থাকে, ভাষায় তো বটেই এমন কি ভাবেও। আমাদের লোকসঙ্গীতের তিনটি বিভাগ। পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের ভাটিয়ালী, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ও চটকা, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের অর্থাৎ পুরুলিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ঝুমুর অবশ্য এর সঙ্গে আমরা বীরভূমের বাউলকেও যুক্ত করে নিতে পারি। এই হল আমাদের প্রধান লেকসঙ্গীত। এছাড়াও আরো নানা লোকসঙ্গীত নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

- পরিশীলিত সঙ্গীতে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হবার অবকাশ আছে, হয়েও থাকে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রাদি। কিন্তু লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্য যেমন কম তেমন নির্দিষ্ট কিছু বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন ঢোল, বাঁশের বাঁশি, ব্যানা, সারিন্দা, একতারা, দোতারা, গাবগুবাগুব, মাদল ইত্যাদি। অবশ্য হারমোনিয়াম ও তবলা এখন প্রায় সব লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

- আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটা ধারণা আছে এই রকম যে, ব্যক্তিনামাঙ্কিত গান কখনোই লোকসঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে না। এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ এই তত্ত্ব মেনে নিলে লালন ফকির, ভবশ্রীতা, পাগলা কানাই, হাছনরাজা প্রমুখের রচনাকে লোকসঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া যায় না। আসলে ব্যষ্টি রচিত সঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের পার্থক্য হল পরিশীলিত সঙ্গীতে গীতিকারের ব্যক্তিগত ধ্যান

ধারণাই মূর্ত হয়ে ওঠে, অনেক ক্ষেত্রেই আবার সেই বক্তব্য ফরমায়েসী। কিন্তু লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে রচনা ব্যক্তি বিশেষের হাওয়ার পরে তা সামগ্রিক ভাবে লোকসমাজের গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে একটা স্বীকৃত রূপ লাভ করে। তখন ঐ রচনা আর ব্যক্তির রচনা থাকে না, সমগ্র লোকসমাজের সম্পদে পরিণত হয়। বলা যায় লোকসঙ্গীতের রচয়িতা সমগ্র লোকসমাজের মুখপাত্র হিসাবে লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-সাফল্য সবকিছু অনুভূতিকেই রূপদান করে। লোকসঙ্গীতে উচ্চকণ্ঠে উদাত্ত কণ্ঠে গীত হবার প্রবণতা। লোকসঙ্গীতে দেখা যাবে লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অনাবিল ভাবে অকপটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

খ. ❐ লোকনৃত্য

বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির একটি অপরিহার্য উপাদান হল লোকনৃত্য। অঙ্গাভঙ্গি-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত হল লোকনৃত্য। এখন প্রশ্ন হল, লোকনৃত্য কাকে বলব? লোকসমাজে যে সব নৃত্য প্রচলিত সহজ কথায় তাকেই লোকনৃত্য বলা চলে।

নৃত্যের উদ্ভব ইতিহাসের সঙ্গে রয়েছে মানুষের টিকে থাকার, সংগ্রামের ইতিহাস। শিকারে সাফল্যলাভ করলে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা আনন্দে নৃত্যরত হত। কিংবা এক গোষ্ঠী যখন অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হত এবং সাফল্য অর্জন করত, তখন সেই সাফল্যের আনন্দে সকলে নৃত্যানুষ্ঠানে মেতে উঠত।

লোকসমাজ যা কিছু করে তা সবই সমষ্টিগত। তাদের পূজার্চনা সমষ্টিগত, উৎসবে অংশগ্রহণ সমষ্টিগতভাবে, সঙ্গীত সমষ্টিগতভাবে, নৃত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। দু একটি বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত লোকনৃত্য মাত্রেই সমষ্টি নৃত্য।

অনেকের ধারণা, বুঝিবা লোকনৃত্য ব্যাকরণ মানেনা, এ নৃত্য নৃত্যের ব্যাকরণ বহির্ভূত। তা কিন্তু নয়। তবে পরিশীলিত তথা মার্গীয় নৃত্যের সঙ্গে লোকনৃত্যের যে পার্থক্য তা হল লোকনৃত্য মার্গীয় নৃত্যের মত গুরুনির্ভর নয়। লোকসমাজের সকলেই জন্মাবধি লোকসঙ্গীতের মত লোকনৃত্যের সঙ্গেও পরিচিত। এ নৃত্য পৃথকভাবে শিখতে হয় না। দেখে দেখেই শেখে লোকসমাজের সকলে বা ইচ্ছুক ব্যক্তিরা। লোকনৃত্যের শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না। পরিশীলিত নৃত্যের মত লোকনৃত্য অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ নয়। এ নৃত্যকলায় পরিশীলিত নৃত্যের সূক্ষ্মতা এবং বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। কিন্তু এতে শিল্পীদের যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও জীবনাসক্তির প্রকাশ ঘটে সহজেই তা দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

পরিশীলিত নৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পী বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত হয়, কিন্তু লোকনৃত্যের শিল্পীদের নৃত্য সজ্জা যৎসামান্য, অনেকসময় প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য পরিচ্ছদই তাদের সম্বল হয়ে ওঠে। লোকনৃত্য আনুষ্ঠানিকতার সূত্রে উদ্ভূত হয়ে থাকলেও বর্তমানে সেগুলি অনানুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত। পরিশীলিত নৃত্যের পরিচিতি ও প্রসার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, কিন্তু লোকনৃত্যের পরিচয় অঞ্চলবিশেষেই সীমাবদ্ধ। লোকনাট্য, লোকসঙ্গীতের মতো তা আঞ্চলিক ধর্ম রক্ষা করে চলে।

আমরা এইবারে বাংলার সাংস্কৃতিক বলয়ে প্রচলিত বিশেষ কয়েকটি লোকনৃত্যের পরিচয় গ্রহণ করব।

ক. মুখাখেল ঃ

প্রান্ত উত্তরবঙ্গে মুখোশকে বলা হয় 'মুখা'। 'মুখাখেল' হল মুখোশ পরিধান করে যে নৃত্য গীতাদি অভিনয় সম্পন্ন করা হয়। পূর্ব্বে মুখা খেইল বা মুখা খেলা ছিল একান্তভাবে আনুষ্ঠানিক। বছরের নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে কোনো নির্দিষ্ট দেবতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে এ নৃত্যানুষ্ঠান আর আনুষ্ঠানিকতায় বাধা পড়ে নেই। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা যে সব মুখোশ ব্যবহার করে সেগুলির কিছু যেমন মানুষের তেমনি কিছু মনুষ্যেতর প্রাণীদের।

খ. রায়বেঁশে ঃ

রায় বেঁশে নৃত্যের প্রচলন বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। এই নৃত্যশৈলীকে সর্ব সাধারণের কাছে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে গুরুসদয় দত্তের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রায়বেঁশে হল এক ধরনের যুদ্ধ নৃত্য। রায় বাঁশ কথাটির অর্থ হল পাকা বাঁশ। পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে শিল্পীরা যে নৃত্যানুষ্ঠান করে তাকেই বলা হয় রায়বেঁশে নৃত্য। এ নৃত্য গোষ্ঠীনৃত্য। রায়বেঁশে নৃত্যের সঙ্গে যে সব লোকবাদ্য বাজে তা হল ঢাক ও কাঁসী, কখনও কখনও ঢাকের পরিবর্তে ঢোলও বাজে। শিল্পীরা পায়ে নূপুর পরিধান করে নৃত্য পরিবেশন করে। শিল্পীদের দেহের উর্ধ্বাঙ্গে থাকে মালকোঁচা করে পরা ধুতি, কোমরে থাকে গামছা বাঁধা। শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনই হল এই নৃত্যের মুখ্য আকর্ষণ। বাগদি, বাউড়ি, ডোম প্রভৃতিদের মধ্যেই এই নৃত্যের চল ছিল বিশেষভাবে।

গ. ঢালি নৃত্য ঃ

ঢালি নৃত্য সমবেত এবং অন্যতম যুদ্ধ নৃত্য। বিস্মৃতপ্রায় এই নৃত্যের প্রবর্তনেও গুরুসদয় দত্তের অবিস্মরণীয় ভূমিকা স্মর্তব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মঙ্গলকাব্যগুলিতে যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঢালি সৈন্যদের উল্লেখ লভ্য। একদা এক হাতে ঢাল এবং অন্যহাতে লাঠি অথবা বর্শা কিংবা অসিসহ যে সৈন্যরা যুদ্ধরত হত, তাদের পরিচিতি ছিল ঢালি সৈন্য রূপে। বর্তমানে ঢালি নৃত্য লোকনৃত্যের প্রকারভেদ মাত্র। এই নৃত্যকলাটি খুবই উন্মাদনাময়। আক্রমণ এবং প্রতিরোধের ভঙ্গিতে এই নৃত্যকলা দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় বলে প্রতিভাত। এই নৃত্যের দুটি স্পষ্ট বিভাগ— আক্রমণাত্মক নৃত্য এবং আত্মরক্ষাত্মক নৃত্য। তিনজন শিল্পী একসঙ্গে নৃত্য করে। কখনও অপর দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শিল্পীরা কৃত্রিম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

শিল্পীদের পরিধানে থাকে মালকোঁচা করে পরা ধুতি, মাথায় থাকে লাল ফেট্টি, হাতের মণিবন্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত, সর্বোপরি হাতে থাকে বর্শা ঢাল।

ঘ. পাইক নৃত্য ঃ

পাইকনৃত্যের চল রয়েছে মেদিনীপুর জেলায় এবং বাঁকুড়া জেলায়। যখন জমিদারী প্রথা কায়েম ছিল

তখন জমিদার ভূস্বামী বা ভূম্যধিকারীরা নিজেদের প্রশাসন ও শোষণ-পীড়ন চালানোর জন্য পাইক রাখতেন। পাইকের বৃত্তি গ্রহণ করত সাধারণত হাড়ি-ডোম, বাগ্‌দীর মত জাতিভুক্ত বলিষ্ঠ লোকেরা। এরা শরীরচর্চার অঙ্গ স্বরূপ নিয়মিত লাঠি খেলত, কুস্তি লড়ত। এইভাবে লাঠিচালনা কলাকৌশল ও যুদ্ধের কৃত্রিম মহড়া থেকে পাইকনৃত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মূলতঃ পাইকনৃত্য নির্ভরশীল লাঠি চালানোর উপর। আক্রমণ ও প্রতিরোধের ভঙ্গি হল পাইক নাচের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্যে বাজে ধামসা ও নাকাড়া। পাইকনৃত্য মূলত গোষ্ঠী নৃত্য, তবে একক নৃত্য রূপেও এর চল আছে।

ঙ. বৌ নাচ ঃ

বৌ নাচের প্রচলন আছে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায়, মৈমনসিংহে, কাছাড়ে, ত্রিপুরায়। বধূবরণের এটি অপরিহার্য অঙ্গ। বৌ নাচের সঙ্গে তালবাদ্যে অংশ নেয় ঢোল বাদক, কাঁসি বাদক এবং সানাই বাদক। প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় ধামাইল নৃত্য। এরপর বরণ করে নেওয়া হয় নববধূকে। বরণকরে এয়োস্ত্রীরা। তারপর নববধূকে নৃত্য করার জন্য বলা হয়। বৌ-নাচ বলাবাহুল্য একক নৃত্য। এই নৃত্যের সঙ্গে গীত পরিবেশিত হয়। নববধূ প্রথমে ভূমি বন্দনা করে নেয়, তারপর বন্দনা করে দেবতার, এমনকি গুরুজনদেরও। তারপর শুরু হয় নৃত্য-প্রদর্শন। বৌ নাচের উদ্দেশ্য হল নবধূর নৃত্য শৈলীর পরীক্ষা গ্রহণ। নববধূ আকর্ষণীয় সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নৃত্যে অংশ নেয়। নৃত্যের সময় বধূ দৃষ্টি বিনিময় করে না, শির কিংবা গ্রীবাভাগ দোলায় না। এমনকি পা তুলে নৃত্য করে না। পদযুগল ভূমিতেই লেগে থাকে। শুরুতে এই নৃত্যের লয় থাকে ধীর, ক্রমে তা দ্রুততর হয়।

চ. রাবণ কাটা নৃত্য ঃ

রাবণ কাটা নৃত্য একান্তভাবে পুরুষদের। এটি একটি আচারমূলক নৃত্যানুষ্ঠান। এই নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে কোনো গান পরিবেশিত হয় না। তবে নৃত্যের সঙ্গে বাজে ঢাক, ঢোল, সানাই এবং কাঁসি। এই নৃত্যের বিষয় হ'ল ইন্দ্রজিৎ-রাবণ ও কুম্ভকর্ণের রামচন্দ্রের কপি সৈন্যদের হাতে মৃত্যু বরণ। অনুষ্ঠানকাল দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথি থেকে দ্বাদশী। এই সময় প্রতি রাত্রে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। বানর সৈন্যবেশী শিল্পীদ্বয় পরিধান করে দুটি সাদারঙের এবং জাম্বুবান পরে কালো রঙের কাষ্ঠ নির্মিত মুখোশ। কুম্ভকর্ণের ও ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে এই নৃত্য শেষ হয়।

ছ. কালীকাচ বা কালীনাচ ঃ

এটিও একটি মুখোশ নৃত্য। কালীর মুখোশ পরিধান করে অথবা রঙ কালিতে কালী সেজে যে নৃত্যের চল, তাকেই বলা হয় কালীকাচ বা কালীনৃত্য। ঢাকা-মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল, মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ইত্যাদি অঞ্চলে এই নৃত্যের চল ছিল বা এখনও আছে। উল্লেখ্য পুরুষ মানুষই কালী সেজে নৃত্যরত হয়। এই নৃত্যে যে সব বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল ঢাক, কাঁসি, সিঙ্গা, রামসিঙ্গা ইত্যাদি। কালীবেশী শিল্পীর হাতে থাকে খাঁড়া বা তরোয়াল, অন্য আর এক হাতে থাকে প্রদীপ কিংবা কাগজ অথবা মাটির তৈরী নরমুণ্ড। কালীনাচে অনেক সময় শিবকেও দেখা যায়, কোথাও সঙ্গী হিসাবে পাই কার্তিক ও গণেশকে।

জ. কাঠিনাচ ঃ

এটি গোষ্ঠীনৃত্য। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলে, বাঁকুড়া জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের অন্যত্র এই নৃত্যের প্রচলন রয়েছে দেখা যায়। পুরুষ শিল্পীরা দুহাতে দুটি কাঠি নিয়ে নৃত্যরত হয়। পরণে থাকে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। ঢাক, কাঁসি ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় এই নৃত্যের সঙ্গে। নৃত্যরত শিল্পী এক হাতের লাঠি দিয়ে পাশের শিল্পীর লাঠিতে আঘাত করে, অন্য হাতের লাঠির সাহায্যে পার্শ্বস্থিত শিল্পীর আঘাত প্রতিহত করে। অতিদ্রুত লয়ে এই কাজটি সম্পাদিত হয়।

ঝ. রণপা নৃত্য ঃ

এটি একটি যুদ্ধনৃত্য এবং সম্মেলক নৃত্য। বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও মেদিনীপুর জেলায় এই নৃত্যের প্রচলন আছে। নৃত্যরত শিল্পী দুটি লম্বা বাঁশের তিনফুট উচ্চতায় পা রাখার স্থান রাখে। এই উচ্চতায় পা স্থাপন করে দৃঢ় হাতে বাঁশ দুটি ধরে লম্বা পদক্ষেপে সারিবদ্ধ ভাবে কখনও এগিয়ে কখনও বা পিছিয়ে আবার কখনও বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। সঙ্গে বাজে ঢোল এবং জগঝম্প। শিল্পীরা অনেক সময় যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হয়, সেক্ষেত্রে কাঁধে রাখে ঢাল, কোমর বন্ধে রাখে তরবারি।

ঞ. নাটুয়া ঃ

এই নৃত্যশৈলীর সাক্ষাৎ মিলবে পুরুলিয়ায়। এটি একটি গোষ্ঠীনৃত্য। শিল্পীরা পরিধান করে ধুতি দুহাতের বাহু থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত ফিতে অথবা কাপড়ের টুকরা লম্বা করে বাঁধে। শিল্পীরা এই নৃত্যে মূলত শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করে কখনও একসঙ্গে পিরামিড রচনা করে, আবার কখনও বা রিঙ এর মধ্য দিয়ে শরীরকে ঢুকিয়ে বের করে নেয়।

ট. ছৌ-নৃত্য ঃ

ছৌ-নৃত্য যুদ্ধ নৃত্য, এটি সমষ্টিনৃত্য এবং সর্বোপরি মুখোশনৃত্য। এই নৃত্যের উদ্ভব গাজন উৎসবের ভক্তাদের কাপঝাপ থেকে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে, বিহারের সেরাইকেল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে এই নৃত্যের চল আছে। গণেশ বন্দনা দিয়ে এই নৃত্যের সূচনা হয়। এই নৃত্যের সঙ্গে বাজে সানাই, ধামসা, ঢোল। পুরুলিয়ার ছৌ এ চড়িদার তৈরী মুখোশ ব্যবহৃত হয়। বীররসই এই নৃত্যের প্রধান রস। মহিষাসুর বধ, অভিমন্যুবধ, কিরাত-অর্জুন ইত্যাদি পালা নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। সাধারণত রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকেই উপজীব্য করা হয়।

গ. ❐ লোকনাট্য ঃ

Folk drama is a representation of actions in specified human life.

Folk drama-এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে লোকনাট্য, 'Folk'-এর বাংলা 'লোক' এবং 'drama'-র বাংলা হল 'নাট্য'। আমরা পরিশীলিত নাটকের সঙ্গে দীর্ঘকালাবধিই পরিচিত। শেক্সপীয়র বানার্ড শ'র নাম কে না-শুনেছে, কিংবা ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লিয়ার, দ্য মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস, দ্য আর্মস এণ্ড দ্য ম্যান এসব নাটকের কথা, আমাদের জানা, কিন্তু লোকনাট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয় এবং

দীর্ঘদিন ধরে লোকনাট্যের অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমরা অনবহিত ছিলাম। এমন নয় যে আগে লোকনাট্য সম্পর্কে আমাদের চেতনার উদয় হয়েছে তারপর লোকনাট্য রচিত হয়েছে। পরিশীলিত নাটকের পাশাপাশি লোকনাট্যের অস্তিত্ব ছিলই কিন্তু আমরা বিবিধ কারণে এগুলকে নাটক বলে মানিনি বা নাট্য পদবাচ্য বলে বিবেচনা করিনি।

আমাদের নাট্যবোধের মূলে কাজ করেছে ভরতের নাট্যশাস্ত্র কিংবা অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স, নিকলের থিওরি অফ ড্রামার মত গ্রন্থগুলি। আমরা নাটক বলতে বুঝে এসেছি যা মঞ্চে অভিনীত হয়, নারী ও পুরুষ বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়, মঞ্চ থেকে দর্শক আসনের একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান রক্ষা করা হয়, নাট্যকারের লিখিত নাটককে রূপ দেওয়া হয় মঞ্চে ; এই নাটক কয়েকটি অঙ্কে বিন্যস্ত, প্রতিটি অঙ্ক আবার কয়েকটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। নাট্যকারের লিখে দেওয়া সংলাপ কুশীলবরা বলে। দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নাটককে আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। চরিত্রগুলি পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ শুরুতে তারা যে অবস্থায় থাকে পরিণতিতে সে অবস্থায় থাকে না। নাটকের পরিণতি যদি মিলনের হয় তাকে আমরা মিলনান্তক অথবা কমেডি বলি, আর যদি মিল না হয় তবে তাকে বলি বিয়োগান্তক বা ট্রাজেডি। এ পর্যন্ত আমরা নাটক সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা করেছি তাতে এই নিরিখে প্রচলিত লোকনাট্যগুলিকে কখনোই নাটক বলে মনে হয় না। আমাদের লোকনাট্যগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ; এগুলির কোন লিখিত রূপ নেই। অভিনয়ের জন্য মঞ্চ লাগেনা। ড্রেসার বা মেকআপম্যানের সহায়তা নেওয়া হয় না, আলোকসজ্জার কোন আয়োজন তেমন ভাবে করতে হয় না। তা ছাড়াও সাধারণত এ গুলিতে সঙ্গীতের প্রাচুর্য্য তাই আমরা লোকনাট্য বলে যাদের অভিহিত ক'রে থাকি সেগুলি লোক-সমাজের কাছে কিন্তু সঙ্গীতিক পরিচয়েই পরিচিত। যেমন বোলানগান, গম্ভীরাগান, চোর-চুরনির গান, আলকাপ গান ইত্যাদি।

আমরা এবার আমাদের লোকনাট্যগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনায় প্রয়াস পাব। প্রথমেই আমরা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করব। গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি--

যে নাটক লোকসমাজের জন্য, লোকসমাজের এবং লোকসমাজের দ্বারাই অভিনীত ও আস্বাদিত হয় তাই হল লোকনাট্য।

এবারে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রসঙ্গ:

লোকনাট্যের জন্য কোন মঞ্চ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। বস্তুত পরিশীলিত নাটকের সঙ্গে লোকনাট্যের এইখানে একটি বড় পার্থক্য। লোকনাট্যের দর্শকেরা যে ভূমিতে আসন গ্রহণ করেন তাদেরই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে শিল্পীরা লোকনাট্যের অভিনয়ে অংশ নেন। লোকনাট্যের কুশীলব এবং দর্শকদের আক্ষরিক অর্থে সহাবস্থান লক্ষিত হয়।

লোকনাট্যের প্রথমাবধি লিখিত রূপ থাকে না। বর্তমানে কোন কোন লোকনাট্যের ক্ষেত্রে লিখিত রূপ মিললেও সংলাপগুলি তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়। আসলে পরিবেশের কথা চিন্তা করে, দর্শকদের চরিত্র বুঝে যে স্থানে লোকাভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে সে স্থানের কথা মনে রেখে একটি আখ্যানের পরিকল্পনা করে নেওয়া হয়, তারপর তাকেই রূপায়ণ করা হয়। লোকনাট্যের লিখিত রূপ না মেলার ফলে এগুলির বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত হবার প্রশ্ন ওঠেনা, কিংবা প্রতিটি অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্যে বিন্যস্ত হওয়ারও অবকাশ থাকে না। লোকনাট্য অভিনয়ের মঞ্চ না থাকায় মঞ্চসজ্জার প্রশ্ন নেই এমন কি পর্দা ফেলারও অবকাশ নেই। একদিক

থেকে বিচার করলে লোকনাট্য, আক্ষরিক অর্থে একই সঙ্গে কমিউনিটি ক্রিয়েশান এবং কমিউনিটি পারফর্মেন্সের নিদর্শন।

লোকনাট্যে অংশগ্রহণকারী কুশীলব অতি সাধারণ সজ্জায় সজ্জিত হন, তাই পরিশীলিত নাটকের বা যাত্রার মত ড্রেসার এর প্রয়োজন হয় না। চরিত্রগুলি সুলভ প্রসাধনী সামগ্রীতে সজ্জিত হয় এবং এগুলির ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেন। তাই মেক-আপ ম্যানেরও কোন প্রয়োজন হয় না।

পরিশীলিত নাটকে আলোক সম্পাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু লোকনাট্য তো মূলত গ্রামেই আয়োজিত হয় এবং বহু গ্রাম আজও বৈদ্যুতিক আলো-বঞ্চিত। তাই হ্যারিকেন বা হ্যাজাকের আলোতেই লোকনাট্যের অভিনয় হতে দেখা যায়।

লোকনাট্য শুরু হয় আসর বন্দনা দিয়ে। এখানেও পরিশীলিত নাটকের সঙ্গে লোকনাট্যের গুরুতর পার্থক্য। আসর বন্দনার মাধ্যমে কুশীলবরা দর্শক মণ্ডলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেনা। যেমন বিভিন্ন দেবদেবীকে স্মরণ করা হয় আসর বন্দনায় তেমনি দর্শক মণ্ডলীরও বন্দনা করা হয়।

বাংলার লোকনাট্যে নারী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করে এসেছেন বহুকাল ধরে। এখন অবশ্য এর কিছুটা পরিবর্তিত ঘটেছে। দীর্ঘকালাবধি যাত্রাপালা-নাটককে আমাদের সমাজ সুনজরে দেখে আসেনি। তাই ভদ্র ঘরের মেয়েদের অভিনয় জগতে আসাকে মেনে নেওয়া হয় নি। ইদানীং অবশ্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে লোকনাট্যে নারী চরিত্রে নারীরাই অবতীর্ণ হয় বেশী।

লোকনাট্যে সঙ্গীতের প্রাধান্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে অনেক সময় সঙ্গীত নাটকের সংলাপ রূপেও ব্যবহৃত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা করে বলতে হয় বলে কুশীলবরা কিছুটা অসাচ্ছন্দ্য বোধ ক'রে থাকে। সে তুলনায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত সঙ্গীতের ব্যবহারে সংলাপ কথনের দায় কম। মূলত এই কারণেই লোকনাট্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য।

প্রতিটি লোকনাট্যেই সঙ্গীত পরিচালনার জন্য বিশেষ একব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তবে তিনি যে সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী তা নন, তবে প্রচলিত জনপ্রিয় হিন্দি অথবা বাংলা গানের সুরে দিব্যি লোকনাট্যের জন্য গান তৈরী করে দেন। লোকনাট্যে সাধারণত যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে আছে হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, বাংলা ঢোল, সানাই, বেনা, দোতারা, খঞ্জনী ইত্যাদি।

লোকনাট্যগুলি আঞ্চলিকতার চিহ্নবাহী। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই একই লোকনাট্যের প্রচলন দেখা যাবে না। মালদহে দেখা যাবে গম্ভীরা, পশ্চিম দিনাজপুরে খনের গান, দঃ ২৪ পরগণায় বনবিবির পালা, জলপাইগুড়িতে চোর-চুরনীর গান, কোচবিহারে কুশানে পালা, মুর্শিদাবাদের আলকাপ, নদীয়ার বোলান ইত্যাদি।

লোকনাট্যগুলির অভিনয় কালের মেয়াদ খুব বেশী দীর্ঘ হয় না। সচরাচর তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই একটি পালার অভিনয় শেষ হয়।

লোকনাট্যে বহু চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায় না। আর এই না দেখার কারণ রয়েছে। প্রথমত অভিনয় করার ক্ষমতা বেশী লোকের মধ্যে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত সংলাপ তাৎক্ষণিক ভাবে বলতে হয় বলেও একই দৃশ্যে অনেকগুলি চরিত্রকে উপস্থিত করা হয় না।

লোকনাট্যে শুধু বিনোদনের উপাদান থাকে তাই নয়, তাতে শিক্ষার ব্যাপারও থাকে। বস্তুতপক্ষে একদিক দিয়ে লোকনাট্য হ'ল লোকশিক্ষার মাধ্যম। প্রতিটি নাটকের শেষে দর্শকের কাছে যে আদর্শটি তুলে ধরা হয় তা হ'ল ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়। শেষপর্যন্ত পুণ্যাত্মা ব্যক্তি সাফল্যলাভ করেন, পাপী যে সে শাস্তি পায়।

লোকনাট্যগুলির কিছু আনুষ্ঠানিক আবার কিছু অনানুষ্ঠানিক। যে নাটকগুলি অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আয়োজিত হয় না বা হতে পারে না, সেগুলিকে বলা হয় আনুষ্ঠানিক আর অনুষ্ঠান ছাড়াই যে নাটকগুলি অভিনীত হয় সেগুলি হল অনানুষ্ঠানিক। এখন বহু আনুষ্ঠানিক নাটকই অনানুষ্ঠানিক নাটকে পর্যবসিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুর নিরিখে লোকনাট্য মূলত দুই শ্রেণীর। পৌরাণিক এবং সামাজিক, কদাচিৎ ঐতিহাসিক নাটক লক্ষিত হয়। তবে পরিচিত ঘটনার রূপায়ণের কারণে, সামাজিক নাট্যই বেশী রসাস্বাদিত হয়। লোকনাট্যের দর্শকমণ্ডলী মোটা দাগের বিনোদনে বিশ্বাসী বলে লোকনাট্যে স্থূলত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অনেক সময় লোকনাট্যে নানা অন্যায়-অত্যাচার এবং অসম আচরণের প্রতিবাদ স্থান পায়। বস্তুতপক্ষে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিবাদী মানসিকতা।

বাংলা লোকনাটকের পরিচয় (জেলাভিত্তিক)

বনবিবির পালা	—	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
বোলান	—	নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম
লেটো	—	বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি
আলকাপ	—	মুর্শিদাবাদ
গম্ভীরা	—	মালদহ
নটুয়া, পালাটিয়া, রঙ পাঁচালি	—	দিনাজপুর
চোর-চুরনী, খাস পাঁচালি, মান পাঁচালি	—	জলপাইগুড়ি
মেছেনী কুশান ও বিষহরা	—	কোচবিহার
মাছানি ও ছৌ-এর নাট্যপালা	—	পুরুলিয়া
সঙ	—	হাওড়া, কোলকাতা
কিষ্ট যাত্রা, যুগী যাত্রা, বেনী পুতুল নাটক	—	অখণ্ড মেদিনীপুর
চিড়িয়া—চিড়িয়ানী		

ঘ. লোকচিত্রকলা ঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ

ক. চালচিত্র ঃ

সাধারণত দুর্গা প্রতিমার পেছনে চিত্রিত অর্ধবৃত্তাকার আলঙ্কারিক আচ্ছাদনকে বলা হয় চালচিত্র। এই চালচিত্রের উপাদান হল কাপড়, কাগজ, মাটি ও রঙ। কাপড়ের উপরে কাগজ সাঁটা হয়, তারপরে মাটির পলেস্তারা লাগিয়ে জমি প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কঞ্চি, দরমা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। পরে জমিকে চুনকাম করে বা সাদা রঙ করে ছবি আঁকার উপযোগী করে নেওয়া হয়। এরপর জমিকে ভরিয়ে তোলা হয় ছবি দিয়ে। ছবির বিষয়বস্তু হল দেবাসুরের যুদ্ধ, রামচন্দ্রের অভিষেক, শিব, মহিষমর্দিনী দুর্গা ইত্যাদি। মূলত সব চালচিত্রেরই কেন্দ্রশীর্ষে থাকে শিব। তাঁর হাতে শোভা পায় বীণা অথবা সাপ। শিবের পাশে দৃষ্ট হয় দ্বিতল গৃহ। মূলত পটচিত্রের শৈলী চালচিত্রে অনসৃত হয়। দুর্গা ব্যতীত জগদ্ধাত্রী এবং বাসন্তী মূর্তিতেও চালচিত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়।

খ. পটচিত্র ঃ

লোকচিত্রকলার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল পটচিত্র। পট নানা ধরনের হয়— জড়ানো পট, চৌকা পট, তাছাড়াও যমপট, গাজীর পট ইত্যাদিও আছে। সংস্কৃত পট্ট শব্দটি থেকে 'পট' শদটি এসেছে, অর্থ কাপড়। তার মানে পটচিত্রের অর্থ হল কাপড়ের উপরে অঙ্কিত চিত্র। এখন অবশ্য শুধু কাপড় নয় কাগজেও চিত্র অঙ্কিত করা হয়। অথবা কাগজে ছবি এঁকে টেকসই করার জন্য পেছনে কাপড় জুড়ে দেওয়া হয়। আগে পটচিত্রে ব্যবহৃত রঙ ও উপাদান শিল্পীরা নিজেরাই তৈরী করে নিতেন, এখন মূলত বাজারের রঙ, তুলিই ব্যবহার করা হয়।

পটচিত্রে রূপায়িত হয় মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গালের আখ্যান।

গ. দশাবতার তাস ঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাস তৈরী হয়, 'ভৌজদার' উপাধিধারী এক পরিবার এই শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন। দশাবতার তাস অত্যন্ত প্রাচীন এক শিল্পশৈলী-কেননা পদ্মপানি বুদ্ধ এতে স্থান পেয়েছেন। সম্পূর্ণ প্যাকে থাকে মোট ১২০টি তাস, অন্যদিকে ছোট প্যাকে এই সংখ্যা হল ৪৮। পাঁচজন খেলোয়াড় এই তাস খেলেন। দশাবতার তাস গোলাকৃতির। বেশ মজবুত। টেকসই। চিত্রগুলি আকর্ষণীয়। দশাবতার তাসে অঙ্কিত হয় হিরণ্যকশিপুকে বধ রত নৃসিংহ মূর্তি, শ্রীরামচন্দ্রের সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমান, বরাহ অবতার ইত্যাদি। তাসের জমি খয়রি, নীল, সবুজ, কালো রঙে চিত্রিত।

ঘ. কালীঘাটের পটশিল্প ঃ

বর্তমানে কালীঘাটের পটচিত্রের বা চিত্রকলার সেই সুনাম আর নেই ; কিন্তু একটা সময় তার খ্যাতি ছিল বহুধাবিস্তৃত। কালীঘাট চিত্রকলাকে কখনই বাঙালীর আদর্শ চিত্রকলার মর্যাদা দেওয়া যাবে না, বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কিছুটা রূপান্তরিত বলেই গণ্য করা যায়। চিত্রকররা প্রথমে পেন্সিল দিয়ে একটা রূপরেখা অঙ্কিত করে নিতেন তারপর তুলির সাহায্য নিতেন। কালীঘাটি চিত্রকলার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল গোলাকৃতির ঝোঁক। কালীঘাটের চিত্রকলা ছিল বাজারী শিল্পকলা তাই যে সব দেবদেবীকে রূপায়িত করা হত তাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যেত। বাবু কালচার সমালোচিত হত এই চিত্রকলায়।

ঙ. আলপনা ঃ

বর্তমানে যে কোনো সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানস্থলকে সজ্জিত করতে আলপনার সহায়তা নেওয়া হয়। কিন্তু এটি একান্তভাবেই লোকজ চিত্রকলার নিদর্শন। এই চিত্রকলার সঙ্গে যোগ লৌকিক ব্রত, পূজাপার্বণ অথবা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের। যে বেদীতে দেবতা বা দেবী মূর্তিকে স্থাপন করা হয় তাকে চিত্রিত করা হয় আলপনার দ্বারা। বর ও কনে যে পিঁড়িতে বসে বিবাহ অনুষ্ঠানে, তাও চিত্রিত করা হয় আলপনায়।

তবে ব্রতে আলপনার যেন পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। বিভিন্ন ঐহিক কামনা বাসনা চরিতার্থতার জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয় আর সেই কামনা বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে আলপনার মাধ্যমে বিভিন্ন মোটিফ চিত্রিত করা হয়। অঙ্কিত হয় পুকুর, ধানের মরাই, নানাবিধ আভরণ, ধানের শিস, মাছ-পদ্ম ইত্যাদি। আলপনা দেওয়া বাংলার নারী কোন আর্টস্কুলে শেখে না, বংশ পরম্পরায় এই শিল্পকলার উত্তরাধিকার বহন করে। চালের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে পিটুলির গোলা তৈরী করা হয়। এই হল রঙ। আর তুলি হল এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়ে শুচিশুভ্র-আলপনা মাঙ্গলিক পরিবেশ রচনায় বিশেষ সহায়ক।

চ. টেরাকোটা ঃ স্থাপত্য

বাংলার লোকজ শিল্পের এক অন্যান্য সাধারণ নিদর্শন হল টেরাকাটা বা পোড়ামাটির স্থাপত্য কলা। টেরাকোটা নিদর্শন হল বাঙলার বিভিন্ন মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক। আমরা এই ধরনের টেরাকোটার ফলকে সজ্জিত অসংখ্য মন্দিরের সাক্ষাৎ পাব বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগণায়, বীরভূমে এবং বর্তমান বাংলাদেশের নানা স্থানে। এইসব ফলকে রূপায়িত হতে দেখা গেছে কৃষ্ণলীলা, রাম-রাবণের কাহিনী, শিব-দুর্গা কালীর মাহাত্ম্য, তাছাড়া পশুপক্ষী, ফুল, লতা, পাতা, ও জ্যামিতিক নক্সার নানা অলঙ্করণকে রূপায়িত করা হয়েছে এই সমস্ত ফলকে। বাংলার স্থাপত্যকলার নিদর্শন মিলবে বিভিন্ন মন্দিরে, চারচালা, আটচালাগুলিতে।

ছ. ভাস্কর্য ঃ

মন্দির-মসজিদ নির্মাণে যেমন স্থাপত্যকলার পরিচয় মেলে তেমনি ভাস্কর্যেরও পরিচয় মেলে। প্রাচীন মন্দিরের দ্বারপার্শ্ব, দ্বারশীর্ষ, 'পএলতা' বলে পরিচিত, তাতে এই ভাস্কর্যের নিদর্শন সুলভ। তাছাড়া পদ্মচক্র, পদ্মদল মোটিফগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রাচীন মন্দিরের উৎকীর্ণ প্রস্তর ভাস্কর্যে। এগুলির পরিচিতি 'ফুলবল্লী' নামে। মন্দিরের গাত্রে, কাঠের ভাস্কর্যেও এই মোটিফটি সুলভ। বাংলায় যে পুরোপুরি প্রস্তর নির্মিত মন্দির অথবা মসজিদের সাক্ষাৎ মেলেনা তার কারণ উপাদান সংগ্রহের অসুবিধায় নিহিত। প্রস্তর ফলকের কিছু নিদর্শন মিললেও পরিপূর্ণ পাথরের কাজ বাংলায় মেলেনি। বাংলায় উত্তর ২৪পরগণার হালিসহরে নন্দকিশোর মন্দিরের গাত্রচিত্র, বাওয়ালির মন্দির গাত্রের চিত্রগুলি উল্লেখ্য।

২.২.৩ ❐ অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী ঃ

১. লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজ—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় কীভাবে, আলোচনা করুন।

২. লোকধর্মের প্রধান লক্ষণগুলির উল্লেখ করে, বাংলার বিভিন্ন লোকধর্মে উদার মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতটি বিশ্লেষণ করুন।

৩. ব্রত কাকে বলে? বাংলার ব্রতগুলিকে কতগুলি বর্গে বিভক্ত করা চলে? তাদের মধ্যে মিল এবং অমিলগুলি কী কী, আলোচনা করুন।

৪. 'লোকাচার' বলতে কী বোঝায়? 'প্রথার' সঙ্গে এর পার্থক্য কী? বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকাচারের পরিচয় দিন।

৫. লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার, এ দুয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। প্রসঙ্গক্রমে সংস্কার-মাত্রেই অন্ধ-বিচারবোধহীনতা কিনা সেই বিষয়েও আলোকপাত করুন।

৬. লোকসঙ্গীতের সঙ্গে পরিশীলিত সঙ্গীতের সম্পর্ক কী এবং কতটা, আলোচনা করুন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলির উল্লেখ করুন।

৭. লোকনৃত্যের মূল লক্ষণগুলি নির্ণয় করে, বাংলার প্রধান-প্রধান লোকনৃত্যগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখান।

৮. 'নাট্যশাস্ত্র' কিংবা 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে নাটকের যেসব রূপলক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে, তার সঙ্গে লোকনাট্যের লক্ষ্যগুলির পার্থক্য কোথায় বলুন।

৯. বাংলার লোকনাট্যধারাগুলির সাধারণী বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দিন।

১০. বাংলার লোকচিত্রকলার প্রধান রীতিগুলির পরিচয় দিন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলি ঃ

১. লোকধর্মের প্রতিবাদী চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. লৌকিক ব্রতের ঐহিকতা কীভাবে ব্যক্ত হয়?

৩. ব্রতের সঙ্গে আল্‌পনার সম্পর্ক কী, ব্যাখ্যা করুন।

৪. ব্রতকথা এবং মঙ্গলকাব্যের সাযুজ্য কতখানি বলুন।

৫. বিবাহসংক্রান্ত কতকগুলি বাঙালি লোকাচারের পরিচয় দিন।

৬. লোকবিশ্বাসের সঙ্গে জাদুভাবনার সম্পর্ক কতটা?

৭. 'ফোক টিশ্বার' কাকে বলে? শব্দটি কার উদ্ভাসিত?

৮. আঞ্চলিকতার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সম্পর্ক কী?

৯. বৌ-নৃত্যের বর্ণনা দিন।

১০. লোকনাট্যকে কমিউনিটি ক্রিয়েশন এবং কমিউনিটি পারফর্মেন্স বলা হয় কেন?

১১. টেরাকোটা শিল্প সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

১২. পটশিল্প সম্পর্কে টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি ঃ

১. সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়গুলির নাম কী কী?

২. বাংলার লোকধর্মগুলি মূলত কার প্রেরণায় কোথায় কোথায় আত্মপ্রকাশ করেছে?

৩. লোকধর্মের "উদার মানসিকতার" পিছনে কিসের প্রভাব আছে?

৪. কোন্ ধরনের ব্রতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়?

৫. লৌকিক ব্রতের পূজার্চনা ব্যক্তিগত, না গোষ্ঠীগত?

৬. যে-কোনও দুটি লোকসংস্কার নির্দিষ্ট করুন।

৭. 'ফোক টিম্বার' কি পরিশীলিত গানের ক্ষেত্রেও বিচার্য?

৮. ভবপ্রীতানন্দ এবং হাছনরাজা কী জন্য বিখ্যাত?

৯. রাবণকাটা এবং কালীকাচ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় প্রচলিত?

১০. বাংলার তিনটি যুদ্ধনৃত্যের নাম উল্লেখ করুন।

১১. 'মুখা' শব্দের মানে কী?

১২. ছৌ-নৃত্য কোথায় প্রচলিত?

১৩. চোর-চুরনী, খন, কুশানে এবং বনবিবির পালা কোথায় কোথায় প্রচলিত?

১৪. "লোকনাট্য মূলত ইতিহাসাশ্রয়ী।"—ঠিক, না ভুল?

১৫. দশাবতার তাস সংখ্যায় কতগুলি হয়?

১৬. আলপনার উপকরণ চাল, না সাদা রং?

১৭. পোড়ামাটির ফলক প্রধানত কোথায় স্থাপিত হয়?

১৮. "ফুলবল্লী" বলতে কী বোঝায়?

১৯. বাংলার কোন্ ধরনের লোক শিল্পের সঙ্গে 'যমের' সম্পর্ক রয়েছে?

২০. চালচিত্রের কেন্দ্রশীর্ষে কার ছবি থাকে?

পর্যায় ❐ তিন

৩.১ ❐ নামতত্ত্ব

৩.১.১ ব্যক্তিনাম

৩.১.২ স্থাননাম

৩.১.৩ সংস্কারকেন্দ্রিক নাম

৩.২ ❐ পাঠ ও পর্যালোচনা

৩.২.১ লোককথা

(ক) টুনটুনি পাখি আর দুষ্টু বিড়ালের কথা

(খ) সাতভাই চম্পা

৩.২.২ ছড়া ঃ ছেলেভুলানো ছড়া

৩.২.৩ প্রবাদ

৩.৩ ❐ অনুশীলনী

৩.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলি

৩.৪ ❐ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ ❐ নামতত্ত্ব

৩.১.১ ❐ ব্যক্তিনাম

মানবসমাজে নামকরণে একটি অপরিহার্য বিষয়। নামকরণ যেমন অনিবার্য তেমনই বিচিত্র। তবে নামকরণ একটা নামমাত্র ব্যাপার, অভ্যাস বা প্রতীকী বিষয়। ব্যক্তিনাম মূলত পরিবারিক। পরিবারসূত্রে দেওয়া নাম পরবর্তীকালে সমাজে-দেশ কালে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তির নামকরণ শৈশবের শুরুতেই করা হয়ে থাকে। তবে সব নামকরণের ক্ষেত্রের মধ্যে মৌলিক কতকগুলি পার্থক্য থাকে। আসলে নাম কোনো কিছুর পরিচয়রে প্রথম ধাপ।

নিজের প্রয়োজন বা স্বার্থেই মানুষ জাগতিক সমস্ত কিছুকে আলাদা আলাদা নামে ধরতে চায়। ব্যক্তি নিজেকে ও তার থেকে বাদ দিতে পারেন না। এর থেকেই ব্যক্তিনাম পরিচিতি লাভ করে। সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা স্থান নাম' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ব্যক্তিনাম স্থাননামের মতোই সার্থক, অর্থাৎ নামটির কোন কিছু অর্থ থাকে, কিন্তু স্থাননাম যেমন সর্বদা হয়, ব্যক্তিনাম তেমন না হতে পারে। ডাক নাম তো প্রায়ই নিরর্থক হয়, স্থাননাম কখনো নিরর্থক হয় না।" নানা রকম নামের মধ্যে আবার পারস্পরিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নামে নানা রূপের মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র থেকেই যায়। ব্যক্তিনামে ব্যক্তিগত ভাবের একটা প্রভাব থাকে। নাম নামমাত্র হতে পারে, কিন্তু এ এক বিচিত্র ও অভিনব। তাই মানব সমাজে, মানুষের কাছে নাম ব্যতীত কোনো কিছুর আত্মপ্রকাশ অসম্ভব।

লোকসমাজে নামরকরণের ক্ষেত্রে শারীরিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব চরিত্রগত বিশেষত্ব, বংশ এবং এবং জন্মস্থান পরিচায়ক শব্দ, পেশা-ইত্যাদি অনেক কিছু কারণরূপে নিহিত থাকে। যেমন ঃ হাতকাটা-পাঁচু; ট্যারা-কেষ্ট; চোরা-গুপি; পেটো-পটলা; গামলি-পাঁচি; নিমতেলে-পানু; একাদশী বাঁড়ুজ্যে; হাঁড়িফাটা মিত্তির; বাম্না রবি; নেকি কম্লি; খাণ্ডার-ঠাকুরঝি; কুমড়ো-ভাসঠাকুর ইত্যাদি। প্রায়শই এগুলি নিন্দা, পরিহাস; ব্যঙ্গ ও আক্রোশের সূত্রে সৃষ্ট। ভালো নাম খাস্তা করেও ডেকে নামকরণ হয়; যেমন—পদ্মরানি>পদি; শ্রীবাস>ছিরে; চন্দ্রশেখর>চাঁদু; হানিফ>হান্ফে; কার্তিক>কেতো ইত্যাদি। স্নেহ-আদরসূত্রেও নামকরণ হয় : রমলা>রমু; পার্বতী>পারু ইত্যাদি। এছাড়া মন্টু, পিন্টু, ভোম্বল, পিংকি, মান্চি, বাবলু, খুকুন ইত্যাদি ডাকনামও ওই একই কারণে প্রচলিত।

৩.১.২ ❐ স্থাননাম

সমাজে স্থাননামের বিশেষ গুরুত্ব আছে। স্থাননাম ভাবের দিক থেকে ব্যক্তিনামের থেমে অনেক এগিয়ে। কারণ স্থাননামের পিছনে লোকমানসের ভূমিকা আছে। কোনো কিছুকে চিহ্নিত করণের একটি দিক হলো স্থাননাম। স্থাননামের বিশেষত্ব বোঝাতে সুকুমার সেন বলেছেন : "ব্যক্তিনাম স্থাননামের মতোই সার্থক, অর্থাৎ নামটির কোন কিছু অর্থ থাকে। কিন্তু স্থাননাম যেমন সর্বদা সার্থক, ব্যক্তিনাম তেমন না হতে পারে।

...স্থাননাম কখনো নিরর্থক হয় না। ...আদর করে ছেলের নাম রাখা যায় যা তা কিন্তু বাসস্থানের নাম কেউ আদর করে যা তা রাখে না। একটা মানে ধরে বা কল্পনা করে স্থানের নাম রাখা হয়। এদিক দিয়ে স্থাননামের মূল্য ব্যক্তিনামের চেয়ে বেশি।"

স্থান নামের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে যে কোনো স্টেশন, পাড়া, পদবী, থানা, জেলা, দিঘি, পুকুর বা জলাশয় ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বহু নাম পাওয়া যায়। যেমন, কুমির পুকুর: এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একটি পুষ্করিণীতে এক সময় জমিদারদের পোষা কুমির থাকত বলেই এই নামকরণ। তাই স্থাননামের ক্ষেত্রে ইতিহাস, ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বেলতলা, বকুলবাগান, নেবুতলা, কাঁসারিপাড়া, গোয়ালটুলি, বেলগাছিয়া, কৈখালি, ট্যাংরা, তপসিয়া, বেলিয়াঘাটা, আহিরিটোলা, হাতিবাগান, বটতলা ইত্যাদি নাম থেকেই প্রমাণিত হয় আজকের মহানগরী কলকাতারও সৃষ্টি অনেকগুলি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার সমাহারে।

স্থাননামে স্থানীয়ভাবে পূজিত প্রধান দেবদেবী, বসবাসকারী গোষ্ঠী, কোনো বিশেষ্য বস্তু বা বিষয় বা ঘটনার স্মৃতি, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, নিজেদের ছেড়ে-আসা বাসস্থানের স্মৃতি ইত্যাদি ও ক্রিয়াশীল থাকে। যথাক্রমে উদাহরণ : শিবপুর, কালিঘাট, চণ্ডীতলা ; শাঁখারিপাড়া, বৈদ্যবাটি ; কাঁঠালপাড়া, গড়পার, শহিদনগর ; রবীন্দ্রপল্লী, বিধান নগর, সুভাষগ্রাম; নিউ ইংলণ্ড, সেনহাটি কলোনি ইত্যাদি।

৩.১.৩ ❐ সংস্কারকেন্দ্রিক নাম

নামকরণের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার বোধ কাজ করে। সংস্কারকেন্দ্রিক নামের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, কারো যদি পরপর কয়েকটি সন্তান মারা যাবার পর পরবর্তী সন্তানের নাম সংস্কার বশতই দেওয়া হয়— হারাধন, হারনিধি, হারামণি ইত্যাদি। আবার কারো বেশি সন্তান (বিশেষত কন্যা সন্তান) হলে কনিষ্ঠ সন্তানের নামকরণের অনেক সময় করা হয় আন্নাকালী, অর্থাৎ, আর না (নয়) কালী ইত্যাদি। অশুভ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে তার কুনজর এড়ানোর জন্যও 'খারাপ' ধরণের নাম দেওয়া হয় : গুয়ে, গোবরা, ভোঁদা, মরুনি, পেঁটাচুন্নি ইত্যাদি। সন্তান জন্মের পরে পাছে মারা যায় এই ভয়ে খুদ, কড়ি ইত্যাদির বিনিময়ে তাকে 'বিক্রি' করে দেবার সূত্রেও নাম দেওয়া হয় : খুদিরাম, তিনকড়ি ইত্যাদি।

৩.২ ❐ পাঠ ও পর্যালোচনা

৩.২.১ ❐ লোককথা

(ক) টুনটনি পাখি আর দুষ্টু বিড়ালের কথা

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি বাসা বেঁধেছে।

বাসার ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে আর চীঁ চীঁ করে।

গৃহস্থদের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে "টুনটুনির ছানা খাব।" একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, "কি করছিস লা টুনটুনি?"

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, "প্রণাম হই মহারানী!"

তাতে বিড়াল ভারি খুশি হয়ে চলে গেল। এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুঁজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, "বাছা, তোরা উড়তে পারবি?"

ছানারা বললে, "হ্যাঁ মা, পারব।"

টুনটুনি বললে, "তবে দেখ তো দেখি, ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কি না।"

ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তালগাছের ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি বললে, "এখন দুষ্টু বিড়াল আসুক দেখি।"

খানিকবাদেই বিড়াল এসে বললে "কি করছিস লা টুনটুনি?" তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বলল, "দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী!" বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল।

দুষ্ট বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনিকেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল॥

(খ) সাত ভাই চম্পা

(১)

এক রাজার সাত রানী। দেমাকে, বড়রানীদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরানী খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোট-রানীকে সকলের চাইতে বেশি ভালবাসিতেন।

কিন্তু, অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না, এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে,—ছোটরানীর ছেলে হইবে। রাজার মনে, আনন্দ ধরে না; পাইক-পিয়াদা ডাকিয়া, রাজা, রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাইমণ্ডা মণি-মাণিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।

বড়রানীরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল।

রাজা আপনার কোমরে, ছোটরানীর কোমরে, এক সোনার শিকল বাঁধিয়া দিয়া, বলিলেন—"যখন ছেলে হইবে, এই শিকলে নাড়া দিও, আমি আসিয়া ছেলে দেখিব!" বলিয়া, রাজা, রাজদরবারে গেলেন।

ছোটরানীর ছেলে হইবে, আঁতুড়ঘরে কে যাইবে? বড়রানীরা বলিলেন, "আহা, ছোটরানীর ছেলে হইবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাইব।"

বড়রানীরা আঁতুড়ঘরে গিয়াই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভাঙ্গিয়া, ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মাণিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে, রাজা আসিয়া দেখেন,—কিছুই না।

রাজা ফিরিয়া গেলেন।

রাজা সভায় বসিতে-না-বসিতেই শিকলে নাড়া পড়িল।

রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন, এবারও কিছুই না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করিয়া বলিলেন—"ছেলে না হইতে আবার শিকল নাড়া দিলে আমি সব রানীকে কাটিয়া ফেলিব।" বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন।

একে একে ছোটরানীর সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হইল। আহা, ছেলেমেয়েগুলি যে—চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করিয়া হাত নাড়ে, পা নাড়ে, আঁতুড়ঘর আলো হইয়া গেল।

ছোটরানী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"দিদি, কি ছেলে হইল একবার দেখাইলি না!"

বড়রানীরা ছোটরানীরা মুখের কাছে অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া, নথ নাড়িয়া, বলিয়া উঠিল,—"ছেলে না, হাতী হইয়াছে,—ওঁর আবার ছেলে হইবে—ক'টা ইঁদুর আর ক'টা কাঁকড়া হইয়াছে!"

শুনিয়া ছোটরানী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুর বড়রানীরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপি-চুপি হাঁড়ি সরা আনিয়া, ছেলে-মেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশ-গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিল।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মাণিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে আসিলেন; —বড়রানীরা হাত মুছিয়া, মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতকগুলি ব্যাঙের ছানা ইঁদুরের ছানা আনিয়া দেখাইল। দেখিয়া, রাজা আগুন হইয়া, ছোটরানীকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

বড়রানীদের মুখে আর হাসি ধরে না; —পায়ের মলের বাজনা থামে না; সুখের কাঁটা দূর হইল; রাজপুরীতে আগুন দিয়া ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করিয়া ছয় রানীতে মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

পোড়াকপালী ছোটরানীর দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী-নালা শুকায়—ছোটরানী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া, পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

(২)

এম্‌নি করিয়া দিন যায়। রাজার মনে সুখ নাই, রাজার রাজ্যে সুখ নাই, —রাজপুরী খাঁ-খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না,—রাজার পূজা হয় না।

একদিন, মালী আসিয়া বলিল—"মহারাজ, নিত্যপূজার ফুল পাই না। আজ যে, পাঁশগাদার উপরে সাত চাঁপা, এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রয়িাছে।"

রাজা বলিলেন,—"তবে সেই ফুল আন, পূজা করিব।"

মালী ফুল আনিতে গেল।

মালীকে দেখিয়া পারুলগাছে পারুলফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল,—"সাত ভাই চম্পা জাগ রে!"

অমনি সাত চাঁপা নড়িয়া উঠিয়া সাড়া দিল,—

"কেন বোন পারুল ডাক রে।"

পারুল বলিল,—"রাজার মালী এসেছে,

পূজার ফুল দিবে কি না দিবে?"

সাত চাঁপা তুর্‌তুর্‌ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—

"না দিব, না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজা তবে দিব ফুল!"

দেখিয়া শুনিয়া মালী অবাক হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া, রাজার কাছে খবর দিল। আশ্চর্য হইয়া, রাজা, রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন।

(৩)

রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুলফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল,—

"সাত ভাই চম্পা জাগ রে।"

চাঁপারা উত্তর দিল,—"কেন বোন পারুল ডাকে রে।"

পারুল বলিল—"রাজা আপনি এসেছেন
ফুল দিবে কি না দিবে?"

চাঁপারা বলিল,—"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার বড়রানী,
তবে দিব ফুল।"

বলিয়া চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড়রানীকে ডাকাইলেন। বড়রানী, মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া ফুল তুলিতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলিল,—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার মেজরানী, তবে দিব ফুল।"

তাহার পর মেজরানী আসিলেন, সেজরানী আসিলেন, ন-রানী আসিলেন কনেরানী আসিলেন, কেহই ফুল পাইলেন না। ফুলের গিয়া আকাশে তারার মত ফুটিয়া রহিল।

রাজা গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

শেষে দুয়োরানী আসিলেন; তখন ফুলেরা বলিল,—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী,
তবে দিব ফুল।"

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া দিলেন, পাইক বেহারারা চৌদোলা লইয়া মাঠে গিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরানীকে লইয়া আসিল।

ছোটরানীর হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি সুরসুর করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তা'দের সঙ্গে মিশিল; ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরানীর কোলে-কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সকলে অবাক্। রাজার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া গেল। রাজা তখন বড়রানীদিগে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত-রাজপুত্র, পারুল-মেয়ে আর ছোটরানীকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।

রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।।

(ক) 'টুনটুনির বই' এর এই 'টুনটুনি আর দুষ্টু বিড়ালের কথা' গল্পটির মধ্যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতারণার প্রসঙ্গটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পটির টাইপ ও মোটিফের উল্লেখ নিচে করা হল ঃ

ক.	টাইপ : ২৪৮ ক	বিড়াল ও টুনটুনি
খ.	মোটিফ :	
১.	বি ২১১.৩.৭	কথা-বলা টুনটুনি
২.	বি ২১১.৪	কথা বলা বিড়াল
৩.	কে ১৭৬	প্রতারণাময় লাভ : প্রথমে প্রণাম জানানো
৪.	কে ১৮৬০	সঠিক সময়ে প্রতারণা।

ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতিতেও এই গল্পের বিচার করা যায়। দুর্বল যে, সে শেষপর্যন্ত উৎপীড়ককে পরাস্ত করবে। টুনটুনি এবং বিড়াল যথাক্রমে ঐ দুই শ্রেণির প্রতিভূ এ গল্পে। আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির সূত্রেও দেখা যায় : টুনটুনি>বিড়াল। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে দেখি : আত্মরক্ষার প্রবণতা, শত্রুর লোভী প্রবণতার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া এবং পরিণামে বিজয়ী হওয়া।

(খ) 'সাত ভাই চম্পা' একটি রূপকথা। 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থের এই গল্পে লোককথার টাইপ ও মোটিফ ও লক্ষণীয় যেমন—

ক.	টাইপ : ৭০৭ই	সাত ভাই চম্পা / অলৌকিক ভাবে সন্তানরা দুঃখিনী মায়ের দুঃখ ঘোচায়
খ.	মোটিফ :	
১.	ডি ২১২	রূপ পরিবর্তন (মানুষ থেকে ফুল)
২.	ডি ৯৭৫	জাদুফুল
৩.	ডি ১৬১০.৪	কথা বলা ফুল
৪.	এফ ৫৪.১	গাছ মাথা তুলে বড় হয়
৫.	এইচ ৩১.১২	কেবল পিতামাতা ফুল তুলতে পারবে
৬.	জে. ১১৯.৫	মানুষের পেটে পশুর জন্ম হয় কখনো
৭.	জে. ২১১৫	পশুর জন্ম দেবার জন্য অপবাদ
৮.	কে ২২২২	বিশ্বাসঘাতিনী সতীন
৯.	জেড ৭১.৮.১	সংকেত সংখ্যা : সাত ভাই এক বোন।

রাণীদের স্বার্থদ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ডে বিচার করলে যৌনঈর্ষা। ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী বিচারে এটি হল ক্ষমতার লড়াই। এখানেও পরিণামে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িতরাই বিজয়ী হয়েছে।

৩.২.২ ❐ ছেলে ভুলানো ছড়া

মৌখিক আবৃত্তির জন্য মুখে মুখেই যা ছন্দোবদ্ধ ভাবে রচিত হয়, তা-ই ছড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছু ছড়া সংগ্রহ করেছেন ও তার আলোচনাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত দুটি ছড়ার উল্লেখ করা হল :

১. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।। (পাঠান্তর—রাগ করে)

❐ রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছড়ার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি 'আমার শৈশবের মেঘদূত ছিল'। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনা কিংবা রবীন্দ্রকাব্যের উপর বাংলার বর্ষাপ্রকৃতির প্রভাব বিষয়টি বুঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথের শৈশবের মেঘদূত কিরকম ছিল এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর উপর কি প্রভাবে বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

২. মাসি পিসি বনগাঁবাসি, বনের মধ্যে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খইমোয়াটা ধর।।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন।।

❐ এই ছড়াটির মধ্যে দিয়ে শিশুর অবারণ আনন্দের অভিব্যক্তির পরিবর্তে যে পরিণত জীবন ও সমাজ-বোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কের আন্তরিকতা ও নিবিড়তার কথা স্মরণ করলে মাসি কিংবা পিসির কথা যে কিছুতেই আসতে পারে না, এটিই এই ছড়াটির বক্তব্য। এটি সুপরিণত জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র নয়। এই শ্রেণীর ছড়া শিশুর রচনা নয়, বরং পরিণতবুদ্ধি মানবমনের সৃষ্টি। সেইজন্য এর যে আবেদন শিশুর কাছে প্রকাশ পায়, তা অর্থগত কিংবা ভাবগত নয়, বরং একান্তই সুর ও ছন্দোগত। এ ধরনের ছড়াগুলি শিশুর জননী, শিশুধাত্রী কিংবা জননীস্থানীয়া কোনো মহিলার রচনা। শিশু এর অর্থ বোঝেনা, মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত সুরটুকু শুনেই মুগ্ধ হয় মাত্র।

৩.২.৩ ❐ প্রচলিত বাংলা প্রবাদ

বাঙালি জীবন, মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ পল্লীবাসী মানুষের সার্বিক জীবনচর্যায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বা সংশ্লিষ্ট। এককথায় 'A Proverb is a short sentence based on long experience' অর্থাৎ প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত সরস প্রকাশ। যেসব প্রাজ্ঞ-উক্তি লোক-পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে, তা-ই প্রবাদ। প্রবাদ গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি। মানুষ চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে অজস্র প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে। প্রবাদে নারীমনের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশও ঘটে।

প্রবাদ জীবনের বিভিন্ন সত্যকে এক বা একাধিক বাক্যে প্রকাশ করে। অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় জীবনের দৈনন্দিন সত্যগুলি প্রবাদে উঠে আসে। কারণ প্রবাদ মাত্রেই মানবজীবনের অভিজ্ঞতাজাত। সচরাচর মেয়েরাও অনায়াসে উপযুক্ত প্রবাদটি সঠিক প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন সুদক্ষ বক্তার মত। যেমন,

১. মা নাই যার
না নাই তার।
(না অর্থাৎ নৌকা)

❐ প্রবাদটিতে মাতৃহীন সন্তানের দুরবস্থার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মায়ের স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে থেকে পরিবারে এবং সমাজে সন্তানের অবস্থিতি সুখাবহ। মাতৃহীন শিশুর প্রতি মায়ের মত সুনজর কেউ-ই রাখতে পারে না—অনাদর উপেক্ষা অবহেলা তার জীবনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অমূল্য মাতৃস্নেহকে আশ্রয় করে সংসারে শিশু আপন সত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্যের চোখেও হেয় প্রতিপন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে মা যার নাই তার কোন আশ্রয়ই নাই।

২. বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে।

❐ বৃহত্তর সমাজ জীবন অপেক্ষা বাঙালির ক্ষুদ্রতর পারিবারিক জীবন গভীরভাবে বাংলা প্রবাদে স্থান লাভ করেছে। পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে বাবার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাই পারিবারিক জীবনে বাবার কথা প্রথমেই মনে আসে। কারণ বাবাই হলেন সংসারের সর্বপ্রধান কর্তা। অথচ প্রবাদে টাকা-পয়সা ব্যাপারে বাবাকেও ও অবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে ঃ

৩. কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নির পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই।

❐ বউয়ের সঙ্গে শাশুড়ির মধুর সম্পর্কের চেয়ে তিক্ত সম্পর্কই অধিক। বিশেষ করে পুত্র যদি বউয়ের পক্ষে থাকে, তাহলে শাশুড়ির দুঃখ ক্ষোভ জমে প্রতিহিংসার রূপ নেয়। এ ধরনের নানা মানসিকতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় প্রবাদে।
—প্রবাদটিতে সংলাপধর্মী নাটকীয়তার লক্ষণও ধরা পড়েছে।

৪. কোন্ কালে বা বউ রূপসী?
জাড়কালে জাড়কাঁটা, গরমকালে ঘামাচি।

❐ বাঙালির পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং জটিল সম্পর্ক শাশুড়ি-বধূর। শাশুড়ি ও বধূ উভয়ে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। একে যেন অপরের শত্রু। শাশুড়িও যেন বউয়ের কিছুই সহ্য করতে পারে না। বউয়ের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ উচ্চারিত হয়।
বধূ সুন্দরী না হওয়ায় তার রূপের প্রতি শাশুড়ির এই ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ।

৫. শাশুড়ি মলো সকালে
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে তো, কাঁদবো গিয়ে বিকেলে।

❐ শাশুড়ির প্রতি বধূ এতটাই বিরূপ তিতিবিরক্ত যে শাশুড়ির মৃত্যুতেও শোক প্রকাশের কোন লক্ষণ দেখা যায় না; তাই বধূ নির্বিকারে উচ্চারণ করে এই তিক্ত কথায় উক্তি।

এরকম অজস্র প্রবাদ ছড়িয়ে আছে বাঙালির পারিবারিক ও সমাজ জীবনে।

৩.৩ ❐ অনুশীলনী

৩.৩.১ ❐ বিস্তৃত প্রশ্নাবলি :

১. ব্যক্তি-নাম, স্থান-নাম ও সংস্কার-কেন্দ্রিক নাম সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।
২. 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'টুনটুনির বই' গ্রন্থ দুটি থেকে একটি করে গল্পের পর্যালোচনা করুন।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থ থেকে দুটি ছেলেভুলানো ছড়ার বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪. বাঙালির জীবনে প্রচলিত পাঁচটি প্রবাদ সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

৩.৪ ❐ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.	লোকায়নচর্চার ভূমিকা	অরুণকুমার রায় (২০০৪)
২.	কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি	নীহাররঞ্জন রায় (১৯৭৬)
৩.	সংস্কৃতির রূপান্তর	গোপাল হালদার (১৯৬০)
৪.	সংস্কৃতির ধর্ম : ধর্ম ও সংস্কৃতি	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯৯২)
৫.	বাংলার লোকশ্রুতি	আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬০)
৬.	ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন	মযহারুল ইসলাম (১৯৭৪)
৭.	বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি	ক্ষেত্র গুপ্ত (২০০২)
৮.	লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব	পবিত্র সরকার (২০০২)
৯.	সমাজ-বিপ্লবে সংস্কৃতির প্রশ্ন ও ভারতীয় সমাজ	সুকোমল সেন (২০০১)
১০.	বাংলার লোকসংস্কৃতি	ওয়াকিল আহমেদ (১৯৭৬)
১১.	বাংলার লোক-উৎসব	দুলাল চৌধুরী (১৯৮৫)
১২.	লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার	বরুণকুমার চক্রবর্তী (১৯৮৬)
১৩.	ভারতীয় সমাজপদ্ধতি	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৮০)
১৪.	বাংলার ব্রতপার্বণ	শীলা বসাক (২০০০)
১৫.	বাংলার লৌকিক দেবতা	গোপেন্দ্রনাথ বসু (১৯৭৮)
১৬.	লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংলা ও আসাম	হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯৭৮)
১৭.	বাংলার লোকনৃত্য ১/২	আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৭৬/১৯৮১)
১৮.	আদিবাসী লোককথা	দিব্যজ্যোতি মজুমদার (২০০১)
১৯.	বাংলার গ্রামীণ লোকনাটক	সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত (২০০১)
২০.	বাংলার লৌকিক নৃত্য	মহুয়া মুখোপাধ্যায় (২০০০)
২১.	বাংলার লোকসঙ্গীত	অমর পাল ও দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত (১৯৯০)
২২.	লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য	সৌমেন সেন (২০০৪)
২৩.	লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ	পল্লব সেনগুপ্ত (২০০২)
২৪.	আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য	আবদুস সত্তার (১৯৭৮)
২৫.	লোককথার অন্তর্লোক	পল্লব সেনগুপ্ত (২০০০)
২৬.	লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ	দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত (২০০৩)
২৭.	বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ	বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত (২০০২)
২৮.	লোককথার ঐতিহ্য	দিব্যজ্যোতি মজুমদার (১৯৮৬)
২৯.	বাংলার ছড়ার ভূমিকা	নির্মলেন্দু ভৌমিক (১৯৮৭)
৩০.	বাংলার লোকশিল্প	রবীন্দ্র মজুমদার (২০০০)

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. **150.00**

(*NSOU*-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007